তামস-তপস্যা

শ্রীযুক্ত কিরণকুমার রায়

বন্ধুবরেষু

এক

বিচিত্র পানু দাস—তাহার দুই স্ত্রী রাজু দাসী ও ছুটকী একসঙ্গে ভাত খাইতে বসিয়াছিল। ছুটকীর খাওয়া শেষ হইল আগে। সে উঠিয়া হাত গুটাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রাজুর খাওয়া শেষ হইলে একজন দুইখানা থালা লইয়া যাইবে, অপর জন এঁটোকাঁটা গুছাইয়া নিকাইয়া এ বেলার কাজ শেষ করিবে।

হঠাৎ একটা ক্রুদ্ধ অমানুষিক চীৎকারে স্তব্ধ দ্বিপ্রহরটা যেন চমকিয়া উঠিল। ছুটকী 'ও মাগো' বলিয়া ছুটিয়া ঘরে গিয়া ঢুকিল। রাজু কিন্তু নড়িল না, সে মুখ মচকাইয়া বলিল—মরণ! পিঠে তো কড়া পড়ে গিয়েছে, আর কেন? ভয় কিসের?

চীৎকারটা পানুর। ক্রুদ্ধ হইলে পানু দাস এমনি চীৎকার করিয়া থাকে। বর্বর জানোয়ারের মত স্বভাব পানুর। যেমন হিংস্র তেমনি নিষ্ঠুর!

রাজু জলের ঘটিটা তুলিয়া আলগোছে জল খাইতে শুরু করিল। সঙ্গে সঙ্গে আবার একটা চীৎকার উঠিল। এ চীৎকারটাও অমানুষিক, প্রচণ্ড, বর্বর। কিন্তু প্রথম চীৎকারটা হইতে বিচিত্র রূপে স্বতন্ত্র। প্রথমটা শুনিয়া ভয় হইবার কারণ ছিল। এবারকার চীৎকারে সমস্ত অন্তরাত্মা যেন কেমন শ্বাসরুদ্ধের মত হাঁপাইয়া উঠিল। রাজু জলের ঘটিটা নামাইয়া রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

ছুটকী বলিল—হয়ে গিয়েছে। নিয়েছে কার রক্ত। পানুর চীৎকারের ধারা দুইজনেরই জানা। প্রথমটা কাহাকেও প্রহারের পূর্বের চীৎকার। পরেরটা প্রহার করার পরের। এমনিই পানুর অভ্যাস। রাজু দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। কি ঘটিল! কাহাকে মারিল? বাহিরে আসিয়া দেখিল—পানু আপনার চুল টানিয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সামনে একটা বাছুর পড়িয়া আছে। মানুষ নয়, গরু। পানু গো-হত্যা করিয়া বসিয়াছে। গরুটা অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে মরিয়া যায় নাই, তবে মরিয়া যাইবে তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না।

কারণ অতি সামান্য—একটি হাস্নাহানার কলমের চারা। পানু তাহার দোকানের বারান্দার দুই পাশে অতি যত্নে মাটি তৈয়ারী করিয়া সেখানে কিছু ফুলের চারা বসাইয়াছিল। বর্ষার শেষে বসাইয়াছিল কিছু গাঁদার চারা, কয়েকটি অতসী, গোটা-দুয়েক মোরগ ফুল, তাহারই মধ্যে একটি হেনার কলম। হেনার গাছ এ অঞ্চলে নাই। সে শহরে গিয়াছিল, সেখানে হেনার গন্ধে বিভোর হইয়া একটি ডাল ভাঙিয়া আনিয়া কলম কাটিয়া পুঁতিয়াছিল। দিনে দশ-বিশবার যখনই সে অবসর পাইত, তখনই গাছটির কাছে গিয়া বসিত, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ডালটির সর্বাঙ্গ খুঁজিয়া দেখিতে চাহিত—সবুজ একটি অঙ্কুরকণা। ক্রমে সেই ডালটি বর্ষার স্নেহ-সিঞ্চনে, পানুর সযত্ন পরিচর্যায় সর্বাঙ্গ ভরিয়া অঙ্কুর বিকাশ করিল—ধীরে ধীরে সেই অঙ্কুর পত্রঘন সরস সবুজ পল্লবে পরিণত হইল। গাছটি সতেজ নধর একটি শিশুর মতই দিন দিন নব নব লাবণ্যে ও পরিপুষ্টিতে বাড়িয়া উঠিতেছিল। পানু হুঁকা হাতে গাছটির পাশে বসিয়া মায়ের মত স্নেহে তাহার পত্রপল্লবগুলিতে হাত বুলাইত। পাতার উপর এতটুকু ধূলামাটি লাগিয়া থাকিলে মুছিয়া দিত। প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষের মুখের মত তাহার মুখ—আকারে প্রকাণ্ড, চোখের পাশে হনুর হাড় দুইটা উঁচু, থ্যাবড়া নাক, পুরু ঠোঁট, অতি বিস্তৃত মুখগহ্বর। পানুর সেই মুখ, গাছটির পাশে বসিয়া হাসিতে ভরিয়া উঠিত। পানু শক্তিতে আকৃতিতে দৈত্যের মত। একা কোদাল চালাইয়া সে বাড়ীর পাশে একটা ছোট গড়ে

কাটিয়াছে, গড়েটির পাড়ের উপর তরিতরকারি, কলা আম জাম কাঁঠালের গাছে ভরিয়া তুলিয়াছে। বৃক্ষশিশু তাহার অনেক। কিন্তু এই হেনার চারাটি তাহার কাছে যেন শত পুত্রের মধ্যে একমাত্র কন্যা। বর্বর পানু ছেলেবয়সে হা-ঘরে অর্থাৎ বেদেদের দলের মধ্যে গিয়া পড়িয়াছিল; তারপর পলাইয়া আসিয়া ঘর বাঁধিয়াছে—গাছটি তাহার হা-ঘরের ঘরের তুলসীমঞ্চের মত প্রিয় এবং পবিত্র।

সেদিন সবেমাত্র পানুর ভাতের নেশাটি ধরিয়া আসিয়াছে; মৃদু মৃদু নাক ডাকিতে শুরু করিয়াছে, এই অবসরে একটা দুর্ভিক্ষপীড়িত কঙ্কালসার বাছুর কোথা হইতে আসিয়া সরস সবুজ গাছটির উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। পশুর মেধা নাই, কিন্তু বোধ-শক্তি আছে; সে অজ্ঞান, কিন্তু অভিজ্ঞতাকে সে ভোলে না। গরু ছাগল সযত্নপালিত গাছ চিনিতে পারে এবং সেগুলিকে অতি দ্রুত খাইয়া সরিয়া পড়ে; কিন্তু এ বাছুরটা এত দুর্বল এবং হেনার চারাটির রস এত মধুর যে, সে খাইতেছিল অতি ধীরে ধীরে। গাছটাকে লইয়া প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছে এমন সময় পানুর ঘুম ভাঙিয়া গেল। দুঃখে, ক্ষোভে, দুর্দান্ত পানু প্রথমটা যেন মূক হইয়া গেল। সদ্য ঘুমভাঙা লাল চোখ বিস্ফারিত করিয়া সে কয়েক মুহূর্ত গাছটা ও বাছুরটার দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর অকস্মাৎ প্রচণ্ড রাগে বুদ্ধি-বিবেচনা সব হারাইয়া ফেলিয়া পাকা বাঁশের লাঠিখানা টানিয়া লইয়া ঝাড়িয়া দিল বাছুরটার উপর। বাছুরটার এতক্ষণে বোধশক্তি জাগিয়াছিল, দুর্বল দেহে সে ছুটিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু লাঠিখানা হইতে বাঁচিবার মত দূরত্ব অতিক্রম করিবার পূর্বেই লাঠিখানা আসিয়া পড়িল কোমরের পাশে—পিছনের একখানা পায়ের উপর। সঙ্গে সঙ্গে বাছুরটা একটা অতি কাতর শব্দ করিয়া মাটির উপর পড়িয়া গেল।

পানুর রাগ তবু গেল না। বাছুরটার বেদনাবিস্ফারিত বড় বড় কালো চোখ দুইটার সম্মুখে লাঠিগাছটা বার বার ঠুকিয়া বলিল—ওঠ্ শালা, ওঠ্! আবার কলা করে পড়ে আছে দেখ। ওঠ্! লাঠির ডগার খোঁচা দিয়া বাছুরটাকে আবার সে ঠেলিয়া দিল।

ভয়বিস্বল জীবটা বার-কয়েক বাকি পা তিনটা আছড়াইয়া উঠিবার একটা ব্যর্থ চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। নিরুপায়ে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আবার সে শিথিল দেহে নিশ্চেষ্ট হইয়া এলাইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে চোখের পাতা ঘন আন্দোলনে বার কয়েক কাঁপিয়া উঠিল; সে কম্পিত আন্দোলনের চাপে চোখের কোণ হইতে অশ্রুর দুইটি দীর্ঘ ধারা গড়াইয়া বাহির হইয়া আসিল। কয়েকটি বিন্দু চক্ষুপল্লবের দীর্ঘ রোমের প্রান্তে শিশিরবিন্দুর মত লাগিয়া রহিল। পশুটার দিকে পানু চাহিয়া ছিল স্থির দৃষ্টিতে।

বর্বর পানু দাস স্বাভাবিক ভাবেই প্রকৃতিতে নিষ্ঠুর। মায়া নাই, দয়া নাই, ভয় নাই, ধর্ম নাই, শুধু সে নিষ্ঠুর। অত্যন্ত রূঢ়—মাত্রাতিরিক্ত নিষ্ঠুর। হত্যা যে সে কত করিয়াছে তাহার হিসাব নাই। অবশ্য মানুষ নয়, জীবজন্তু পাখী-পতঙ্গ। কথায় কথায় সে মানুষের অপমান করে, দুই-চারি কথার পরেই সে লাঠি চালাইয়া বসে। আহত মস্তক, মানুষের রক্তাক্ত মুখ সে অনেক দেখিয়াছে। কিন্তু আজ ওই জীবটার চোখের জল দেখিয়া অকস্মাৎ সে বিচলিত হইয়া পড়িল। হাতের লাঠিটা ফেলিয়া দিয়া অদ্ভুত দৃষ্টিতে সসঙ্কোচে বাছুরটার গায়ে হাত দিল।

অস্থিচর্মসার পশু-শাবক। গায়ের রোঁয়াগুলি পর্যন্ত অধিকাংশই উঠিয়া গিয়াছে। বিরল রোমগুলির উপরেই মাঝে মাঝে তাহার মায়ের সস্নেহ লেহনের চিহ্ন চিকণ হইয়া ফুটিয়া রহিয়াছে। বেচারার মায়ের দুধের শেষ ফোঁটাটি পর্যন্ত গৃহস্থে টানিয়া বাহির করিয়া লয়। ক্ষুধার জ্বালায় কঙ্কালসার বাছুরটা ওই ঘনসবুজ নরম গাছটির উপর মুখ বাড়াইয়াছিল; মুখের

পাশ বাহিয়া সবুজরস-মিশ্রিত লালা এখনও গড়াইয়া পড়িতেছে; কয়েকটা পাতা এখনও গোটাই রহিয়াছে। পানু ধীরে ধীরে স্নেহভরেই বাছুরটার পাঁজরাগুলির উপর হাত বুলাইয়া দিল।

বাছুরটা ক্ষণে ক্ষণে শিহরিয়া উঠিতেছিল; বড় কালো চোখের অসহায় ভয়ার্ত দৃষ্টিও কাঁপিতেছিল। থাকিতে থাকিতে সে জিভ দিয়া পানুর হাত চাটিতে আরম্ভ করিল।

পানুর চোখ অকস্মাৎ সজল হইয়া উঠিল। বেশ ভাল করিয়া নাড়িয়াচাড়িয়া দেখিল, বাছুরটার পিছনের পাখানা একেবারে ভাঙিয়া গিয়াছে। দেখিতে দেখিতে হঠাৎ কি হইয়া গেল! তাহার স্মৃতির লোহার কপাটখানা যেন এক মুহূর্তে অকস্মাৎ খুলিয়া গেল। মনে পড়িয়া গেল তাহার বাল্যজীবনের কথা।

ওই বাছুরটার অবস্থার সঙ্গে তাহার সেই অবস্থার যেন একটা মিল আছে। অতি নিকট সাদৃশ্য। সেদিন সেও ছিল ওই বাছুরটার মত অসহায়। পানুর মনে পড়িয়া গেল, তাহার বাবা দারোগার কাছে প্রচণ্ড নির্যাতনে নির্যাতিত হইয়া সামান্য কয়েকটা আশ্বাসের কথায় হাসিয়াছিল—আনুগত্য প্রকাশ করিয়াছিল। সে আপনার পিঠে হাত দিল। চামড়া জমাট বাঁধিয়া লম্বা টানা চলিয়া গিয়াছে পিঠের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত। একটা নয়—একটার পর একটা। সারি সারি। পানুর প্রকাণ্ড প্রশস্ত পিঠের কালো চামড়ার উপর গাঢ়তর কালো রঙের লম্বা টানা সারি সারি দাগ দেখা যায়।

বেতের দাগ।

বহুদিন পূর্বের কথা।

বাংলা তেরো শো তেরো সাল; জ্যৈষ্ঠ মাসের ঘটনা।

পানুর বয়স তখন বারো-তেরো বৎসর। সে তখন স্কুলের ছাত্র। হাকিম অথবা উকিল হইবার কিংবা লেখাপড়া শিখিয়া গাড়ী-ঘোড়া চড়িবার সাধ পানুর ছিল কি না সে কথা পানুর মনে নাই। তবে স্কুলে সে শান্ত বোকা ছেলে ছিল। পৃথিবীর মধ্যে নিরীহ পোস্টমাস্টারটিকে তাহার বড় ভাল লাগিত—এমনই একটি পোস্টমাস্টার হইবার সাধ মধ্যে মধ্যে তাহার হইত।

পানুর বাপের ছিল জাতীয় ব্যবসা, বেনেতী মশলার দোকান। বড় ভাই জীবন বাপের সঙ্গে দোকান দেখিত। বেচাকেনা মন্দ ছিল না। গ্রামখানি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। পোস্ট আপিস, সাব-রেজেস্ট্রি আপিস, হাইস্কুল, সবই আছে। থানা পানুদের বাড়ীর একেবারে সামনে; ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ডের রাস্তার এপারে পানুদের বাড়ী, ওপারে থানা। থানার জমাদার মধ্যে মধ্যে তামাক খাইতে আসিত। বাপ বলিত—বন্ধুলোক। কিন্তু বন্ধুলোক একদিন বিগড়াইয়া গেল। পানুদের বাড়ীর পাশের প্রতিবেশী মহাজন নাকু দত্ত অকস্মাৎ একদিন রাত্রে খুন হইয়া গেল। নাকু দত্ত ছিল কৃপণ অর্থশালী লোক, সোনা-রূপার অলঙ্কার বাঁধা রাখিয়া চড়াসুদে মহাজনী কারবার করিত। নাকু দত্তের বাড়ীর এক দিকে পানুর বাপ শ্যামাদাসের দোকান ও বাড়ী, অন্য পাশে মাধব ময়রার বাড়ী, সামনে ডিস্ট্রিক-বোর্ডের রাস্তা, তাহার ওপারে পুলিসের আস্তানা—থানা। নাকু দত্ত ছিল সংসারে একা মানুষ। স্ত্রী অনেক পূর্বেই মারা গিয়াছিল। তিনটি কন্যার সকলেই থাকিত স্বামীর ঘরে, নাকু দত্ত সম্মুখের থানার ভরসায় রাস্তার ধারের বারান্দায় নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে শুইয়া থাকিত। বলিত—সামনে রাম পাহারা, দেখেছিস! সেদিন কিন্তু সকালে দেখা গেল, নাকু দত্ত দোকানের বারান্দা হইতে গড়াইয়া রাস্তার উপরে পড়িয়া আছে, আতঙ্কবিস্ফারিত নিস্পলক দৃষ্টি, তাহার গলার নলীটা কে বা কাহারা দুই ভাগে কাটিয়া

দিয়া গিয়াছে। বিছানাটা রক্তাক্ত, ফোয়ারার মত রক্তের ফিনকিতে দেওয়ালটাও রক্তাক্ত। নাকুর দেহের পাশে রাস্তার খানিকটা অংশের ধূলা কাদার মত জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। নাকুর দরজা ভাঙা, ঘরের জিনিসপত্র ছড়াইয়া পড়িয়া আছে, বন্ধকী সোনা-রূপার অলঙ্কারের নাকি এক টুকরাও নাই।

নাকু দত্তের মৃতদেহের সে বীভৎস রূপ আজও পানুর মনে আছে। জীবনে বিভীষিকার মধ্যে একমাত্র নাকু দত্তের মৃতদেহের স্মৃতি এবং স্বপ্ন। বালক পানু সেদিন অঝোরে কাঁদিয়াছিল। ভয়ে দুঃখে তাঁহার কচি মন দুরন্ত আঘাত পাইয়াছিল। কিন্তু সেই দিন সন্ধ্যায় তাহার বাপকে যখন থানায় ধরিয়া লইয়া গেল, তখন নাকু দত্তের জন্য দুঃখ এক মুহূর্তে বিলুপ্ত হইয়া গেল। অসহনীয় আতঙ্কে সে অধীর হইয়া উঠিল।

'খুন করিলে খুন দিতে হয়', যে খুন করে তাহাকে ফাঁসি-কাঠে ঝুলিয়া খুন হইতে হয়। প্রতিমুহূর্তে নাকু দত্তের ছিন্নকণ্ঠ দেহের পাশে সে তাহার বাপের দেহ ফাঁসিতে ঝুলানো দেখিতে পাইল। বালকের কল্পনা সে দেহখানাকে দুলিতে পর্যন্ত দেখিতে পাইল। সমস্ত রাত্রি তাহার ঘুম পাইল না।

পরদিন সকালে পুলিস আসিয়া তাহাদের বাড়ীর সমস্ত জিনিসপত্র ছড়াইয়া তছনছ করিয়া খুঁজিয়া দেখিল। এমন কি ঘরের মেঝে, বাড়ীর উঠান পর্যন্ত খুঁড়িয়া বাড়ীটাকে চষা মাঠে পরিণত করিয়া ফেলিল। কিন্তু তবু পানু খানিকটা আশ্বস্ত হইল—নাকু দত্তের সোনা-রূপার এক কণাও তাহাদের বাড়ীতে পাওয়া গেল না। তবে তাহার বাবা খুন করে নাই। আরও আশ্বস্ত হইল যখন পুলিস তাহার বাপকে ছাড়িয়া দিয়া গেল।

শ্যামাদাস স্তব্ধ হইয়া নতমুখে বসিয়া ছিল—চোখ দিয়া কেবল ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরিয়া পড়িতেছিল।

পানুর মনে বার বার একটি প্রশ্ন জাগিয়া উঠিতেছিল,—বাবা, তোমাকে মেরেছে? কিন্তু শ্যামাদাসের এই মূর্তির সম্মুখে তাহার সে প্রশ্ন মূক হইয়া গেল। সে মাধব ময়রার বাড়ীও একবার ঘুরিয়া আসিল। মাধবকেও পুলিস ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল। তাহার বাড়ীর অবস্থাও ঠিক তাহাদের বাড়ীর মতই হইয়াছে। মাধবও ঠিক তাহার বাপের মত বসিয়া আছে। সেও কাঁদিতেছে, কিন্তু তাহার বাবার মত নীরবে নয়, হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিতেছে। ওদিকে থানায় গণ্ডার হাড়িকে ধরিয়া আনিল। সোনা-রূপার ঢাকাই কারিগরকে কাল সন্ধ্যায় আনিয়াছে—আজ এখনও ছাড়ে নাই। পানু হাঁপাইয়া উঠিল। এই অবস্থার মধ্যে স্কুলে যাওয়া হয় নাই—অকস্মাৎ অসময়ে সে বই লইয়া স্কুলে চলিয়া গেল। কিন্তু সেখানে অবস্থা হইল আরও অসহ্য।

সহপাঠীরা প্রশ্নে ব্যঙ্গে শ্লেষে তাহাকে পাগল করিয়া তুলিল।

—কিসে করে খুন করলে? ছুরি দিয়ে, না, ক্ষুর দিয়ে?

—তুই জেগে ছিলি পানু?

—হ্যাঁ রে পেনো, তোর বাবা দালানবাড়ী করবে কবে রে?

পানু পাগলের মত ছেলেটার ঘাড়ের উপর লাফ দিয়া পড়িল। ব্যাপারটা ঘটিয়া গেল ক্লাসেই; ওদিকে মাস্টার পড়াইতেছিলেন, এদিকে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত মৃদুস্বরে এই আলোচনা চলিতেছিল। অকস্মাৎ পানুর এই উন্মত্ত আক্রমণ দেখিয়া মাস্টার ছুটিয়া আসিয়া উভয়কে পৃথক করিয়া দিলেন। মার খাইয়াছিল আক্রান্ত ছেলেটাই, কিন্তু আঁ-আঁ করিয়া কাঁদিতেছিল পানু।

বিচার করিবার প্রয়োজন ছিল না, বিচারক স্বচক্ষেই সমস্ত দেখিয়াছেন, তিনি পানুর পিঠেই কয়েক ঘা বেত কষাইয়া দাঁড় করাইয়া দিলেন। পানু উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু দাঁড়াইয়া থাকিল না—ছুটিয়া স্কুল হইতে বাহির হইয়া পলাইয়া আসিল। বাকী দিনটা মাঠে মাঠে ঘুরিয়া সন্ধ্যায় যখন সে বাড়ি ফিরিল, তখন তাহাদের দুয়ারে কনস্টেবল দাঁড়াইয়া আছে। শ্যামাদাসের আবার তলব পড়িয়াছে। কিছুক্ষণ পর ডাক পড়িল বড় ভাই জীবনের। তারপর তাহার মা। মায়ের পর পানুর বড়দিদি চারু। সব শেষে—সে।

থানায় গিয়া সে আতঙ্কে কেমন হইয়া গেল। শ্যামাদাস একটা থামের সঙ্গে আবদ্ধ। বড় ভাই জীবনও তাই। ওদিকে তাহার মা জমাদারের পা ধরিয়া কাঁদিতেছে। দিদি চারু নাই, দারোগাবাবু তাহাকে ঘরের মধ্যে প্রশ্ন করিতেছে। দরজা বন্ধ। পানু ভয়বিস্ফারিত চোখে সকলের দিকে চাহিয়া রহিল।

জমাদার শ্যামাদাসকে প্রশ্ন করিল—কবুল করবি কিনা?

ঠিক এই সময়ে ফিরিয়া আসিল পানুর বড়দিদি চারু। চারুর অবস্থা দেখিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। তাহার মা মেয়ের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

চারু সুন্দরী মেয়ে; গোলাপ ফুলের মত তাহার গায়ের রঙ। এক পিঠ ঘন কালো চুল; দেহভঙ্গিমা সরল দীঘল। চারু রূপে ছিল সুচারু—কথাটা একবর্ণ অতিরঞ্জন নয়। রূপের জন্য শ্যামাদাস ও তাহার স্ত্রী কন্যাকে দুর্লভ সম্পদের মত ঘরের মধ্যে লুকাইয়া রাখিত। চারুর সেই রূপকে কে যেন বিপর্যস্ত করিয়া দিয়াছে। চারু টলিতে টলিতে আসিয়া মায়ের কোলের কাছে অবশ দেহে লুটাইয়া পড়িল; মা মেয়েকে বুকে টানিয়া লইল। এতক্ষণে চারুর দুই চোখ হইতে ঝরঝর করিয়া জল ঝরিতে আরম্ভ করিল। পানুর মনে হইল—চারুকে বোধ হয় পায়ে দড়ি বাঁধিয়া হেঁটমুখে এতক্ষণ ঝুলাইয়া রাখিয়াছিল। শরীরের সমস্ত রক্ত তাহার মুখে আসিয়া জমিয়াছে, চোখ দুইটাও গাঢ় লাল—উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি, কাপড়চোপড় বিশৃঙ্খল—মাথার চুল বিপর্যস্ত, মুখে চোখে চারিপাশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। পানুর ইচ্ছা হইল, দারোগা জমাদারের পায়ে উপুড় হইয়া পড়িয়া চীৎকার করিয়া কাঁদে—ও গো দারোগাবাবু—জমাদার বাবু—পায়ে পড়ি, ছেড়ে দাও গো। ঈশ্বরের দিব্যি করে বলছি—আমরা কেউ কিছু জানি না। ভগবানের দিব্যি।

সে চারুর মুখের দিকেই চাহিয়া ছিল। অকস্মাৎ একটা ভীষণ চীৎকারে সে চমকিয়া উঠিয়া ফিরিয়া চাহিল। দেখিল, থামে আবদ্ধ তাহার বাপ শ্যামাদাস পশুর মত এই চীৎকার করিয়া থামের গায়ে মাথা ঠুকিবার চেষ্টা করিতেছে। অদ্ভুত তাহার চোখের দৃষ্টি; গোটা চোখ দুইটাই যেন ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া আসিবে। জমাদার নীরবে হাতের বেতখানা শ্যামাদাসের পিঠের উপর চালাইতেছে। আঘাতের পর আঘাত।

কেমন করিয়া কি হইয়া গেল! বিড়ালকে ঘরের মধ্যে পুরিয়া আক্রমণ করিলে এক মুহূর্তে যেমন তাহার চেহারা পাল্টাইয়া যায় তেমনি ভাবেই মুহূর্তে পানুর পরিবর্তন ঘটিয়া গেল। কালো ছোট নিরীহ পানু কালো বিড়ালের মতই একটা চীৎকার করিয়া জমাদারের ঘাড়ের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। জমাদারের কাঁধে গেঞ্জির উপরেই দুরন্ত শক্তিতে কামড় বসাইয়া দিয়া প্রায় ঝুলিতে আরম্ভ করিল। জমাদার চীৎকার করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তবু পানু ছাড়িল না। ছাড়াইয়া দিল একজন কনস্টেবল। তাহারই প্রতিফলে পানুর পিঠে ওই দাগগুলার সৃষ্টি হইয়াছে। হাতে পায়ে বাঁধিয়া জমাদার হাতের বেত দিয়া নির্মম আঘাতে দাগগুলা আঁকিয়া দিল। সেদিন দাগগুলার রঙ কালো ছিল না, ছিল গাঢ় রাঙা। দারোগা

মীর সাহেব, জমাদার ধর্মদাস ঘোষের নাকি পদাবনতি ঘটিয়াছিল, নানা কারণের মধ্যে এই নির্যাতনও একটা কারণ, কিন্তু তাহাতে পানুর কি? পিঠে হাত দিলেই পানুর সব কথা মনে পড়িয়া যায়।

পরের দিনই পানু বাড়ী হইতে পলাইয়াছিল।

বাল্যকাল হইতেই বিপুল তাহার দৈহিক শক্তি। বোধ হয় রূপ ও বুদ্ধি হইতে বঞ্চনার এটা ছিল পরিপূরক। এমন শক্তি যে, এই কঠোর প্রহারেও পানু অজ্ঞান হইল না, শয্যাশায়ী হইল না। শুধু থানার সম্মুখে বাড়ীতে কোনমতে সে আর তিষ্ঠিতে পারিল না। পিঠে তেলের প্রলেপ দিয়া একটা মাদুরের উপর বালিশে বুক দিয়া উপুড় ভাবে তাহাকে শোয়াইয়া দিয়াছিল তাহার মা। কিন্তু সম্মুখে থানা, থানা-প্রাঙ্গণে কনস্টেবল চৌকিদার গিস-গিস করিতেছিল; আর ভিতর হইতে ভাসিয়া আসিতেছিল মানুষের চীৎকার।

মাধব ময়রা—নাকু দত্তের ওপাশের প্রতিবেশী।

গণ্ডার হাড়ি—প্রকাণ্ড দেহ এবং প্রচণ্ড বলশালী বলিয়া লোকে তাহাকে গণ্ডার বলে।

ঢাকার সেকরা—ঢাকা হইতে এখানে সোনা-রূপার ব্যবসা করিতে আসিয়াছে।

হাতেম মিঞা দর্জি—পানুদের দোকানের পরেই তাহার দোকান।

কেবল নাকি মধু সিংকে একবার ডাকিয়াই ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। লোকটা কবুল খাইয়াছে। বলিয়াছে, সে পা ধরিয়াছিল, নাকু দত্তের গলা কাটিয়াছিল দারোগা মীর সাহেব। অকাতরে নির্যাতন সহ্য করিয়াও সে দ্বিরুক্তি করে নাই। যুক্তিও সে দিয়াছে, নাকু দত্তের বাড়ীর সামনে থানা, সেখানে দারোগা জমাদার মোতায়েন, অন্য কার ঘাড়ে দশটা মাথা যে আপনারা থাকতে এ কাজ করে যাবে?

অন্ধকার রাত্রে পানু ঘর হইতে বাহির হইয়াছিল, ওই মধুর কথাই পুলিস সাহেব, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে জানাইতে।

দুই

গভীর রাত্রে আক্রোশের তাড়নায় প্রায় দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্যের মত সে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। থানায় তখন চীৎকার করিতেছিল গণ্ডার হাড়ি। চারিটা পায়ে দড়ি বাঁধিয়া হাড়িকাঠে ফেলিবার সময় মহিষে যেমন চীৎকার করে তেমনি মর্মান্তিক চীৎকার। পানু উঠিয়া বাড়ীর খিড়কির দরজা দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। তাহার বাবা, মা, দিদি চারু, দাদা সকলেরই তখন সবে ঘুম আসিয়াছে। গত রাত্রের নির্যাতনের পর আজ সন্ধ্যায় যখন অপর ব্যক্তির চীৎকার ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে, তখনই তাহারা অনেকটা আশ্বস্ত হইয়াছে। পানুর কিন্তু ঘুম আসে নাই; অবসর পাইয়া সে বাহির হইয়া জঙ্গলের মধ্য দিয়া গ্রাম অতিক্রম করিয়া পাকা সড়কে আসিয়া উঠিল। সদর শহরে যাইবে সে। পুলিস সাহেব ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে গিয়া মধু বেনের কথা প্রকাশ করিয়া দিবে। নিজের পিঠের ওই বেতের দাগগুলা দেখাইবে। সে শুনিয়াছে, সাহেবেরা অন্যায় কখনও করে না। দারোগার অন্যায় জানিতে পারিলে সাহেব একেবারে ক্ষেপিয়া যায়। এখানকারই কুমী কলুনী হেম দারোগার অন্যায় সাহেবকে জানাইয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে হেম দারোগাকে জমাদারিতে নামাইয়া দিয়া

সাহেব তাহাকে অন্য থানায় বদলি করিয়া দিয়াছিল। চণ্ডী দারোগা ঘুষ লইয়াছিল, সাহেব তাহার চাকরির মাথা খাইয়া দিয়াছিল। বাবুরা হালে 'বন্দেমাতরম্' 'বন্দেমাতরম্' করিয়া যতই সাহেবদের বিরুদ্ধে চীৎকার করুক, তবুও পুলিশ সাহেব ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের উপর পানুর অগাধ বিশ্বাস। এইবারেই স্কুলে প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনের সময় হাতজোড় করিয়া কবিতা বলিয়াছে—

"সকলে দাঁড়াই এস সারি সারি হয়ে,
ম্যাজিস্ট্রেট এসেছেন অন্য বিদ্যালয়ে।"

পণ্ডিত মহাশয় বলেন—রাজপ্রতিনিধি। রাজা দেবতা; সেই দেবতার প্রতিনিধি।

কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি। সুদীর্ঘ পথ। তাহাদের গ্রাম হইতে সদর শহর বিশ মাইল দূর। ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ডের পাকা সড়কটা জনহীন প্রান্তরের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে, বিশ মাইলের মধ্যে গ্রাম পাওয়া যায় মাত্র দুইখানি। প্রচণ্ড আবেগোচ্ছ্বাসিত আক্রোশের বশে সে রওনা হইয়া গেল। মনের মধ্যে এমন তন্ময় হইয়া সে সাহেবদের সঙ্গে ভাবী সাক্ষাৎকারের কল্পনায় বিভোর ছিল যে, সুন্দীপুরের জঙ্গলের সম্মুখীন হইবার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তাহার পথের কথা একবারও মনে হয় নাই। জঙ্গলটার মধ্য দিয়াই সড়কটা চলিয়া গিয়াছে। এই ভয়াবহ স্থানটার সম্মুখে আসিয়াই সে অকস্মাৎ সচেতন হইয়া উঠিল। এই মুহূর্তে মনের অন্তস্তলের ঘুমন্ত ভয় সুন্দীপুরের বটগাছ ও জঙ্গলের যত ভয়াবহ ইতিহাস লইয়া জাগিয়া উঠিয়া তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

সুন্দীপুরের বটতলায় ঠ্যাঙাড়েরা লুকাইয়া থাকিত। রাত্রে পথিক একা হইলে তাহার আর রক্ষা থাকিত না। ঠ্যাঙাড়েরা এখন লোপ পাইয়াছে, কিন্তু গাছতলার ভয় এখনও যায় নাই। লোকে বলে—ঠ্যাঙাড়েরা এখন প্রেত হইয়া গভীর রাত্রে ওই বটতলায় আড্ডা জমায়, গাছের ডালে লম্বা পা ঝুলাইয়া বসিয়া থাকে, অট্টহাসি হাসে। আর যে হতভাগ্যেরা একদা ঠ্যাঙাড়ের হাতে মরিয়াছে, তাহারা মাটিতে লুটাইয়া অতি করুণ আর্তনাদে কাঁদে।

শুধু তাই নয়, আরও আছে। ক্রোশ-ব্যাপী প্রান্তরের বুকে ঘন জঙ্গলের প্রায় মাঝখানটিতে ওই যে বটগাছটি,—যে-বটের নামেই এ স্থানটা পরিচিত—ওই বিরাট গাছটার এখন অসংখ্য কাণ্ড। কতদিনের পুরানো গাছ কেহ জানে না, তাহার মূল কাণ্ডটাও এখন আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, পুরানো আমলের ঝুরিগুলাই এখন কাণ্ডে পরিণত হইয়াছে। দিনের বেলায় গাছটার ঘনছায়াচ্ছন্ন তলদেশে দাঁড়াইলে মনে হয়, এ যেন কোন খেয়ালী শিল্পীর গড়া এক বিচিত্র স্তম্ভ-ভবন। মধ্যে মধ্যে গভীর রাত্রে ওই গাছতলা হইতে 'এক-শেয়ালী' ডাক শোনা যায়। একটিমাত্র শেয়ালের অস্বাভাবিক উচ্চ এবং অসাময়িক প্রহর-ঘোষণার শব্দ। শেয়ালের ডাক নয়, ডাকাতদের সঙ্কেত। হাঁড়ির মধ্যে মুখ দিয়া শেয়ালের ডাকের অনুকৃতি অসময়ে প্রহর-ঘোষণা করিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে; অন্য কোন শেয়াল সে ডাক শুনিয়া ডাকিয়া উঠে না; আশপাশের গ্রামগুলিতে নিরীহ গৃহস্থ নরনারী সভয়ে শিহরিয়া উঠে। পরদিন শোনা যায় কোথাও ডাকাতি হইয়াছে। রাখাল ছেলেরা দিনের বেলায় গরু চরাইতে আসিয়া বহুদিন বটগাছতলায় দেখিতে পায় পোড়া মশালের ছাই, কাঠকুটার আগুনের আঙার, পোড়া বিড়ির টুকরা, কখনও কখনও দুই-একখানা এঁটো পাতা; বর্ষাবাদলে মাটি নরম থাকিলে অস্পষ্ট-স্পষ্ট কতকগুলা পায়ের দাগ। চকিতের মধ্যে বিদ্যুদালোকিত মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মত সুবিস্তৃত ভয়ঙ্কর ইতিহাসের স্মৃতি পানুর জাগ্রত চেতনায়

ভাসিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভিতরটা গুর-গুর করিতে শুরু করিল। ভয়ের স্মৃতিই যেন গর্জন করিয়া উঠিল। পানু থমকিয়া দাঁড়াইল। পা দুইটা ঠকঠক করিয়া কাঁপিতেছে। সর্বাঙ্গে ঘাম ঝরিতেছে। গলা শুকাইয়া কাঠ হইয়া গেল।

সে ফিরিয়া যাইবে? কিন্তু তাহার দুরন্ত আক্রোশ মনের মধ্যে পাক খাইয়া উঠিল ক্রুদ্ধ অজগরের মত। ভয় এবং আক্রোশের দ্বন্দ্বের মধ্যে সে পঙ্গুর মত দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মনের চোখের সম্মুখে পাশাপাশি ভাসিতে লাগিল ভয়ঙ্কর এক প্রেতের মুখ এবং প্রহার-জর্জরিত তাহার বাপের সেই অব্যক্ত যন্ত্রণা-কাতর মুখচ্ছবি; বটতলার অন্ধকারে প্রতীক্ষমাণ ডাকাতের হিংস্র জলন্ত দুইটা চোখ এবং দিদি চারুর জলভরা ডাগর চোখ দুইটি। এক কানে বাজিতেছিল ঠ্যাঙাড়ের হাতে অপঘাতে মৃত্যুকবলিত আত্মার করুণ ক্রন্দন, অপর কানে বাজিতেছিল তাহার মায়ের কান্নার সুর। ঠ্যাঙাড়েদের প্রেতাত্মার অট্টহাসি এবং গণ্ডার হাড়ির সেই মহিষের মত আর্তনাদ। স্তব্ধ জঙ্গলটাকে সম্মুখে রাখিয়া ভাবিতে ভাবিতে সে যেন পাগল হইয়া উঠিল। জঙ্গলটার স্তব্ধতার মধ্যে তাহার সাহস বাড়িয়া উঠিতেছিল বর্ষাসিক্ত বীজের অঙ্কুরের মত, যে অঙ্কুর বীজ ফাটাইয়া এক রাত্রে বাহির হয় তাহারই মত। সে পা বাড়াইয়া কিন্তু পর-মুহূর্তেই নিদারুণ ভয়ে আতঙ্কিত হইয়া একটা চীৎকার করিয়া উঠিল। লঘু দ্রুত পদক্ষেপে পাশ দিয়া চলিয়া গেল কে? না, কেহ নয়, প্রেত নয়, ডাকাত নয়, একটা শেয়াল। তাহার চীৎকারে ভয় পাইয়া শেয়ালটা ছুটিয়া পলাইতে আরম্ভ করিল। পানু বিস্ফারিত দৃষ্টিতে শেয়ালটার দিকে চাহিয়া রহিল। কিছু দূর গিয়া শেয়ালটা দাঁড়াইয়া পিছন ফিরিয়া বোধ হয় পানুকেই ভাল করিয়া দেখিয়া লইল, তারপর ধীর পদক্ষেপে আবার অগ্রসর হইল সম্মুখের পথে ওই ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়া। পানু যেন বাঁচিয়া গেল, শেয়ালটার মধ্যেই সে খুঁজিয়া পাইল দোসর,—সঙ্গে সঙ্গে ওই জঙ্গলের ভিতর দিয়া সেও আগাইয়া চলিল।

জঙ্গলের মধ্যে অন্ধকার প্রগাঢ়তর, যেন অখণ্ড; মনে হয় যেন হারাইয়া গিয়াছি। তবু কিছুখানি পথ চলিয়াই পানু অনুভব করিল, অন্ধকার তাহার সাহসের কাছে হার মানিয়াছে; সে যেন স্পষ্ট দেখিল, অন্ধকারের অন্তরের সকল ভয়ঙ্কর স্তব্ধ হইয়া তাহাকে পথ দিয়া সরিয়া দাঁড়াইতেছে। সে যেমনি আগাইয়া চলিয়াছে তেমনি তাহার পাশের জঙ্গলের পতঙ্গ-কীটের ডাক বন্ধ হইয়া যাইতেছে; পাতার উপর খরখর শব্দে বোধ হয় সাপ চলিতেছিল, পানুর পায়ের শব্দে সে শব্দ বন্ধ হইল; খ্যাক-খ্যাক শব্দে শেয়ালেরা ঝগড়া করিতেছিল, মুহূর্তে ঝগড়া বন্ধ হইয়া গেল, নিঃশব্দে তাহারা ছুটিয়া পলাইল; প্রেতাত্মার করুণ কান্না, নিষ্ঠুর অট্টহাসি, রহস্যময় পঞ্চরণের কানাকানি সব স্তব্ধ, কোথাও কিছু নাই। ক্রমশ নির্ভয় পদক্ষেপে বটগাছটার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। স্থির দৃষ্টিতে বটগাছটার দিকে চাহিয়া স্তম্ভকাণ্ডময় তলদেশ হইতে নিবিড় পুঞ্জিত অন্ধকারের মত উপরের ঘনপল্লব আচ্ছাদনীর সমস্তটা দেখিয়া লইল। কেহ কোথাও নাই, কোথাও কিছু নাই। সব তাহার ভয়ে লুকাইয়াছে। পানু হা-হা করিয়া উচ্চ হাসিতে স্তব্ধ অন্ধকারটাকে সচকিত করিয়া তুলিল। ভয়ের অস্তিত্বে বিশ্বাস হারানোর জন্য নয়, ভয়কে জয় করার উন্মাদনায় সে সেদিন অট্টহাসি হাসিয়াছিল। ভয়কে সেদিন সে সেই মুহূর্তে জয় করিয়াছিল। ভয়ের কথা হইলে সেই অট্টহাসি সে আজও হাসে। জীবনে অভয় সে পায় নাই, কিন্তু সেই দিন হইতে সে নির্ভয়। পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত দর্পিত পদক্ষেপে সে অতিক্রম করিতে পারে, অন্তত তাহার নিজের এই বিশ্বাস। সে অট্টহাসিতে তাহার নিজেরই সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ দেখা দিয়াছিল।

পরদিন বেলা দশটা নাগাদ পানু আসিয়া পৌঁছিল সদর শহরে। তখন তাহার মূর্তি হইয়া উঠিয়াছে অদ্ভুত। লাল ধূলায় সর্বাঙ্গ আচ্ছন্ন, কাপড় লাল, জামা, বুক, পিঠ, মুখ ধূলা ও ঘামের সংমিশ্রণে লাল কাদার দাগে বিচিত্রিত, ভুরু ও মাথার চুল লাল ধূলায় পিঙ্গল। দীর্ঘ-পথ-হাঁটার পরিশ্রমে, রাত্রিজাগরণের অবসাদে চোখের ক্ষেত রাঙা, দৃষ্টি রুক্ষ; আক্রোশ ক্রোধ ভয় হতাশার দ্বন্দ্বে মনের যন্ত্রণার অভিব্যক্তির ছাপে তাহার কালো গোল শ্রীহীন মুখখানা বিকৃত হইয়া এমন কুৎসিত হইয়া উঠিয়াছে যে, দেখিয়া মানুষের মন মুহূর্তে বিরূপ হইয়া উঠে। পানু কিন্তু আপনার এ অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অচেতন, এসব কথা পানুর ভাবিবার অবসর পর্যন্ত নাই। পথের পাশে পুকুর অনেক পড়িয়াছে, কিন্তু সে সব পানুর চোখে পড়ে নাই; তাহার দৃষ্টি আবদ্ধ ছিল পাকা সড়কটার দূরবর্তী মধ্যস্থলে, যেখানে পথটির পার্শ্ববর্তী দুইটি সমান্তরাল রেখা একটি বিন্দুতে মিশিয়া গিয়াছে বলিয়া ভ্রম হয়, সেইখানে।

শহরে ঢুকিতেই শহরতলীর সামান্য একটু বাজার, তারপর রেল-লাইন; রেল-লাইন পার হইয়া সাহেবদের গোরস্থান; গোরস্থানের পরই বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে কতকগুলা লম্বা একতলা বাড়ী। পানু এতক্ষণে চমকিয়া দাঁড়াইল। তাহার মনে প্রশ্ন জাগিল, কোথায় পুলিস সাহেব থাকে, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কুঠিই বা কোথায়? তাহার কানে আসিল কাহারও জোর উচ্চ আদেশধ্বনি। আবার তাহার মন ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। অন্ধকার, ভূত-প্রেত, জানোয়ার, সরীসৃপ এদের ভয়কে সে জয় করিয়াছে, কিন্তু মানুষের ভয় একতিল কমে নাই। পরক্ষণেই তালে তালে একটা কঠোর উচ্চ শব্দ ধ্বনিত হইতে আরম্ভ করিল—মনে হইল কোন একটা প্রকাণ্ড পাহাড়ের মত মানুষ অথবা দৈত্য জোরে জোরে পা ফেলিয়া আশে-পাশে কোথাও আসিতেছে। আরও কিছুক্ষণ পর পানুর নজরে পড়িল একটা লম্বা দালানের আড়াল হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে সারিবদ্ধ সিপাহীর দল। হাঁ, সিপাহী। পরনে হাফপ্যাণ্ট, গায়ে হাতকাটা খাকী কামিজ, মাথায় খাকী পাগড়ী, পায়ে পট্টি ও জুতা, কাঁধে বন্দুক, সারি বাঁধিয়া তালে তালে সকলে একসঙ্গে পা ফেলিয়া চলিয়া আসিতেছে। আর্মড পুলিস। মুহূর্তে পানুর বুকের ভিতরটা প্রচণ্ডতম ভয়ে অধীর অস্থির হইয়া উঠিল। জমাদারের সগোত্র—ইহারা সকলেই যেন জমাদার। মুখে চোখে পদক্ষেপে তেমনি কর্কশতা, তেমনি রূঢ়তা, তেমনি হিংস্রতা। অন্ধকারের বুকের মধ্যে পানুর সম্মুখে ভয়ঙ্করের যে মুখ মিশাইয়া গিয়াছিল, সেই ভয়ঙ্কর মূর্তিমন্ত হইয়া অকস্মাৎ উন্মুক্ত দিবালোকে কঠোর দীর্ঘ পদক্ষেপে দলবদ্ধ হইয়া তাহারই দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে বলিয়া পানুর মনে হইল। পর-মুহূর্তেই সে ছুটিতে আরম্ভ করিল। পথ ধরিয়া নয়, মাঠের মধ্য দিয়া।

খানিকটা মাঠ পার হইয়া আসিয়া একটা প্রান্তরের মধ্যে কতকগুলি বাড়ী পাইয়া পানু হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। বেশ নূতন ঝকমকে কতকগুলি বাড়ী, কতক সম্পূর্ণ, কতক সম্পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে, কতক তৈয়ারী হইতেছে। শহরের প্রান্তে নূতন শহরবাসীদের একটি পাড়া গড়িয়া উঠিতেছে। একটা সম্পূর্ণ-হইয়া-যাওয়া বাড়ীর দাওয়ায় সে বসিয়া পড়িল। মনে মনে সে নিষ্ঠুর আক্রোশে ওই সিপাহীর দলকে গালাগালি দিতে আরম্ভ করিল। তাহার মনের অবস্থা এক রাত্রেই অদ্ভুত হইয়া উঠিয়াছে। ভয়কে গতরাত্রে সে জয় করিয়াছিল মনে হইয়াছিল,—কিন্তু ভয় তাহার যায় নাই; কিন্তু ভয়ের কারণে আপনাকে একান্ত অসহায় ভাবিয়া অভিমানাহত প্রার্থনার সুরে আগে সে যেমন করিয়া ভাঙিয়া পড়িত, কাঁদিয়া উঠিত, তেমন ভাবে কান্নাও আর আসিতেছে না। এমন কি সিপাহীগুলো যদি তাহাকে ধরিয়াও ফেলিত, তবুও সে কাঁদিত

না, তাহাদের পায়ে ধরিত না ইহা নিশ্চিত। সমস্ত রাত্রি খায় নাই পানু, পেটটা তাহার জ্বলিয়া যাইতেছিল। এমন সুন্দর ঝকঝকে বাড়ী, ইহারা চারিটি খাইতে দিবে না? সে প্রায় মরীয়া হইয়াই ডাকিল—বাবু! বাবু! বাবু!

কেহ সাড়া দিল না। আবার সে ডাকিল—মা! মা! মা-ঠাকরুণ! তবুও কেহ সাড়া দিল না। এবার সে দুয়ারে ধাক্কা দিয়া ডাকিল—বাবু! বাবু! মা-ঠাকরুণ!

—কে? এবার ভিতর হইতে সাড়া আসিল।

—কাল থেকে কিছু খাই নাই বাবু। দয়া করে দুটি—

দরজা খুলিয়া এবার বাহির হইয়া আসিলেন এক ভদ্রলোক। পানুর আপাদ-মস্তক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিয়া লইয়া প্রশ্ন করিলেন—বাড়ী কোথা তোর?

—আজ্ঞে, রত্নপুর।

—রত্নপুর? থানা রত্নপুর?

—আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু।

—কাদের ছেলে তুই? কি জাত?

—আজ্ঞে গন্ধবণিক।

—গন্ধবণিক? বেণে? কি নাম তোর?

—আমার নাম প্রাণকৃষ্ণ দে। কাল থেকে খাই নাই বাবু, আমাকে চারটি খেতে দেন।

—হুঁ। ভদ্রলোক খানিকটা ভাবিয়া লইয়া বলিলেন—চাকরি করবি?

চাকরি? কথাটা পানুর কাছে এমন আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিত যে সে অবাক হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ভদ্রলোক আবার বলিলেন—কি, চাকরির নামেই চুপ করলি যে? ভিক্ষে বড় মজার জিনিস, না? হরি বললেই কাঁড়া বালাম চাল মেলে যখন, তখন আকাঁড়া চালের ভাত খাব কেন—চাকরি কে করে? অ্যাঁ? এদিকে গতর তো বেশ! ভাগ্। বলিয়া সঙ্গে সঙ্গেই তিনি দরজাটা বন্ধ করিয়া দিতে উদ্যত হইলেন।

পানু তাড়াতাড়ি ডাকিল—বাবু!

—কি?

—আমি চাকরি করব। আমাকে চারটি খেতে দেন।

—খেতে পাবি, মাইনে দেড় টাকা, বছরে দু জোড়া কাপড়।

পানু ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল, তাহাতেই সে রাজী।

—আয়, তবে ভেতরে আয়। ঘরদোর পরিষ্কার করতে হবে, কাপড় কাচতে হবে, কুয়ো থেকে জল তুলতে হবে।

—আজ্ঞে, করব।

—ওগো, এই ভিখারী ছোঁড়াটাকে চারটি মুড়ি দাও তো।

এবার গৃহিণী বাহির হইয়া আসিলেন। পানুর দিকে চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন—এ তো ভিখিরীর ছেলে নয়।

—না হোক, ক্ষেতি কি! চাকরি করবে, মাইনে নেবে, বাস্।

গৃহিণী হাসিয়া সস্নেহেই বলিলেন—তোমার বাপ-মা আছে তো খোকা?

পানুর বুকের মধ্যে এতক্ষণে একটা উচ্ছ্বাস জাগিয়া উঠিল, সে কথা বলিতে পারিল না, ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল—আছে।

—বাড়ী থেকে রাগ করে পালিয়ে এসেছ?

ঘাড় নাড়িয়া পানু জবাব দিল, না, রাগ করিয়া আসে নাই।

—তবে ?

কর্তা মারাত্মক রকম চটিয়া উঠিয়া বলিলেন—চুলোয় যাকগে তবে। দাও, দুটো মুড়ি দাও ছোঁড়াটাকে। মুড়ি খেয়ে—এই ছোঁড়া, মুড়ি খেয়ে কুয়ো থেকে জল তুলে এই গাছগুলোর গোড়ায় দে। বুঝলি ?

পানু ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, তাই দিবে সে।

একখানা শালপাতায় কতকগুলি মুড়ি ও একটু গুড় দিয়া গৃহিণী বলিলেন—ওই চৌবাচ্চার জলে হাত-পাটা ধুয়ে ফেল বাছা। নোংরা জামাটা খুলে রাখ, কেচে ফেলবি আজ।

সম্মুখে আহার্য পাইয়া পানুর আর কোন কিছুই মনে হইল না। আহার্য ও তাহার মধ্যে যেটুকু আদেশের বাধা ছিল, সেটুকু তৎক্ষণাৎ পালন করিয়া সে মুড়ির পাতাটার সম্মুখে ক্ষুধার্ত জানোয়ারের মত বসিয়া পড়িল। আদেশমত হাতমুখ ধুইয়া, জামাটা খুলিয়া সে বসিয়া গেল।

গিন্নী শিহরিয়া আতঙ্কিত কণ্ঠস্বরে প্রশ্ন করিলেন—আহা বাছা রে! হ্যাঁরে তোকে এমন করে কে মেরেছে রে ?

পুলিসের বেতের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত পিঠটার কথা পানুর মনে ছিল না, এমন কি জামা খুলিবার সময়ও যে বেদনা ঘনাইয়া উঠিয়াছিল সে বেদনাও তাহাকে সচেতন করিয়া তুলিতে পারে নাই। গিন্নীর কথার উত্তর দিবার তাহার সময় ছিল না; মুড়িতে জল দিয়া মুড়িগুলোকে নরম করিয়া লইয়া মাখিয়া সে গ্রাসের পর গ্রাস গিলিতে লাগিল।

গিন্নী আবার প্রশ্ন করিলেন—পানু!

কয়েক গ্রাস গিলিয়া খানিকটা জল খাইয়া পানু বলিল—আঃ!

—এমন করে কে মেরেছে রে ?

আর একটা বড় গ্রাস মুখে তুলিবার ঠিক পূর্ব-মুহূর্তেই পানু বলিল—পুলিসে। বলিয়া সে গ্রাসটা মুখে পুরিয়া ফেলিল।

তিন

ভদ্রমহিলা সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন—পুলিসে ?

বুভুক্ষু পানুর সমস্ত মুখটা ভরিয়া ঘুরিতেছিল—মুড়ি-গুড়ের দলা; কথা বলার উপায়ও ছিল না, ইচ্ছাও ছিল না। কর্ত্রীর কণ্ঠস্বরের বিস্ময়ে তাঁহার চর্বণ মুহূর্তে বন্ধ হইয়া গেল। সে বুঝিল, সে অন্যায় করিয়া ফেলিয়াছে। আহার্যভরা মুখেই আতঙ্কিত দৃষ্টিতে পানু কর্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

—পুলিসে মেরেছে তোকে ?

শঙ্কিতভাবে ঘাড় নাড়িয়া পানু জানাইল—হ্যাঁ।

—কেন ?

পানুর মুখ এবার দ্রুতবেগে চলিতে আরম্ভ করিল, বুভুক্ষু গরু যেমনভাবে অদূরবর্তী মানুষের সাড়া পাইয়া ফসল খাইয়া যায় তেমনি ভাবে সে গ্রাসটা গিলিয়া আবার একদলা ভিজা মুড়ি মুখে পুরিয়া দিল।

বাড়ীর কর্ত্রী আবার প্রশ্ন করিলেন—কারও বাড়ী কিছু চুরি করেছিলি বুঝি ?

ঘাড় নাড়িয়া পানু জানাইল—না। এবং চোখ মুছিয়া সে গ্রাসটাও কোঁৎ করিয়া গিলিয়া ফেলিল।

—তবে? তবে তোকে মারলে কেন তারা?

ভিজা মুড়ি-গুড়ের বড় দলাটা কণ্ঠনালীর মধ্য দিয়া অতি কষ্টে যাইতেছিল—নাটের মধ্য দিয়া কড়া বোল্টুর মত; দম যেন বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। পানু জলের ঘটিটা তুলিয়া খানিকটা জল মুখে ঢালিয়া দিয়া বুকে হাত বুলাইতে আরম্ভ করিল।

কর্ত্রী এবার ডাকিলেন—ওগো, বলি শুনছ? কানের মাথা খেয়েছ না কি?

কর্তা আসিয়া মুখ খিঁচাইয়া বলিলেন—এমন করে চেঁচাচ্ছ কেন? বাইরে যে মক্কেল এসেছে। ভদ্রলোক মোক্তার।

—চেঁচাচ্ছি সাধে। ওই দেখ।

—কি?

—ছোঁড়ার পিঠে।

কর্তাও শিহরিয়া উঠিলেন—আরে বাপ রে! এ কি?

—পুলিসে মেরেছে ওকে।

—পুলিসে?

—হ্যাঁ।

—কেন?

—তা বলছে না। গোগ্রাসে শুধু গিলেই যাচ্ছে।

—চোর নয় তো? এই ছোঁড়া। চুরি করেছিলি না কি?

ঘাড় নাড়িয়া পানু উত্তর দিল—না। তখনও সে খাইয়া চলিয়াছে।

—তবে? এই ছোঁড়া! এই! উত্তর না পাইয়া এবার তিনি বকরাক্ষস যেমন ক্রোধ-ভরে আহাররত ভীমকে চাপিয়া ধরিয়াছিল, তেমনি ভাবেই পানুর হাত চাপিয়া ধরিলেন—এই ছোঁড়া!

কর্তা যখন এইভাবে পানুকে নির্যাতন করিতে উদ্যত হইলেন, তখন কিন্তু কর্ত্রী প্রতিবাদ করিয়া উঠিলেন—ও কি? তুমি মানুষ, না অসুর? খেতেই দাও আগে।

কর্তা কঠিন ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—কি বললে, আমি অসুর?

—খাচ্ছে বেচারা, খেতেই দাও আগে।

—তা হলে তুমিও তো ওর খাবার পর চিলের মত চেঁচাতে পারতে। তুমি চেঁচালে কেন?

গৃহিণী এবার মোক্ষম উত্তর প্রয়োগ করিলেন; হাত জোড় করিয়া বলিলেন—ঘাট হয়েছে, আমার ঘাট হয়েছে। ঘাট মানছি আমি।

কর্তা স্তব্ধ হইয়া গেলেন।

গৃহিণী বলিলেন—পুলিসে ছেলেটাকে এমন করে মেরেছে, দেখে আমি চীৎকার করে তোমাকে ডেকেছি—আমার ঘাট হয়েছে।

কর্তা বিপদাপন্ন হইয়া পড়িলেন। অকপট ভাবেই আপনার অসহায় অবস্থা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া ফেলিলেন—কি বিপদ!

গৃহিণী বলিলেন—তুমি মোক্তার। পুলিসে এমনি করে দুধের ছেলেকে মেরেছে, তাই তোমাকে দেখাবার জন্যে চীৎকার করে ডেকেছি, আমার ঘাট হয়েছে।

কর্তা এবার বলিলেন—ওঃ, ব্রুটাল অ্যাসাল্ট! নে রে ছোঁড়া, খেয়ে নে, তোকে আমি

নিয়ে যাব ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে, এস্. পি-র কাছে।

পানুর আর খাওয়া হইল না। সে দুই হাতে কর্তার পায়ে ধরিয়া হাউহাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল—আমাকে মেরেছে, আমার বাবাকে মেরেছে, আমার দিদিকে মেরেছে, আমার দাদাকে মেরেছে। বাবু!—সে তাহার অশ্রুসিক্ত কুৎসিত স্থূল মুখখানা উপরের দিকে তুলিয়া কর্তার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

—নে নে, আগে খেয়ে নে।

—আর খেতে পারব না আমি। পানু ফোঁপাইতে আরম্ভ করিল।

কর্তা বলিলেন—না পারিস তো গরুর ডাবায় দিয়ে আয়, যা।

গৃহিণী বলিলেন—গরুর ডাবায় দিয়ে আসবে? মুড়ি গুড় ভারি সস্তা, না। এই ছেলে, খেয়ে নে বলছি। নইলে ভাল হবে না। খেয়ে নে। তর্জনী নির্দেশ করিয়া তিনি কঠিন হইয়া দাঁড়াইলেন এবার।

পানু ঘাড় নাড়িয়া বলিল—না, আর খেতে পারব না।

—খুব পারবি। পেটটা তোর এখনও ধক্‌ধক্ করছে। খেয়ে নে। না যদি পারবি তো গোড়ায় দেবার সময় বললি নে কেন তুই? শহরের ধান চাল ঘাসের বীজ নয়। খেয়ে নে বলছি।

কাঁদিতে কাঁদিতেই পানুকে মুড়িগুলি শেষ করিতে হইল।

গৃহিণী বলিলেন—বল এইবার কি হয়েছে! কর্তাকে বলিলেন—তুমি ওইখানে বস। তা হলে আমারও শোনা হবে। ওই মোড়াটা নাও না টেনে।

সমস্ত শুনিয়া গৃহিণীর চোখ বিস্ফারিত হইয়া উঠিল।

কর্তা গম্ভীর চিন্তিত বাঁ হাতের মুঠায় দাড়িহীন চিবুকটা ধরিয়া রঙ্গমঞ্চের কুটিল বাদশাহের ভূমিকায় অভিনেতার মত মৃদু ঘাড় নাড়িয়ে আরম্ভ করিলেন—হুঁ! তারপর একটা পাক মারিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—তোকে আজই আমি নিয়ে যাব ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে।

গৃহিণী বলিলেন—হ্যাঁ গা! ওরা কি—

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কর্তা বলিলেন—অ্যাঁ?

—ওরা কি সত্যিই—? এই ছোঁড়া, যা না, বাইরে গিয়ে বোস না।

—বালতি নিয়ে গাছগুলোয় জল দিয়ে দে ততক্ষণে। আমি স্নান করে নিই।

পানু বাহিরে যাইতে যাইতে শুনিল, গৃহিণী বলিতেছেন—সত্যি ওরা খুন করেছে না কি?

কর্তা বলিলেন—সমস্ত আমি টেনে বের করব। তুমি দেখ না। কেসটা নিয়ে তুমুল কাণ্ড করব আমি। ছোঁড়াটার উপর নজর রেখো একটু, না পালায় যেন।

—না। ওরকম ছেলেকে আমি ঘরে ঠাঁই দেব না।

—কি বিপদ!

গৃহিণী চিৎকার করিয়া উঠিলেন—না না না।

* * * *

পানু ছুটিয়া আসিয়াছিল দুরন্ত ক্রোধে। মনে মনে সংকল্প করিয়াছিল—সাহেবের পায়ে সে আছাড় খাইয়া পড়িবে। ওই কর্তাটির কাছেও সে একরূপ সকাতর উচ্ছ্বাসে গড়াইয়া পড়িয়াছিল—হাত জোড় করিয়া হাউমাউ করিয়া কাঁদিয়াছিল। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে আসিয়া সে যেন পঙ্গু হইয়া গেল। উর্দি-পরা পিওন, প্রহরারত কন্‌স্টেবল, সাহেবের ঘরের অস্বাভাবিক স্তব্ধতা, তাঁহার গম্ভীর ভাবলেশহীন মুখ দেখিয়া একটা দুরন্ত ভয় তাহাকে

যেন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তাহার পা দুইটা ঠকঠক করিয়া কাঁপিতেছিল। মোক্তারবাবু তাহার ময়লা জামাটার প্রান্তদেশ টানিয়া তাহার ক্ষতবিক্ষত পিঠটা দেখাইলেন। সাহেবের মুখে সহানুভূতির প্রকাশ প্রত্যাশা করিয়াই পানু তাঁহার মুখের দিকে চাহিল। কিন্তু সাহেবের মুখ ভাবলেশহীন, কোন একটি নূতন রেখাও সেখানে ফুটিয়া উঠিল না। শুধু একখানা কাগজ টানিয়া লইয়া খসখস করিয়া কি লিখিয়া মোক্তারের হাতে দিলেন। সাহেব তদন্তের ভার দিলেন এস. ডি. ও-র উপর, পুলিস সাহেবকেও লিখিলেন বিভাগীয় তদন্তের জন্য। পুলিস সাহেবের আপিসে আসিয়া পানুর ইচ্ছা হইল, সে ছুটিয়া পলাইয়া যায়। খাকী পোশাক পরা কত দারোগা এখানে! বাহিরে বারান্দায় কনস্টেবল গিস্‌গিস্ করিতেছে! যে দুরন্ত ভয় সে তাহাদের থানা হইতে সঞ্চয় করিয়া আনিয়াছে, যাহার প্রতিক্রিয়ায় উন্মুক্ত প্রান্তরে তাহার ক্রোধের আর সীমা ছিল না, যাহার আবেগে সে এতটা দীর্ঘপথ রাত্রির অন্ধকারে অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে, সেই ভয় যেন শতগুণে বাড়িয়া গিয়া তাহার বুকের উপর পাহাড়ের মত চাপিয়া বসিল। ব্যাপারটা শুনিয়া ইন্সপেক্টর এবং সাব-ইন্সপেক্টরের দল তাহার দিকে একবার তির্যক দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল। পানুর মনে হইল, উহাদের ওই তির্যক দৃষ্টির মধ্যে কঠিন আক্রোশ লুকানো রহিয়াছে।

পুলিস সাহেব ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের নোট পড়িয়া মোক্তারবাবুকে কি ইঙ্গিত করিলেন। মোক্তার আবার তাহার জামাটা টানিয়া তুলিয়া প্রহারের চিহ্নগুলি দেখাইলেন। সাহেব বাংলাতেই প্রশ্ন করিলেন—কে মেরেছে? সাহেব বাঙালী।

পানু হাঁ করিয়া মুখে নিশ্বাস লইতেছিল, নাক দিয়া নিশ্বাস লইয়া সে যেন কুলাইতে পারিতেছিল না। কোন উত্তর সে দিতে পারিল না, ফ্যালফ্যাল করিয়া সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

মোক্তারবাবু বলিলেন—কে মেরেছে বল?

সাহেব বলিলেন—ভয় নেই; বল তুমি, বল।

শুষ্ককণ্ঠে পানু বলিল—জল!

সাহেব পিওনকে বলিলেন—পানি দো। পানি।

এক নিশ্বাসে এক গ্লাস জল খাইয়া পানু বলিল—জমাদারবাবু।

সাহেব সমস্ত শুনিয়া পানুকে সঁপিয়া দিলেন একজন ইন্সপেক্টারের হাতে। হুকুম দিলেন, একজন কনস্টেবল সঙ্গে দিয়া উহাকে তাহাদের থানার সার্কেলের ইন্সপেক্টারের কাছে পৌঁছাইয়া দাও; ইন্সপেক্টারকে নোট দিলেন—অবিলম্বে বিভাগীয় তদন্ত কর।

মোক্তার চেষ্টা করিলেন পানুকে নিজের কাছে রাখিবার জন্য; কিন্তু সাহেব বলিলেন—এর জন্যে আপনি জেদ করবেন না। ওকে মেরেছে এ তদন্তের চেয়ে জরুরী তদন্তে ওকে আমাদের দরকার আছে। খুনের তদন্তে ওকে আমাদের বিশেষ প্রয়োজন আছে বলেই মনে হয়।

পানুর মনে হইল, তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া সাহেব তাহাকে পাঠাইয়া দিলেন তাহাদেরই থানায় সেই দারোগার কাছে, সেই জমাদারের কাছে।

মাটির পৃথিবীর মোহাচ্ছন্ন মানুষ; মায়া-মমতা, স্নেহ-প্রেম, রাগ-রোষ, হিংসা-আক্রোশ তাহার হৃদয়গত সম্পত্তি; মানুষের আক্রোশ মানুষ সহ্য করে, তার সঙ্গে মানুষ লড়াই করে, কখনও হারে কখনও জেতে; মানুষের সে সহ্য হয়। কিন্তু পক্ষপাতশূন্য শাসনকার্যের জন্য, সূক্ষ্ম বিচারের জন্য মানুষ যখন শাসকের আসনে বসিয়া মায়া-মমতা, স্নেহ-

প্রেম, রাগ-রোষ, হিংসা-আক্রোশ সব ত্যাগ করিয়া নিরপেক্ষ নির্বিকার হইয়া বসে তখন সাধারণ মানুষ তাহাকে সহ্য করিতে পারে না। ভগবানের মতই সে তাহাকে ভয় করে। তেমনি ভয়ে আচ্ছন্ন হইয়া পানু কনস্টেবলের সঙ্গে চলিয়া ছিল। ভগবানের বিচার, আপন কর্মের প্রতিফলও যেমন মানুষের অসহ্য হইয়া উঠে, মধ্যে মধ্যে তেমনিভাবেই বর্তমান অবস্থাটা তাহার অসহ্য বলিয়া মনে হইতেছিল। অদৃষ্টের কঠিন নির্যাতনে বিদ্রোহী হইয়া মানুষ যেমন মধ্যে মধ্যে আত্মহত্যা করিয়া বসে, তেমনি ভাবেই তাহারও মনে হইতেছিল ট্রেন হইতে লাফাইয়া পড়িয়া মরিয়া যায়।

কনস্টেবলটির কাজটা মোটের উপর কঠিন কাজ ছিল না। এক ফোঁটা একটা ছেলেকে ট্রেনে চড়াইয়া সদর শহর হইতে মফঃস্বলের একটা শহরে সার্কেল ইন্সপেক্টারের আপিসে পৌঁছাইয়া দেওয়া। সে খইনি টিপিতে টিপিতে গান ধরিয়াছিল। গরমের দিনে সন্ধ্যার পর ট্রেনে বেশ আরামই বোধ হইতেছিল। মধ্যে মধ্যে সে পুলিসোচিত তদন্ত-কৌশলের পরিচয়ও দিতেছিল। পানুর সঙ্গে মিষ্টি কথায় আলাপ জমাইয়া খুনের সত্য সূত্র আবিষ্কারের চেষ্টা করিতেছিল।

—আরে, বোল্ না। এই ছোকরা!

—অ্যাঁ?

—বোল্ না! তোহার বাপকে সরকারী সাক্ষী করিয়ে দিবে, কে—কে খুন করলে—বোল্ না?

—আমি জানি না। সে ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

—জানিস না তো কানছিস কাহে? আঁ? আরে! তোরা বাপকে সাজা হোবে বোলে কানছিস? সমঝিয়েছি আমি। জরুর জানিস তু।

পানু তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া চুপ করিল।

কনস্টেবলটি কিছুক্ষণ পর আবার বলিল—আরে। আঁ! বোল্ না কি জানিস তু?

এবার সবিনয়ে ম্লান হাসি হাসিয়া পানু বলিল—আজ্ঞে না, আমি জানি না।

কনস্টেবলটিও হাসিয়া বলিল—জানিস তু। জরুর জানিস। তু হাসছিস!

পানুর এবার ইচ্ছা হইল, সে ওই কনস্টেবলটার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়ে। কিন্তু জমাদারের কথা মনে করিয়া সে শিহরিয়া উঠিল।

গাড়ীটা সেই মুহূর্তেই আসিয়া থামিল একটা স্টেশনে। সেটা একটা রেলওয়ে জংশন। এইখানে গাড়ী বদল করিয়া অন্য গাড়ীতে চড়িতে হইবে। দেরি ছিল। কনস্টেবল তাহাকে এক জায়গায় বসাইয়া একটা ঠোঙায় কিছু খাবার কিনিয়া দিল। সরকার হইতে এ জন্য পয়সা দেওয়া হইয়াছিল। নিজেও খাবার কিনিয়া খাইয়া আরাম করিয়া বসিয়া একটা বিড়ি ধরাইল।

ছোট জংশন স্টেশন। রাত্রিকাল। প্ল্যাটফর্মে কয়েকটা আলো জ্বলিতেছে, তবুও সমস্ত স্থানটা প্রায় অন্ধকারে আচ্ছন্ন। গ্রীষ্মের দিন, যাত্রীর দল এখানে ওখানে আপন-আপন মোটের উপর ঠেস দিয়া বসিয়া ঢুলিতেছে। পানুরও ঘুম পাইতেছিল সেও ঢুলিতেছে। কনস্টেবলটি তাহাকে বলিল—কি রে? ঘুমাইবি?

পানু বলিল—হ্যাঁ।

—আভি ট্রেন আসবে, ঘুমাস না।

পানু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সজাগ হইয়া বসিল।

—হাঁ রে পানুয়া! একটা বাত সাচ বোল্ দেখি?

পানু তাহার মুখের দিকে চাহিল।

হাসিয়া কনস্টেবলটি হঠাৎ তাহার বুকের উপর হাত দিল, হৃদ্‌স্পন্দন অনুভব করিয়া বলিল—হ্যাঁ, ঠিক জানিস তু। আরে বাপ রে, কলিজার অন্দরে তোহার ট্রেন চলছে রে! ঠিক জানিস তু।

পানুর আর সহ্য হইল না। মুহূর্তে আত্মহত্যাকামী উন্মত্তের মতই স্থান কাল, তাহার নিজের শক্তি, ক্ষমতা, সমস্ত বিস্মৃত হইয়া লাফাইয়া উঠিয়া বিদ্যুদ্বেগে ছুটিল সম্মুখের দিকে।

—আরে! আরে! কনস্টেবলটিও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া ছুটিল—আরে!

জ্ঞানশূন্য পানু ছুটিয়াছে। প্ল্যাটফর্ম পার হইয়া রেল-লাইন। অন্ধকারের মধ্যেও লাইন পার হইয়া সে ছুটিল। কিন্তু হঠাৎ একটা কিছুতে হুঁচোট খাইয়া রেল-লাইনের মাটির বাঁধ ডিঙাইয়া অতল একটা গহ্বরের মধ্যে যেন গড়াইয়া পড়িয়া গেল। একটা মাটি-কাটা খাদের মধ্যে পড়িল। সেইখানেই সে পড়িয়া রহিল চেতনাহীনের মত। কঠিন আঘাতে তাহার সমস্ত শরীর ঝিমঝিম করিতেছে; স্টেশনে শোরগোল শোনা যাইতেছে। চারিপাশে কোলাহল কলরব ঘুরিয়া বেড়াইল কিছুক্ষণ। তারপর সরিয়া গেল। পানু তখন অসাড়।

কতক্ষণ পর তাহার জানার কথা নয়। কৃষ্ণপক্ষের আকাশে তখন কাস্তের মত এক কালি চাঁদ উঠিয়াছে। পানুর মনের সাড় ফিরিয়া আসিল। সমস্ত কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। ভয়ে সে শিহরিয়া উঠিল। পায়ে বুড়া আঙুলের ডগায় বিষম যন্ত্রণা। কিন্তু সে যন্ত্রণার কথা সে ভুলিয়া গেল। কান পাতিয়া সে মানুষের সাড়ার সন্ধান করিতেছিল। কিন্তু কোন সাড়াই নাই। চারিদিকে শুধু ঝিঁঝি পোকার ডাক উঠিতেছে। এবার সে খাদটা হইতে অল্প মাথা তুলিয়া চারিদিক চাহিয়া দেখিল। ওই দূরে প্ল্যাটফর্মটা। আলো সব নিভিয়া গিয়াছে। জাগ্রত মানুষের কোন চিহ্নই দেখা যায় না। কেহ দাঁড়াইয়া নাই, কেহ বসিয়া নাই, কোন শব্দও আসিতেছে না। সে একাই চতুষ্পদের মত হামাগুড়ি দিয়া খাদ হইতে উঠিয়া আসিল। যথাসাধ্য লাইনটাকে পাশে আড়াল রাখিয়া সে সেই আহত পায়েই খোঁড়াইয়া চলিতে আরম্ভ করিল। দিক ঠিক নাই, কিছুদূর আসিয়া চোখে পড়িল একটা জঙ্গলের মত ঘন কালো কিছু, সেই দিকেই সে অগ্রসর হইল।

চার

তারপর আর তাহার মনে নাই। কেমন করিয়া, কোন্ পথ দিয়া, কয় দিন বা কয় ঘণ্টা হাঁটিয়া সে কোথায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিল, তাহার কোন স্মৃতিই তাহার মনের মধ্যে নাই, অত্যন্ত অস্পষ্টভাবেও কিছু মনে পড়ে না। বন্দুকের গুলিতে আহত পাখী যখন কিছুদূর উড়িয়া গিয়া লুটাইয়া পড়ে, তখন যেমন তাহার আপনার ভীষণতম অবস্থা সম্বন্ধে সচেতনতা থাকে না, কোন্ দিক দিয়া কোন্ আশ্রয়ের দিকে উড়িয়া চলিয়াছে তাহারও কোন হিসাব থাকে না, থাকে শুধু ভয়ঙ্কর শব্দের স্মৃতি, যাহার নিষ্ঠুরতম আঘাত হইতে সঞ্জাত প্রচণ্ড ভয়াতুর জীবনের একমাত্র মৌলিক কামনা—বাঁচিবার উন্মত্ত আশায় পলায়নের চেষ্টা—তেমনি একটা উন্মত্ত চেষ্টার অচেতনতার মধ্যে সে পায়ের ওই কঠিন আঘাত লইয়াও পলাইয়াছিল।

তাহারই মধ্যে আসিয়াছিল জ্বর। সেই জ্বরে তাহার স্মৃতির সচেতনতা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু তবুও ভয় যায় নাই। তাহাদের গ্রামের থানা হইতে এই স্টেশন পর্যন্ত প্রতি পদক্ষেপেই তাহার ভয় বাড়িয়া গিয়াছিল। কাঁদিলে পরিত্রাণ নাই, হাসিলে পরিত্রাণ নাই, না-হাসিয়া না-কাঁদিয়া সকরুণ ভাবে 'না' বলিলেও বিশ্বাস করে না, এই অবস্থায় সে জলে-ডোবা মানুষের মতই হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল। তাহার দেহের প্রতিটি দেহকোষের মধ্যে বিকাশকামনায় আনন্দশিহরণ-মুখর জীবনকণিকাগুলি পর্যন্ত দুরন্ত ভয়ে দ্রুততম আবেগে আবর্তিত হইয়া তাহাকে ঐ অবস্থাতেও পলায়নের শক্তি যোগাইয়াছিল। অন্য কোন অধিকারই সে আর চায় নাই। বিচার পাইবার অধিকার না, মান-মর্যাদার অধিকার না, প্রতিবাদের অধিকার না, কেবল চাহিয়াছিল বাঁচিবার অধিকার। যখন তাহার মনে হইল সে অধিকারও তাহাকে ইহারা দিবে না, তখনই সে ছুটিয়া পলাইয়া সেই অধিকার অর্জন করিতে চাহিয়াছিল আপন শেষ এবং সকল শক্তি প্রয়োগে। জ্বরটা তাহার আসিয়াছিল কতকটা শরীরের উপর অত্যাচার এবং আঘাত হেতু, কতকটা এই নিদারুণ উত্তেজনা হেতু। সেই জ্বরে সে অচেতন হইয়া গিয়াছিল একদিন—সে দিন, ঐ ঘটনা হইতে এ দিনটি কতদিন পরে সে তাহা স্মরণ করিতে পারিল না। সে সজ্ঞান চৈতন্যে অনুভব করিল—চোখে দেখিল—একটা দুর্গন্ধময় কুঁড়েঘরে সে শুইয়া আছে। ঘরটাকে ঘর বলিয়া চিনিলেও, সে ঘর কোথায়, সে ঘর কাহার, সেও বুঝিতে পারিল না। ঠিক এই সময়ে একজন প্রকাণ্ডদেহ লোক ঘরে ঢুকিল। লোকটি যেমন কালো, দেখিতেও তেমনি ভয়ঙ্কর। পানুর দিকে চাহিয়া দেখিয়া সে দুর্বোধ্য ভাষায় কি বলিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে ঘরে আসিয়া ঢুকিল ওই পুরুষটারই অনুরূপ এক ভীষণদর্শনা মেয়ে। নাকে বড় বেসর, কানে সারি সারি মাকড়ি, মাকড়িগুলা এত ভারী যে কানের ছিদ্রগুলি নাসারন্ধের ছিদ্রের চেয়েও বড় হইয়া গিয়াছে, গলায় হাঁসুলি, পাথরের মালা, উল্কিতে চিত্র বিচিত্র মুখ—দেখিয়া পানুর সদ্যোলব্ধ চেতনা আবার যেন অসাড় হইয়া পড়িল।

নিম্নতম স্তরের যাযাবর সম্প্রদায়। পানু তাহাদের গ্রামে এই শ্রেণীর যাযাবরদের দুই-একবার দেখিয়াছে। পানুরা বলিত—হা-ঘরে।

যেটাকে পানু কুঁড়েঘর ভাবিয়াছিল, সেটা কুঁড়ে নয়—কালো কাপড়ের তাঁবু। পানুকে তাহারা অজ্ঞান অবস্থায় কুড়াইয়া পাইয়াছিল। পথ-প্রান্তর, লোকালয়, অরণ্য—সর্বত্রচারী হা-ঘরের দল এক জায়গায় তাঁবু ফেলিয়াছিল, একটা রেল স্টেশনের ধারে। সেই জংশন স্টেশনের পরের স্টেশনের কাছে। পুরুষের দল ভোরবেলায় শিকারে বাহির হইয়াছিল। সাপ গোসাপ, ইঁদুর, কাঠবেড়ালী, শেয়াল, সজারু, খরগোশ—যাহা পাওয়া যায় সন্ধান করিতে গিয়া ঐ পুরুষটি একটা জঙ্গলের মধ্যে পানুকে পাইয়াছিল। ধান দিলে খই হইয়া যায়—এমনি তখন তাহার গায়ের উত্তাপ। সম্পূর্ণরূপে অচেতন, কেবল পানুর চওড়া বুকটা উঠিতেছে নামিতেছে হাপরের মত, আর কণ্ঠনালী দিয়া বাহির হইতেছে যন্ত্রণাকাতর একটা অনুনাসিক শব্দ, জানোয়ারের মত একটা গোঙানি। ঐ পুরুষটি—বুধন—তাহাকে কুড়াইয়া আনে। বুধন ভূত প্রেত পিশাচ তাড়াইতে পারে, বহুবিধ গাছ-গাছড়া সংগ্রহ করিয়া রাখে, রোগের চিকিৎসা করে; মরা বাঁদরের, মানুষের, প্যাঁচার খুলি তাহার আছে; ধনেশ পাখীর তেল, কুমীরের দাঁত, বাঘের পাঁজরা লইয়া সে ঔষধ তৈয়ারী করে, সে যাযাবর দলের মধ্যে গুণী লোক! পানুকে দেখিয়াই সে বুঝিয়াছিল, একটা ভীষণ শক্তিশালী জিন ছেলেটাকে তাড়া করিয়া আনিয়া এইখানে তাহাকে আক্রমণ করিয়াছে। সে আপন গুণপনার প্রেরণাতেই ওই শক্তিশালী

জিনটাকে পরাজিত করিবার কল্পনা করিয়া তাহাকে কুড়াইয়া লইয়া আসিয়াছিল। জিনকে পরাজিত করিয়াছে সে।

আরও একটু গোপন গূঢ় কারণ ছিল। বুধন ছিল নিঃসন্তান। শিশু বালকের উপর তাহার একটা গভীর মমতা ছিল। তাহাদের সম্প্রদায়ের ছেলে-পিলেদের সঙ্গে তাহার একটি ঘনিষ্ঠ মধুর সম্বন্ধ ছিল—কিন্তু গোপন সম্বন্ধ। কারণ তাহাদের সম্প্রদায়ের সকলে তাহাকে শুধু খাতিরই করিত না, ভয়ও করিত। বুধন শুধু গুণী এবং চিকিৎসকই নয়, সে আরও ভয়ঙ্কর মানুষ—সে ডাইন। মানুষের রক্ত সে দৃষ্টি দিয়া শুষিয়া লইতে পারে, বিশেষ করিয়া শিশুর নধর কোমল দেহে তাহার বড় লোভ। দুই-তিন বার সে পল্লীগ্রাম হইতে ছেলে চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়িয়াছে। একবার জেল খাটিতে হইয়াছে। বাকি কয়েকবার গ্রামের লোকে তাহাকে এমন প্রহার দিয়াছিল যে, তিন-চারি দিন ধরিয়া তাহাকে অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে হইয়াছিল। এই সব কারণে সম্প্রদায়ের লোকেরা আপন আপন শিশুদের যথাসম্ভব বুধনের নিকট হইতে আগলাইয়া রাখে। মৃতকল্প পানুকে জনহীন প্রান্তরের মধ্যে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া বুধন তাহাকে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া শেষ পর্যন্ত তাহাকে কাঁধে ফেলিয়া আপন তাঁবুতে আনিয়া তুলিয়াছিল।

তাহার স্ত্রী ভয়ে বিরক্তিতে হাউ-মাউ করিয়া উঠিয়াছিল। পানুকে শোয়াইয়া দিয়া বুধন দাঁতের উপর দাঁত ঘষিয়া বলিয়াছিল—দাঁতে কামড়ে তোর নলীটা কেটে ফেলব আমি।

সম্প্রদায়ের লোকেরাও আপত্তি তুলিয়াছিল।

বুধন প্রথমটায় বলিয়াছিল, গাঁইয়ারা তো ওকে মরবে বলে ফেলেই দিয়েছে। তাদের আবার দাবি কিসের? দারোগা যদিই আসে—তোমরা বলবে।

তবুও দুই একজন আপত্তি করিয়াছিল—তোমার জন্যে এসব ফ্যাসাদ আমরা সইতে পারব না।

—চিল্লাও তো আমি বাণ জুড়ব। অত্যন্ত সহজ স্বরেই বুধন কথা কয়টি বলিয়াছিল। বাণের ভয়ে সমস্ত সম্প্রদায়টা চুপ করিয়া গিয়াছে।

পানু অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া ছিল দীর্ঘ চল্লিশ দিন। জ্বরের উপর বুকে সর্দি বসিয়াছিল। বুধনের গাছ-গাছড়া মন্ত্র আর নিজের জীবনশক্তির জোরে সে বাঁচিয়া উঠিয়াছে। যখন জ্ঞান হইল, তখন তাহার সমস্ত দেহের মধ্যে এক বিন্দু শক্তি নাই। এই অপরিচিত ভয়ঙ্কর আবেষ্টনীর মধ্যে পঙ্গুর মতই সে পড়িয়া রহিল।

কিন্তু অসহনীয় উৎকট দুর্গন্ধ তাঁবুর মধ্যে। নিরুপায় পানু। চোখে জল আসে। অল্পক্ষণ পরেই ক্লান্তিতে চোখ বন্ধ হয়, ঘুমাইয়া পড়ে বেচারা।

সকালে বেদেদের পুরুষরা বাহির হইয়া যায়; ফিরিয়া আসে ধূলি-ধূসরিত রক্তাক্ত দেহে। কাঁধে বাঁকের দুই পাশে ঝুলাইয়া আনে অনেক বড় বড় দাঁড়াস সাপ, গোসাপ, বনবিড়াল, শেয়াল, সজারু, খরগোশ; সেগুলার চামড়া ছাড়াইয়া কতক আগুনে ঝলসাইয়া লয়, কতক রান্না করে; মাংস ঝলসানোর গন্ধে পানুর দম যেন বন্ধ হইয়া যায়; ঘরের মধ্যে রান্না মাংস পচে, সেই গন্ধের মধ্যে পানুর বমি আসে।

মাথার কাছে কোথাও ঝাঁপির মধ্যে সাপ ফোঁস-ফোঁস করে। বুধন একটা গোখরো সাপকে মালার মত গলায় ঝুলাইয়া বেড়ায়। বহুদিনের ধরা প্রকাণ্ড বড় একটা সাপ। সাপটা বুধনের গলায় ঝুলিয়া থাকে আর মুখটা তুলিয়া বুক হইতে বুধনের মাথা পর্যন্ত নড়িয়া-চড়িয়া বেড়ায়।

বড় বড় শিকারী কুকুরগুলার ছিপছিপে শরীর, চোখে হিংস্র দৃষ্টি। তাঁবুর দরজায় বসিয়া ঝিমায়, সামান্য শব্দে মুখ তুলিয়া তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টি মেলিয়া দেখে। ক্ষীণতম সন্দেহ হইলেই গোঁ গোঁ শব্দ করে। কখনও কখনও প্রচণ্ড বেগে ছুটিয়া যায় কোন দিক লক্ষ্য করিয়া, আবার ফিরিয়া আসে।

নাকে বেসর, গলায় হাঁসুলী, দুর্গন্ধময় কাপড়ে কাঁচুলী পরা বুধনের স্ত্রী আসে, পানুর গায়ে-কপালে হাত বুলাইয়া দেয়, দুর্বোধ্য ভাষায় প্রশ্ন করে; উত্তর না পাইয়া ইঙ্গিতে ভঙ্গিতে প্রশ্ন জানায়—কেমন আছ?

পানু উত্তর দেয়। মিষ্ট হাসিয়া সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়া ইঙ্গিতেই জবাব দেয়—ভাল। ভাল আছি। বেদেরা পানুর ভাষা কিছু কিছু বোঝে, পানু কিন্তু একবিন্দু বুঝিতে পারে না।

পেটে হাত বুলাইয়া মুখে আহার তুলিবার ভঙ্গি করিয়া বুধনের স্ত্রী প্রশ্ন করে, ভুখ—ভুখ?

পানু বুঝিতে পারে, ক্ষুধা পাইয়াছে কিনা প্রশ্ন করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে 'ভুখ' শব্দটাও শিখিয়া লয়—ক্ষুধাই বোধ হয় ভুখ!

বুধন সত্যই গুণী ব্যক্তি। গ্রামে প্রতিপালিত এই ছেলেটির রুচির সঙ্গে তাহাদের রুচির পার্থক্য সে বোঝে। স্ত্রী বলিয়া দিয়াছে—গরুর দুধ মহিষের দুধ ছাড়া আর যেন ছেলেটাকে এখন কিছু দেওয়া না হয়। প্রথম প্রথম আহার্য দিলেই পানু সভয়ে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিত; দুধের সাদা রঙ দেখিয়াও সন্দেহ যাইত না। সে মুখের কাছে তুলিয়া শুঁকিত। কোন কিছু অপরিচিত তীব্র গন্ধের সন্ধান না পাইয়া একবার জিভ দিয়া স্পর্শ করিয়া স্বাদ অনুভব করিত। তারপর নিশ্চিন্ত হইয়া দুধটুকু খাইয়া মনে মনে গাঢ় স্নেহে প্রেমে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত ওই বুধন ও বুধনের স্ত্রীর প্রতি।

বুধনের স্ত্রী আপন বুকে হাত দিয়া বার বার তাহাকে শিখাইয়াছে—মা! মা! বুধনকে দেখাইয়া শিখাইয়াছে—বা! বা! বাবা!

শক্তিহীন কঙ্কালসার-দেহ পানু ডাকে—মা! মনে পড়ে নিজের মাকে। চোখ সজল হইয়া ওঠে, কিন্তু চোখের জল ফেলিতে সাহস করে না।

বুধনের স্ত্রী আসিয়া দাঁড়ায়।

অশ্রু সম্বরণ করিয়া পানু পেট দেখাইয়া বলে—ভুখ।

বুধনের স্ত্রী ছুটিয়া যায় দুধের সন্ধানে।

•

সেদিন শিকারের ফিরত বুধন ঘরে আসিয়া হাসিমুখে তাহার কোলের কাছে সযত্নে রাখিল একটি শিকার করা পাখী। সুন্দর বিচিত্র রঙ। এ পাখী পানু চেনে। তাহাদের গ্রামের প্রান্তে বড় বড় অশথ বট গাছগুলায় যখন ফল পাকে, তখন ইহারা ঝাঁক বাঁধিয়া আসে। যেমন সুন্দর পালকের রঙ ইহাদের, তেমনি সুন্দর ইহাদের ডাক। জলতরঙ্গ বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনির মত মিষ্ট স্বরে ডাকে। বাবুদের বাড়ির ছোকরাবাবুরা বন্দুক ছুঁড়িয়া গুলি করিয়া মারে। মাংস নাকি ভারি সুস্বাদু। হরিয়াল পাখী।

বুধন হাসিয়া বলিল—খায়গা? মুখে আহার তুলিবার ভঙ্গি করিয়া সে প্রশ্ন করিল।

শুধু দুধ খাইয়া পানুর আর নিজেরও ভাল লাগিতেছিল না। সে সাগ্রহে সম্মতি জানাইয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল—হ্যাঁ।

সেদিন বুধনের স্ত্রী তাহার সামনে ওই হরিয়াল পাখীর মাংস ধরিল। মুখের কাছে পাইয়া-

এতক্ষণে পানুর কিন্তু মুখ শুকাইয়া গেল। ইহাদের রান্না!

বুধনের স্ত্রী বলিল—খা খা।

সভয়ে ঘাড় তুলিয়া সে তাহার মুখের দিকে চাহিল।

হাসিয়া বুধনের স্ত্রী আবার বলিল—খা।

দ্বিধা এবং সঙ্কোচের মধ্যেও সে সভয়ে এক টুকরা মাংস মুখের কাছে তুলিল, ওই নতুন মায়ের দেওয়া. আহার্য প্রত্যাখ্যান করিতে তাহার সাহস হইতেছে না। মনে মনে হিসাব করিয়াছে সে অনেক; এখান হইতে পালানো অসম্ভব। বুধন হিংস্র হইয়া উঠিবে—বাণ মারিয়া শোধ লইবে। বুধনের মন্ত্রে সে বিশ্বাস করিতে শুরু করিয়াছে। আর পালাইয়া যাইবে কোথায়? সেখানে যে বাড়ির সামনেই থানা!

বুধনের স্ত্রী আবারও বলিল—খা খা। লবণযুক্ত সিদ্ধ মাংস। সামান্য একটু গন্ধ সত্ত্বেও লবণাক্ত মাংসের আস্বাদ দীর্ঘকাল পরে তাহার ভাল লাগিল। খুব ভাল লাগিল। তাহার জিভের ডগা হইতে পাকস্থলী পর্যন্ত একটা লোলুপ শিহরণ বহিয়া গেল। লোভাতুর আগ্রহে সে মাংসখণ্ডটা চিবাইতে আরম্ভ করিল। নরম সুস্বাদু মাংস। হাড়গুলা মুড়-মুড় করিয়া ভাঙিয়া যাইতেছে। সে খণ্ডটার পর আবার এক খণ্ড। সমস্তটাকে সে নিঃশেষে খাইয়া সর্বশেষে কয়েক টুকরা অপেক্ষাকৃত শক্ত মোটা হাড় লইয়া চুষিতে আরম্ভ করিল।

বুধনের স্ত্রীর মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। সে ডাকিল বুধনকে আপন ভাষায়—দেখে যা, দেখে যা,—ও মিন্সে!

বুধনও আসিয়া দেখিয়া খুব খুশী হইল। বলিল—খা খা। তারপর নিজের হাত দুইটা দুই পাশে ঝাঁকি দিয়া দেখাইয়া বলিল—এইসা—এইসা।

পানু ইঙ্গিতটা বুঝিল—বুধন বলিতেছে খাইলে এমনি শক্তিশালী দেহ হইবে। পানু একটু মিষ্টি হাসি হাসিল।

সেই দিনই অপরাহ্ণে বুধন তাহাকে ধরিয়া আনিয়া তাঁবুর বাহিরে বসাইয়া দিল।

•

দীর্ঘদিন পরে মুক্ত আকাশের তলে পরিপূর্ণ রৌদ্র এবং অবাধ বাতাসের স্পর্শ পাইয়া পানু যেন সঞ্জীবনীর স্পর্শ অনুভব করিল। তাহাদের বাড়ির উঠান কাঁচা মাটির। মধ্যস্থলটা নিকানো হয়, নিত্য ঝাঁটা বুলানো হয়, সেখানে ঘাস হয় না। কিন্তু চারিপাশে দূর্বাঘাস জন্মায়। সেই ঘাসের উপর তাহার বাপ কি প্রয়োজনে একখানা বড় পাথর আনিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছিল। দীর্ঘদিন পর একদা পানুই সেই পাথরখানা সরাইয়াছিল। পাথরটার নীচে দূর্বার পাতাগুলির রঙ একেবারে সাদা এবং লতাগুলি পাথরের চাপে মাটির সঙ্গে লাগিয়া গিয়াছিল। আশ্চর্যের কথা—পাথরখানা তুলিয়া দিবা মাত্র ওই দূর্বার লতাগুলির মধ্যে একটা কম্পন জাগিয়া উঠিল। দূর্বার দীর্ঘ পাতাগুলি মাথা তুলিতে আরম্ভ করিল। তাহার দেহে মনে তেমনি একটা কম্পন জাগিয়াছে যেন।

কোন এক অজ্ঞাত গ্রামপ্রান্তের এক অবাধ প্রান্তরে যাযাবরদের তাঁবু পড়িয়াছিল। বর্ষা তখন শেষ হইয়া আসিয়াছে। আকাশ ঘন নীল, মধ্যে মধ্যে পেঁজা তুলার মত সাদা সাদা হাল্কা চাপবন্দী মেঘ ভাসিয়া যাইতেছে। কখনও কখনও নীল আকাশের কোল জুড়িয়া প্রকাণ্ড বড় বড় সাদা পদ্মফুলের মালার মত ভাসিয়া উড়িয়া যাইতেছে বকের সারি। তাহাদের 'কক্-কক্' শব্দে পানুর শরীর যেন শিহরিয়া উঠিল। সম্মুখে দিগন্ত পর্যন্ত উন্মুক্ত। প্রান্তরটার পরে চাষের মাঠ। বিস্তীর্ণ মাঠখানি সবুজ ধানে ভরিয়া উঠিয়াছে। হা-ঘরেদের

তাঁবুর বাহিরে গাছের তলায় ইটের চুলায় রান্না চাপিয়াছে। উলঙ্গ ছেলেদের দল ছুটিয়া বেড়াইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে ছুটিতেছে কয়েকটা কুকুরের বাচ্চা। অদূরেই একটা তাঁবুর সম্মুখে অনেক কয়জনে বেশ একটি ভিড় জমাইয়া বসিয়াছে। বেশ একটা উল্লাস কলরোল চলিয়াছে সেখানে। বাতাসে একটা তীব্র ঘ্রাণও আসিতেছে। বেশ জোরে বার দুয়েক নিশ্বাস লইয়া পানু বুঝিল, মদের গন্ধ।

কয়েকজন তাহাকেই আঙুল দিয়া দেখাইতেছে। পানুও সেই দিকে চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পর বুধন একটা পাত্র হাতে উঠিয়া আসিল। তাহার সঙ্গে একটা মেয়ে। বুধন বলিল —খা—খা।

পানু সভয়ে বলিল—না।

মেয়েটা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। চোদ্দ-পনেরো বছরের একটা হা-ঘরের মেয়ে। কালো, খাঁদা কিন্তু চোখ দুইটা বড়। বড় বড় চোখ দুইটা মদের নেশায় ঢুলঢুল করিতেছে। মাথায় রুক্ষ চুল। পরনের কাঁচুলিটা খাটো, খুব আঁট হইয়া গায়ে চাপিয়া বসিয়াছে—কিন্তু তাহাতেই তাহাকে বেশ একটি শ্রী দিয়াছে।

মেয়েটা এবার বলিল—খা। খা। দারু। পিয়ো।

পানু বলিল—না।

মেয়েটা হাসিয়া আকুল হইল। হাসিতে হাসিতে বসিয়া পড়িল। বসিয়া মত্ততার ঘোরে মাটির বুকে হাত বুলাইয়া হাসিতে লাগিল।

ওদিকে সূর্য অস্ত যাইতেছে।

গ্রামের মধ্যে কাঁসর ঘণ্টা বাজিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে ঢাকও বাজিতেছে। ঢাকের বাজনার মধ্যে সে শুনিতে পাইল ধুমুল বাজনার বোল। পূজার আগে নিত্য সন্ধ্যায় ঢাকীরা ধুমুল দেয়। নীল আকাশ, ফল-ভরা মাঠ, আকাশের কোলে বকের সারি, দূরাগত ঢাকের ওই বাজনা বলিয়া দিল, পূজা—পূজা আসিতেছে। হা-ঘরের দলের পূজা নাই। তাহারা আপন মনে মত্ত হইয়া আছে।

পাঁচ

হা-ঘরের দলটি বড় নয়, দশটি পরিবার সম্প্রতি বারোতে পরিণত হইয়াছে। দুইটি ছেলে বড় হইয়াছে, বিবাহ করিয়া স্বাধীনভাবে স্বতন্ত্র গৃহস্থালী পাতিয়াছে। ভ্রাম্যমাণ গৃহস্থালী। পানুর আশ্রয়দাতা, তাহার স্ত্রী পানুকে আশ্বাস দেয়—পানুও একদিন এমনি করিয়া গৃহস্থালী পাতিবে। উহাদের কথাবার্তা পানু এখন অনেকটা বুঝিতে পারে, অল্প-স্বল্প বলিতেও শিখিয়াছে। প্রৌঢ় গুণীন বলে—আমার মন্ত্র-তন্ত্র, জড়ী-বুটি সব তুকে শিখাইব। তামাম আদমি ডরকে মারে তুকে খাতির করবে। এই দলের মধ্যে সর্দার তুকে পালা বৈঠনে দিবে। হাঁ।

প্রৌঢ়া বলে—নয়া কাপড়ার তাঁবু বানিয়ে দেগা। থালা দিব, লোটা দিব, নতুন হাঁড়ি দিব, বহুৎ রঙদার দড়ি দিয়ে শিকে বানিয়ে দিব। বহু আসবে তুহার, বিস্তারা দিব, তুহার তাঁবু পড়বে হামার তাঁবুর পাশে।

প্রৌঢ় বলে—বহুৎ আচ্ছা তীরধনুক বানিয়ে দেব, আচ্ছা 'কুলাড়' বানিয়ে দেব, শড়কী

বানিয়ে দেব, ডাণ্ডা বানিয়ে দেব। একটো ভঁইসা দিব, যিসকা বেটীকে তু সাদি করবি উভি দেবে একটো ভঁইসা ; দুটো আচ্ছা কুত্তাভি দেব, শিকার খেলবি।

প্রৌঢ়া বলে—এ বুড়োয়া, তুহার সাঁপকো ভি দিস বাচ্চাকে।

প্রৌঢ়ের তাহাতেও আপত্তি নাই, সে বলে—দেঙ্গে, জরুর দেঙ্গে। এই বয়স্ক ছেলেটিকে সব ভুলাইয়া একান্তভাবে আপনার করিবার জন্য তাহার জীবনের সব কিছু সম্পদ সে দিতে প্রস্তুত।

পানু ভীতিত্রস্ত হৃদয়ে শুষ্ক হাসি হাসে, আর সম্মতি জানাইয়া ঘাড় নাড়ে। তাহার মুখে রোগের পাণ্ডুরতা মনের ভীতি-সঙ্কোচ বিরূপতা ঢাকিয়া রাখে। কৃতজ্ঞতা সত্ত্বেও সে ইহাদের সঙ্গে এক হইয়া যাইতে পারে না, একান্ত ভাবে আপনার জন হইতে পারে না।

অত্যন্ত নিম্নশ্রেণীর মানুষ ইহারা। ইরাণী বলিয়া পরিচিত, ইউরোপের জিপ্‌সীদের অন্যতম শাখার যাযাবর শ্রেণীকে বাদ দিয়াও এই দেশেই আরও যাযাবর শ্রেণী আছে, তাহারা ইহাদের অপেক্ষা অনেক উন্নত শ্রেণীর। দলে তাহারা প্রকাণ্ড, ঘোড়া-গাধা পর্যন্ত তাহাদের আছে। বেশভূষায় ইহাদের অপেক্ষা অনেক সভ্য। হিন্দুর পল্লীতে গিয়া তাহারা মাথায় নামাবলী বাঁধে, ফোঁটা তিলক কাটে, বহির্বাস পরে, গলায় পরে রুদ্রাক্ষের মালা, হাতে কমণ্ডলু নেয়। পুরাদস্তুর সন্ন্যাসী সাজিয়া 'নমো নারায়ণায়' হাঁকিয়া গৃহস্থের দুয়ারে গিয়া দাঁড়ায়, মুখ দেখিয়া ভূত-ভবিষ্যৎ বলে। মুসলমানদের পল্লীতে ফকির সাজিয়া মুসলমানী বোল হাঁকিয়া ভিক্ষা করে, দাবী করে, কাড়িয়া লয়, ছোট ছোট বাজার হাট সুবিধা পাইলে লুঠ করিয়া লয়। ধর্মের রীতি নীতি আচার পালন করে না ; কিন্তু ধর্মের ছোঁয়াচ তাহাদের যাযাবর জীবনে লাগিয়াছে। একই দলের মধ্যে ধর্মে হিন্দু এবং ধর্মে ইসলাম উভয় সম্প্রদায়েরই লোক আছে। অবশ্য সে নামেই ; তাহাদের খাদ্য এক, পানীয় এক, ভাষা এক, আচার এক, প্রথা এক, দলের মধ্যে আইন এক, কোন পার্থক্য নাই। না থাক, তবুও মানুষের মনের মধ্যে সভ্যতার যতটা প্রভাব পড়িলে জীবনে ধর্ম আসে, ততখানি সভ্যতা তাহাদের মধ্যে আছে। ইহারা কিন্তু আজও পড়িয়া আছে মানব-জীবনের অনেক নিম্নস্তরে। ভীমদর্শন বর্বর হিংস্র মুখের গঠন, কালো রঙের উপর পুরু ময়লার একটা স্তর জমিয়া আছে, গরম লাগিলে জলে ঝাঁপাইয়া পড়ে, অঙ্গমার্জনা জানে না, শীতে স্নানই করে না। গায়ের লোমকূপে উকুন হয়, পরনের এককালি কৌপীনের মত কাপড়ে সাদা রঙের উকুন থিকথিক করে, উহারা বলে, 'চিল্লড়'। কামড়ে মধ্যে মধ্যে অস্থির হইয়া আঙুল চালাইয়া মারিয়া ফেলে, মট-মট শব্দ উঠে। অখাদ্য বলিয়া কিছু নাই, গরু ভেড়া মহিষ শিয়াল হইতে ব্যাঙ, এমন কি সাপ পর্যন্ত খায়, অর্ধসিদ্ধ লবণাক্ত মাংস হইলেই হইল, মাংসের সঙ্গে খায় মদ ; এ সমস্ত হজম করিবার শক্তি ইহাদের দেহের কোষে কোষে পিতৃপুরুষক্রমে সঞ্চিত আছে। হজম করিলেও গায়ে কিন্তু একটা অত্যন্ত দুর্গন্ধ উঠে। পানু এই গন্ধটা বিশেষ করিয়া বরদাস্ত করিতে পারে না। তাহার আশ্রয়দাতা গুণী লোক, তাহার মন্ত্র, তাহার ঔষধ সবই সে তাহাদের সম্প্রদায়ের নিকট হইতে পাইয়াছে। বনে জঙ্গলে পাহাড়ে প্রান্তরে ঘুরিয়া নিজেও সে কিছু কিছু আবিষ্কার করিয়াছে। তাহার বুদ্ধি তাহাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক তীক্ষ্ণ। সে পানুর কষ্ট বুঝিতে পারে, আরও বুঝিতে পারে তাহাদের সকল খাদ্য পানু হজম করিতে পারিবে না। তাই পানুকে সে পাখী, খরগোশ, ভেড়া, ছাগল ছাড়া অন্য কোন জন্তুর মাংস খাইতে দেয় না। কিন্তু পানু তাহাদের গায়ের গন্ধ সহিতে পারে না—এই সত্যটা মধ্যে মধ্যে যখন একান্ত প্রকটভাবে প্রকাশ হইয়া পড়ে, তখন সে একান্ত আহত হয়।

ধীরে ধীরে পানু সারিয়া উঠিল। তখন প্রায় চার মাস অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। শীতের আমেজ ক্রমশ ঘন হইয়া উঠিতেছে। স্থান হইতে স্থানান্তরে উন্মুক্ত অবাধ বায়ু-প্রবাহের মধ্যে ঘোরা-ফেরা বাস, অর্ধসিদ্ধ লবণাক্ত পাখীর মাংস খাদ্য, নিত্যনিয়মিত বিপুল পরিশ্রমের ফলে আজন্ম-সবল-দেহ পানু সবলতর দেহ লইয়া সারিয়া উঠিল। অন্য দিকে বিপদ বাড়িয়া উঠিল।

মানব-জীবনের বিবর্তনবর্জিত রাক্ষসাচারসর্বস্ব মানুষগুলির সঙ্গে তাহার রুচির প্রভেদ, তাহার অন্তরের ঘৃণা দুর্বল পানুর পক্ষে গোপন করা সম্ভবপর হইয়াছিল কিন্তু সুস্থ সবল পানুর পক্ষে গোপন করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। তাহার আশ্রয়দাতা এখন মধ্যে মধ্যে অত্যন্ত বিরূপ হইয়া দাঁড়ায়। তাহার স্ত্রী দাঁতে দাঁত ঘষিয়া গর্জন করে। একদিন সে পানুর চুল ধরিয়া টানিয়া তাহাকে কঠিন নির্যাতনে নির্যাতিত করিল। পানু অকাতরে সব সহ্য করিল, তবু সে পলাইবার চেষ্টা করিল না। ইহাদের মধ্যে সে আপনাকে অত্যন্ত নিরাপদ মনে করে। পলাইবার কথা মনে হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে পড়ে ছিন্নকণ্ঠ নাকু দত্তের কথা,—থানা, পুলিস, দারোগা, জমাদার, ফাঁসি! বুক তাহার ধড়ফড় করিয়া উঠে। এখানে সে সম্পূর্ণ নিরাপদ। ইহাদের মধ্য হইতে তাহাকে পানু বলিয়া কেহ আবিষ্কার করিতে পারিবে না। তাহার প্রমাণ সে পাইয়াছে। এই কয়েক মাসের মধ্যেই অনেকবার পুলিস এই হা-ঘরেদের আড্ডা দেখিয়া গিয়াছে, তল্লাশ করিয়াছে, কেউ তাহার দিকে একবার ফিরিয়া চাহিয়াও দেখে নাই।

পানু সুস্থ হইয়া চেতনা লাভ করার পর প্রথম যেদিন সে হা-ঘরেদের তাঁবুতে পুলিসকে হানা দিতে দেখিয়াছিল, সেদিন তাহার মনে হইয়াছিল, পুলিস আসিয়াছে তাহারই সন্ধানে। দুর্বল হৃৎপিণ্ডটা উদ্বেগে বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। পুলিস চলিয়া যাইবার পর বহুক্ষণ পর্যন্ত সে পড়িয়া ছিল পক্ষাঘাতগ্রস্ত পঙ্গুর মত। ক্রমে সে দেখিল, ইহাদের তাঁবুতে পুলিসের আসা-যাওয়া অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার। পুলিস আসে, তাহাদের নাম লিখিয়া লয়, শাসাইয়া যায়—চুরি-লুঠ করিলে কঠিন সাজা দেওয়া হইবে। তাহার আশ্রয়দাতা অনেক দারোগা-জমাদারকে জড়ী-বুটি রঙিন পাথর দেয়, যাহার গুণে দুর্লভ স্ত্রী লাভ হইবে, প্রচুর টাকা পাওয়া যাইবে, দুশমন নাশ হইবে কঠিন অস্ত্রের আঘাতও ব্যর্থ হইবে, অবশেষে একদিন দুনিয়ার রাজাও বনিয়া যাইবে। এত লোককে সে জড়ী-বুটি এবং পাথর দিয়াছে যে ভাবীকালে দুনিয়ার রাজত্বের জন্য পরস্পরবিরোধী হাজার রাজার মধ্যে একটা প্রচণ্ড যুদ্ধ বাধিয়া যাইবে। নারী এবং অর্থ মধ্যে মধ্যে পুলিসের লাভ হয় ইহাদেরই কল্যাণে। সভ্যতায় বঞ্চিত এই হা-ঘরেরা সভ্যসমাজের কোন আইনই মানে না। সুতরাং পুলিসের কবলে ইহারা পড়িয়াই আছে। হা-ঘরের দল গ্রামের পাশে বাসা গাড়ে, তাহাদের গরু মহিষ ছাগল প্রভৃতি পশু-গুলির জন্য গাছপালা কুড়াইয়া পাতা কাটিয়া লয়, কাহারও অনুমতি লয় না। গাছ যে কোন লোকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইতে পারে এ আইনই তাহারা মানে না। গাছ মাটিতে জন্মিয়াছে, গাছ তো মাটির, বাচ্চা যেমন মায়ের তেমনি। গাছের মালিক গ্রামের লোক আপত্তি করিলে দাঙ্গা বাধাইয়া দেয়। গ্রামের লোকের অরক্ষিত ছাগল ভেড়া দেখিলে লুকাইয়া মারিয়া খায়। তাহাদের ছাগল ভেড়া আছে; ওগুলার অধিকারীত্ব অবশ্য তাহারা মানে। নিজের নিজের সম্পত্তি ছাড়া অপরের কোন সম্পত্তির অধিকারীত্ব উহারা মানে না। অপরাধপ্রবণতা উহাদের রক্তকণিকায় মিশিয়া আছে। রাত্রে চুরি করে। চৌকিদার পুলিস মোতায়েন থাকিলে—উহাদের মেয়েরা উহাদের সঙ্গে রসিকতা জুড়িয়া দেয়, যুবতীরা

তাহাদের ভুলাইয়া দূরে লইয়া যাইতে চেষ্টা করে, সেই অবসরে পুরুষেরা বাহির হইয়া পড়ে নৈশ অভিযানে। পরদিন প্রাতে পুলিস আসিয়া হাঙ্গামা জুড়িয়া দেয়, খানাতল্লাশ করে। মধ্যে মধ্যে দুই-একজনকে ধরিয়াও লইয়া যায়। ইহারা দুই-চারিদিন অপেক্ষা করিয়া দেখে, ধৃত ব্যক্তি তাহার মধ্যে ছাড়া পাইলে তাহাকে লইয়া বাসা তুলিয়া স্থানান্তরে চলে; ছাড়া না পাইলেও চলে; ধৃত ব্যক্তি শাস্তি ভোগ করিয়া একদিন ফিরিবেই। সত্যই তাহারা অদ্ভুত উপায়ে ভ্রাম্যমাণ দলের সন্ধান করিয়া ফেরে।

পুলিসকে গ্রাহ্য করিলেও ভয় করে না। পানু দেখিল, তাহারা অর্থাৎ গ্রামের লোক পুলিসকে যেমন ভয় করে, ইহাদের ভয় তেমন নয়। কখনও কখনও পুলিসের সঙ্গেও হাঙ্গামা করে ইহারা, পুলিসও ইহাদের বর্বর ক্রোধোন্মত্ততাকে এড়াইয়া চলিতে চায়। এই মাস কয়েকের মধ্যেই দুইজন কন্‌স্টেবলকে প্রহার দিতে পানু দেখিয়াছে। আজই বৈকালে একজন জমাদার-বাবু মার খাইয়াছে। পানুর আশ্রয়দাতাই প্রচণ্ড এক চড় কষাইয়া দিল। জমাদার এই তাঁবুর দিকেই আসিতেছিল, পথে সদ্য-বিকশিতযৌবনা একটা হা-ঘরের মেয়েকে দেখিয়া তাহার সঙ্গে রসিকতা জুড়িয়াছিল। মেয়েটি—সেই কিশোরী মেয়েটি, যে একদিন পানু মদ খাইবে না শুনিয়া মাটিতে গড়াইয়া পড়িয়া হাসিয়াছিল—মেয়েটার নাম রুকণী। রুকণীও তাহার সে রসিকতার উত্তরে সমানে রসিকতা করিয়াছিল, ফলে তরুণ জমাদারটি আর আত্মসম্বরণ করিতে পারে নাই, ধরিয়াছিল রুকণীর আঁচল। মুহূর্তে আঁচলটা টানিয়া লইয়া রুকণী ছুটিয়া পলাইয়া আসিয়াছিল, এবং বলিয়াও দিয়াছিল সব কথা। জমাদারটি দ্বিধাভরেই অগ্রসর হইতেছিল। রুকণী না হইলেও অন্য হা-ঘরের দলের ছলনাময়ী হা-ঘরের মেয়ের সঙ্গে একা নির্জনে দুই-একবার তাহার পরিচয় হইয়াছিল; সেই পরিচয়ের উপরেই ছিল তার ভরসা। কিন্তু পানুর আশ্রয়দাতা গুণীন কথাটা শুনিবামাত্র অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল, রুকণীও সঙ্গে গিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইল পানু। মনে পড়িয়া গেল তাহার গ্রামের সেই জমাদারকে। জমাদারের সঙ্গে দেখা হইল পথে। দেখামাত্রই গুণীন তাহার গালে প্রচণ্ড চড় কষাইয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে পানুর কি হইল কে জানে—সে চিতাবাঘের মত ঝাঁপ দিয়া পড়িল জমাদারের উপর। কিন্তু বুধন ছাড়াইয়া লইল। জমাদারকে আঙুল দেখাইয়া বলিল—যাও, ভাগো। নেহি তো জান মার দেগা হামার লিড়্‌কা। অর্থাৎ পানু। জমাদার চলিয়া গেল। রুকণীর সে কি হাসি! সেদিনের মতই গড়াইয়া পড়িয়া হাসিতে আরম্ভ করিল।

রুকণী মেয়েটা দুরন্ত মেয়ে। পানুর চেয়ে বয়সে কিছু বড়। চৌদ্দ-পনেরো বৎসর বয়স হইলেও মেয়েটা দেহে শক্তিতে ইহারই মধ্যে বেশ বড় হইয়া উঠিয়াছে। যেমন চতুর, তেমনি হিংস্র, তেমনি শক্তিশালিনী; গৃহস্থের বাড়ি হইতে ঘটি বাটি চুরি করিবার দক্ষতা তাহার অদ্ভুত; পথে মাঠে ঘাটে ছাগল ভেড়া পাইলে মুহূর্তে সেটার মুখ চাপিয়া ধরিয়া ঘাড়টাকে এমন কৌশল ও শক্তির সঙ্গে মোচড়াইয়া দেয় যে, আক্রান্ত জানোয়ারটা বারেকের জন্যও অস্ফুট চীৎকার করিবার অবসর পায় না। ওই মেয়েটা তাহার এখানকার জীবনে সর্বাপেক্ষা বড় অভিশাপ। এ সম্প্রদায়ের অনেকেই পানুকে বিদ্বেষের দৃষ্টিতে দেখে, কিন্তু রুকণীর মত কেহ নয়। তাহাদের হইতে পৃথক, গ্রাম্যসমাজের এই ছেলেটিকে ওই সন্তানহীন বৃদ্ধ গভীর মমতায় ঘিরিয়া রাখিয়াছে। বৃদ্ধের যাদুবিদ্যাকে সম্প্রদায়ের সকলেই ভয় করে, নতুবা এ সম্প্রদায়ের কেহই পানুকে ভাল চোখে দেখে না। পানু যে তাহাদের সকল খাদ্য খায় না, সে যে তাহাদের ভাষা ভাল বলিতে পারে না, পানু যে আজও পর্যন্ত চুরি করিতে বাহির হয় নাই, ইহার জন্য

তাহারা তাহাকে ঘৃণা করে। শুধু ঘৃণাই নয়, তাহার উপর আক্রোশও পোষণ করে। সামাজিক নিয়ম উহারা মানে না, যে মানে সে তাহাদের কেহ নয়। কিন্তু রুকণীর আক্রোশ যেন সব চেয়ে বেশী। বুধনের ভয়ে প্রত্যক্ষ নির্যাতন কিছু করিতে পারে না, কিন্তু পরোক্ষ নির্যাতন করার চেষ্টার তাহার অন্ত নাই। ঠাট্টা-বিদ্রূপ সে অহরহই করে, মধ্যে মধ্যে কঠিনভাবে অপদস্থ করিয়া নিষ্ঠুর হাসি হাসে। মদের ভাঁড় লইয়া রসিকতাটা তাহার একটা সাধারণ রসিকতা। নিজে মদের ভাঁড়ে চুমুক দিতে দিতে পানুকে ভাঁড়টা আগাইয়া দিয়া বলে—পিয়ো।

পানুর ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠে। সে কোন উত্তর দেয় না।

রুকণী আরও খানিকটা কাছে আসিয়া বলে—পিয়ো।

পানু বিরক্তিভরে পিছাইয়া যায়।

রুকণীর হাসি শুরু হয়। হাসিতে হাসিতে পানুর কাছে সে আগাইয়া গিয়া বলে—পিয়ো।

পানু আবার পিছাইয়া যায়, রুকণী সঙ্গে সঙ্গে আগাইয়া আসে। নিদারুণ বিরক্তি এবং ক্রোধ সত্ত্বেও তাহাকে কিছু বলিতে সাহস করে না। দলের সমস্ত লোক তাহার বিপক্ষে; সামান্য অপরাধে হয়তো কঠিন শাস্তি পাইতে হইবে। যদি খুন করিয়া কোন প্রান্তরের মধ্যে টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিয়া দেয়, তবেই বা সে কি করিবে! তাহার আশ্রয়দাতা একা গোটা দলটার সমস্ত লোকের সঙ্গে কতক্ষণ লড়াই করিবে?

শেষ পর্যন্ত রুকণী তাহার উচ্ছিষ্ট মদ পানুর গায়ে ঢালিয়া দেয়। পানুর সর্বাঙ্গে পচাই মদের দুর্গন্ধ উঠে। রুকণী হাসিয়া গড়াইয়া পড়ে।

হা-ঘরের দলের কুকুরগুলার ভীষণ হিংস্র প্রকৃতি; পানুর সঙ্গে তাহাদের পরিচয় এখনও অল্প, অন্তত পানুর দিক হইতে অল্প। কুকুরগুলা তাহাকে চিনিয়াছে, পানুকে দেখিয়া তাহারা গোঙায় না, লেজও নাড়ে; কিন্তু পানু তাহাদের কাছে ঘেঁষে না। রুকণী এবং অন্য হা-ঘরের ছেলেমেয়েরা কুকুরগুলাকে লইয়া খেলা করে। তাহারা ছুটে—কুকুরগুলাও ছুটে, লাফ দিয়া কাঁধে ঘাড়ে ওঠে, খেলাচ্ছলে কামড়াইয়া ধরে, রুকণীরা ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিয়া আবার ছুটিয়া যায়। কখনও কখনও কুকুরের খেলার কামড়েও ছেলেমেয়েদের গায়ে রক্ত ঝরে, সে তাহারা গ্রাহ্যও করে না। তাহারাও তাহাদের টুঁটি টিপিয়া ধরে। পানু সভয়ে দূর হইতে দেখে। রুকণী কুকুর লইয়া পানুর পিছনে লেলাইয়া দেয়। পানু প্রথম প্রথম বিব্রত হইত, এখন কিন্তু একটা ডাণ্ডা লইয়া দাঁড়ায়। ডাণ্ডা দেখিয়া কুকুরগুলা রাগিয়া যায়, ক্রুদ্ধ গর্জন করে।

জমাদার ও রুকণী-পর্বের পর, রুকণী উল্লাসে উচ্ছ্বাসে মাতিয়া উঠিল। সমস্ত ব্যাপারটাই তাহার কাছে একটা পরম উপভোগ্য কৌতুক। জমাদার তাহার আঁচল ধরিয়াছিল—সেটাও কৌতুক, গুণীন তাহাকে প্রচণ্ড চড় কষাইয়া দিয়াছে—সেটাও কৌতুক। সব চেয়ে বড় কৌতুক পানু জমাদারের ঘাড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। প্রত্যেক তাঁবুতে সে উচ্ছ্বসিত হাসি হাসিয়া ব্যাপারটা বর্ণনা করিয়া বেড়াইল। তারপর হঠাৎ আসিয়া মেয়েটা তাহাকে লইয়া পড়িল।

মদের ভাঁড় লইয়া রুকণী আসিয়া ভাঁড় আগাইয়া দিয়া বলিল—পিয়ো। আজ তো তুম মরদ বন গিয়া, দারু আজ জরুর পিনে হোগা। পিয়ো।

পানু এখন সুস্থ, পূর্বাপেক্ষা অনেক সবল হইয়াছে। সে বলিল—না।

—কেঁও?

—না। নেহি পিয়েগা। পানু প্রায় চীৎকার করিয়া উঠিল।

পানুর সবল প্রতিবাদে রুকণী আজ একটু আশ্চর্য হইলেও কৌতুকটা তাহার কাছে আরও উপভোগ্য হইয়া উঠিল। যে সাপ ফণা তুলে না, তাহার সঙ্গে খেলা করিয়া মজা নাই। পানুর সবল প্রতিবাদকে অপ্রতিভ উপহাসাস্পদ করিবার উল্লাসে হাসিয়া সে অধীর হইয়া উঠিল। সেও আজ বরাবর যাহা করে তাহা করিল না, মদটা তাহার গায়ে ঢালিয়া দিল না। ভাঁড়টায় চুমুক দিয়া একমুখ মদ টানিয়া লইয়া কুলকুচার মত ফু-ফু করিয়া পানুর মুখে গায়ে ছিটাইয়া ভাসাইয়া দিল। পানুর আর সহ্য হইল না, ক্রুদ্ধ জানোয়ারের মতই রুকণীর দিকে আগাইয়া গেল। মুহূর্তে রুকণী মদের ভাঁড়টা নামাইয়া রাখিয়া কুস্তীর প্রতিদ্বন্দ্বীর মত বলিল—আও! চলে আও! বলিয়া সে-ই লাফ দিয়া পড়িল পানুর ঘাড়ে। তারপর আরম্ভ হইল প্রচণ্ড বিক্রমে লড়াই। পানু ক্রোধে জ্ঞান হারাইয়া যুঝিতেছিল, তাহার সর্বশক্তি প্রয়োগ করিতে সে দ্বিধা করিল না, কিন্তু রুকণী পানুর অপেক্ষা বয়সে বড়, সে হা-ঘরের মেয়ে, তাহার শক্তি পানুর অপেক্ষা বেশী; কিছুক্ষণের মধ্যেই সে পানুকে মাটিতে ফেলিয়া তাহার বুকে চাপিয়া বসিয়া হি-হি করিয়া নিষ্ঠুর হাসি হাসিতে লাগিল। পানুর নড়িবার শক্তি পর্যন্ত ছিল না, অদ্ভুত কৌশলে পানুর হাত দুইটাকে মাটিতে ফেলিয়া হাত দুইটাকে পায়ে চাপিয়া ধরিয়া রুকণী বুকে বসিল। একটা হা-ঘরে ছেলে পানুর পা দুইটা টানিয়া ধরিল। পানু শুধু রাগে ফুলিতেছিল। চারিপাশে ততক্ষণে হা-ঘরের দলের ছেলেমেয়েগুলা জমিয়া গিয়াছে, তাহারাও হাসিতেছিল নিষ্ঠুর কৌতুকের হাসি। হঠাৎ রুকণী তাহাদের বলিল—দো। দারুকে ভাঁড়। লা—য়ো। জলদি!

একটা ছেলে ভাঁড়টা আগাইয়া দিল।

বোতলের মতই মুখ-সরু মাটির ভাঁড়টা লইয়া রুকণী বলিল—আব পিয়ো।

পানু দাঁতে দাঁত টিপিয়া ধরিল। রুকণী ডান হাতে এবার চাপিয়া ধরিল পানুর গলা; দাঁতে দাঁতে ঘষিয়া বলিল—পি য়ো। বায়ুর ব্যাকুলতায় রুদ্ধশ্বাস পানুর মুখ আপনি হাঁ হইয়া গেল। রুকণী তাহার গলা ছাড়িয়া দিয়া গলগল করিয়া মুখের হাঁয়ের মধ্যে ঢালিয়া দিল মদ। তারপর চাপিয়া ধরিল পানুর নাক। আশ্চর্য চতুরা মেয়ে!

ছয়

মদের দুর্গন্ধ এবং অম্লকটু আস্বাদ' জীবনে প্রথম এমনিভাবে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াও মদের ক্রিয়ায় সে মত্ত এবং দুর্দান্ত হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ গা-বমির কষ্ট হইল, তাহার পর সারা দেহ-মন চনচন করিয়া উঠিল। তাহার ভয় কাটিয়া গেল—সে হাত-পা ছুঁড়িয়া প্রবল আস্ফালনের সঙ্গে রুকণীকে গালি-গালাজ জুড়িয়া দিল। ঢিল ছুঁড়িতে শুরু করিল। তারপর হঠাৎ চীৎকার শুরু করিল। সে চীৎকার অদ্ভুত চীৎকার! সে চীৎকার শুনিয়া সকলে বিস্মিত হইয়া গেল।

রুকণী এবং ছেলেগুলো হি-হি করিয়া হাসিতেছিল। পানুর আশ্রয়দাতা এবং তাহার স্ত্রীও হাসিতেছিল। ছেলেটা আজ মদ খাইয়াছে তাহাদের ভারি আনন্দ। তাহারা এ চীৎকার শুনিয়া স্তব্ধ হইয়া গেল। পানু তখনও চীৎকার করিতেছে। মাথার চুল টানিতেছে। কিন্তু, না, কাঁদিতেছে না তো।

এবার রুকণী কুকুর লইয়া আসিল। পানু চীৎকার বন্ধ করিয়া নিজেদের কুকুরগুলার

সবচেয়ে বলবানটাকে লইয়া গলা জড়াইয়া ধরিয়া বসিল। এতক্ষণে বুধন মহা খুশী হইয়া হঠাৎ তাঁবুর ভিতর হইতে তাহার সেই পোষা বুড়া সাপটাকে আনিয়া পানুর গলায় জড়াইয়া দিল। সাপের শীতল স্পর্শে এবং সাপটার নিমেষহীন চাহনি দেখিয়াও নেশার উত্তেজনার শক্তিতেই পানু ভয়ে এমন কিছু করিল না যাহা দেখিয়া রুকণী ও অন্য ছেলেমেয়েগুলা তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া মাটিতে গড়াইয়া পড়িতে পারে। পাথরের মূর্তির মত স্থির হইয়া সেও নির্নিমেষ দৃষ্টিতে সাপটার দিকে চাহিয়া রহিল।

বুধন বলিল—ডর নাই। বিষ নিকাল দিলাম। এই দেখ। বলিয়া সে সাপটার গোটা মাথাটা খপ করিয়া আপনার মুখের মধ্যে পুরিয়া স্তনপান-রত শিশুর মত চকচক করিয়া চুষিতে আরম্ভ করিল।

সেদিন সে আহার করিল বক-রাক্ষসের মত। ঘুমাইল কুম্ভকর্ণের মত। পরদিন সকালে উঠিয়া মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করিতেছিল, গত সন্ধ্যার ঘটনাগুলা কেমন ঝাপসা মনে হইল। তবুও আপন শৌর্যে বেশ খানিকটা অহঙ্কার অনুভব করিল। অনুশোচনা তাহার হইল না; বিগত জীবনের প্রতি মমতা তাহার ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। বিশেষ করিয়া জমাদারকে প্রহার করিয়া এ জীবনের প্রতি আসক্তি যেন বাড়িয়া গিয়াছে। রুকণী বাহির হইয়া যাইতেছিল গ্রামে ভিক্ষা করিবার জন্য—তাহাদের বেসাতী বিক্রয়ের জন্য। বেসাতী তাহাদের মাটির ঝুমঝুমি; বন্যলতা দিয়া বোনা অত্যন্ত ছোট বাটির আকারের টুকরী; কিছু পথে প্রান্তরে কুড়াইয়া সংগ্রহ করা কালো-লাল মসৃণ উপলখণ্ড—বিষপাথর এবং রক্তপাথর বলিয়া বিক্রী করে। গৃহস্থের দুয়ারে গিয়া প্রথমেই হাঁকে—এগে খোখার মা, ঝুমঝুমি লে-বি? এগে খোখার মা!

ক্রমে বাহির করে লতার টুকরি, তারপর পাথর। শক্তির প্রত্যক্ষ পরিচয় দিবার জন্য কখনও কখনও ছুরি দিয়া নিজের হাত খানিকটা কাটিয়া ধুনামাখা রক্তপাথরটাকে এমন জোরে টিপিয়া ধরে যে, সামান্য ক্ষতমুখের রক্ত বন্ধ হইয়া যায়। বিষপাথর দেখাইয়া বলে—সাঁপ কাটে, বিচ্ছু কাটে, পাথর লাগা, বিষ খা লেবে। তারপর বলে—লেবি? লেবি? লে। লে।

প্রত্যাখ্যান করিলে স্থান পাত্র বুঝিয়া জবরদস্তি করে, আবার ঝোলাঝামটা গুটাইয়া পলাইয়াও আসে। রুকণী ভিক্ষায় বাহির হইতেছিল। সে তাহাকে দেখিয়া মুখ ভেঙাইয়া দিয়াও হাসিল। সঙ্গে সঙ্গে পানুও দাঁত বাহির করিয়া মুখ ভেঙাইয়া হাসিল। আজ আর রুকণীর ভেঙানোর মধ্যে ঘৃণা বিদ্বেষ নাই। সে হাসিয়াছে।

রুকণী আগাইয়া আসিল। বলিল—গাঁওমে যাবি? হামরা সাথ?

পানু চুপ করিয়া রহিল।

রুকণী বলিল—বকরী মিলেগা তো মারেগা, আও। গোস খায়েগা রাতমে। আও।

পানু বলিল—নেই। নেই যায়েগা।

রুকণী আবার ঘৃণাভরে বলিল—ডরফোকনা! অর্থাৎ ভীরু, কাপুরুষ! বলিয়া সে ঘাঘরা দোলাইয়া প্রায় একপাক নাচিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

পানু অপমানে রাগে ফুলিতেছিল। কিছুক্ষণ পর তাহার নজরে পড়িল দূরে ধানক্ষেতের ধারে সাদা রঙের চতুষ্পদ কি একটা জানোয়ার ঘাস খাইয়া ফিরিতেছে। কিছুদূর সে আগাইয়া গেল। এবার স্পষ্ট বুঝিতে পারিল—জানোয়ারটা একটা ছাগল। রুকণীর 'ভীরু কাপুরুষ' গালটা তাহার কানে তখনও বাজিতেছিল—মনটা রি-রি করিতেছিল; সে ওই অপবাদ

খণ্ডনের জন্যই চুপিচুপি আগাইয়া গেল জানোয়ারটার পিছন দিকে। কাছে আসিয়া হঠাৎ ছাগলটার উপর লাফাইয়া পড়িল শিকারী চিতার মত। ছাগলটা একটা ভয়ার্ত চীৎকার করিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে পানু তাহার মুখটা চাপিয়া ধরিয়া সবলে ঘাড়টা পাক দিয়া মোচড়াইয়া দিল। এমন ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সে কাজটা সম্পন্ন করিল যে মরা ছাগলটার মুখটা ছাড়িয়া দিতেই মৃত পশুটার কণ্ঠনালীতে অবরুদ্ধ খানিকটা স্বর মুখ দিয়া শব্দ করিয়া বাহির হইয়া গেল। পানু চারিদিক দেখিয়া সেটাকে ঘাড়ে ফেলিয়া প্রাণপণে ছুটিয়া তাঁবুতে আসিয়া ঢুকিয়া পড়িল।

রুকণীর জন্য সে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছিল। রুকণী যখন ফিরিল, তখন সে পথের উপরে দাঁড়াইয়া ছিল। রুকণী আজ শুধু-হাতে ফিরিতেছিল। পানু বেশ লক্ষ্য করিয়া দেখিল, না, রুকণীর কাঁখের কাপড়টা এতটুকু ফুলিয়া ফাঁপিয়া নাই। অত্যন্ত খুশী হইয়া উঠিল। ব্যঙ্গ-ভরে হাসিয়া ভ্রূ নাচাইয়া প্রশ্ন করিল—কাঁহা?

শ্রান্ত রুকণী তাহার ওই ভ্রূ নাচাইয়া ব্যঙ্গ-তীক্ষ্ণ প্রশ্নে অত্যন্ত চটিয়া উঠিল। প্রশ্নটাও সে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল না। রুক্ষস্বরে বলিল—কেয়া?

—বকরী?

রুকণী ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাহার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া গভীর তাচ্ছিল্যপূর্ণ ব্যঙ্গের সঙ্গে আস্তে আস্তে শুধু বলিল—ড়-র-ফো-ক-না! বলিয়াই সে পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। কিন্তু পানু খপ করিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল—আও।

উগ্র ক্ষিপ্রগতিতে রুকণী উদ্যত-ফণা সাপিনীর মত ঘাড় ফিরাইয়া দাঁড়াইল, বলিল—কাঁহা?

পানু হাসিয়া বলিল—আও, দেখো।

—কেয়া?

—বকরী। বকরী।

—বকরী?

—হাঁ, হাঁ। আও, দেখো।

এবার রুকণীর চোখে মুখে ফুটিয়া উঠিল চঞ্চল কৌতূহল, ব্যগ্র মৃদু কণ্ঠস্বরে বলিল—দেঁখে, দেঁখে?

—আও।

তাঁবুর মধ্যে মরা ছাগলটাকে দেখিয়া হা-ঘরেণীর চোখ দুটা ঝকমক করিয়া উঠিল, তাহার মাংসলোভী মন লোলুপতায় ভরিয়া গেল। ঝকমকে দৃষ্টিভরা চোখে সে প্রশ্ন করিল—তুম? তুম শিকার কিয়া?

—হাঁ। পানু বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইল—হাম। হাঁ। শেষে নিজের বুকেই সে একটা চাপড় মারিল।

হা-ঘরেণী দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, যাইবার সময় বলিল—আতা। আভি।

মিনিট কয়েক পরেই সে ফিরিল, তার এক হাতে মদের ভাঁড় অন্য হাতে ছুরি। পানুর দিকে সে ভাঁড়টা অগ্রসর করিয়া দিয়া বলিল—পিয়ো।

এখন কিন্তু তার কণ্ঠস্বরে আর ব্যঙ্গ-শ্লেষ নাই।

গত রাত্রের নেশায় উত্তেজনাময় অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও মদের আস্বাদ এবং গন্ধের জন্য পানুর মদের প্রতি এতটুকু আকর্ষণ ছিল না। কিন্তু তবুও সে মদের ভাঁড়টা রুকণীর হাত হইতে তৎক্ষণাৎ টানিয়া লইল, কোনমতেই সে তাহার সদ্য-অর্জিত শৌর্যের সম্মানকে আহত হইতে

দিবে না। দম বন্ধ করিয়া সে ভাঁড়ে চুমুক দিল।

রুকণী বলিল—আওর পিয়ো।

সে আবার চুমুক দিল। এবার রুকণীকে ভাঁড়টা দিয়া সে বলিল—তুম পিয়ো।

রুকণী মদ্যপান করিল—দুর্লভ বস্তুর মত, পরম তৃপ্তির সহিত। তারপর ছাগলটাকে টানিয়া লইয়া হাতের ছুরিটা দিয়া চামড়া ছাড়াইতে বসিল। পানুকে বলিল—পাকড়ো।

বুক ফুলাইয়া পানু ছাগলটাকে এক দিকে টানিয়া ধরিল। রুকণী তাহার সঙ্গে আজ সহকর্মীর মত ব্যবহার করিয়াছে—এই অহঙ্কারে সে চরম খুশি হইয়া উঠিয়াছে। মদের নেশাতেও মাথাটা বেশ চনচন করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

সেদিন রাত্রে বুধনের তাঁবুর সামনে মদের আসর বসিল। বুধন ও তাহার স্ত্রী প্রচুর মদ্যপান করিয়া নাচিয়া গাহিয়া হুল্লোড় লাগাইয়া দিল। রুকণীও নাচিল, তাহার পায়ের পিতলের নূপুরের ক্ষিপ্র হইতে ক্ষিপ্রতর শব্দের সঙ্গে বাজনদারটা শেষ পর্যন্ত তাল রাখিতে পারিল না। তাল কাটিতেই রুকণী বাজনদারটার মাথায় তাহার পাতলা হাতে বাজনা বাজাইয়া দিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িয়া হাসিয়া সারা হইয়া গেল।

* * *

দেখিতে দেখিতে বৎসর দুয়েক কাটিয়া গেল। তের-চোদ্দ বৎসরের পানু পনের-ষোল বৎসরের হইয়া উঠিল। তাহার মুখের চেহারার বদল হইল, মাথায় বাড়িয়া উঠিল উর্বর ভূমির বুনো গাছের মত। মুখ ভরিয়া দেখা দিল ফিন্‌ফিনে গোঁফ-দাঁড়ি। পিঠের সেই বেতের দাগ-গুলা ছাড়া পানুর পূর্ব-জীবনের সকল পরিচয়-চিহ্নই বিলুপ্ত হইয়া গেল। মদে তাহার এখন প্রবল আসক্তি। এক গরুর মাংস ছাড়া আর কোন মাংসেই তাহার অরুচি হয় না। গরুর মাংসটা সে এখনও খাইতে পারে না। নাম শুনিলে ভিতরটা মোচড় দিয়া উঠে। এখন সে শিকারে যায়, সাপ ধরিতে পারে। বাঁশের খুঁটার মাথায় লম্বা দড়ি টাঙাইয়া—বাঁশ হাতে তাহার উপর নাচিয়া গ্রামে গ্রামে খেলা দেখায়। গ্রামের লোকের সঙ্গে ঝগড়া বাধাইয়া দাঙ্গাও করে। কেবল গরুর মাংস খাইতে না পারার মত পারে না চুরি করিতে। মনে পড়িয়া যায় সেই জমাদারের কথা, দারোগার কথা, তার বাপের মুখ, মায়ের কান্না, দিদি চারুর সেই বিহ্বল চেহারা। খুন করিলে ফাঁসী হয়, চুরি ডাকাতিতেও জেল হয়। ওই দুইটা অপরাধের কায়দায় পাইলে পুলিসের চেহারা—সেই চেহারা। নহিলে পুলিসকে কিসের ভয়? তাহার মনে পড়ে, জমাদারের গালে বুধনের হাতের সেই প্রচণ্ড চড়ের কথা, নিজের ঝাঁপাইয়া পড়ার কথা। সে কামনা করে, এমনি অপরাধে অপরাধী অবস্থায় সেই জমাদারটাকে একবার পায় সে! আপন মনেই সে দাঁতে দাঁত ঘষিয়া হিংস্র ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে। টুঁটিটা সে ছিঁড়িয়া দেয় তাহা হইলে।

মধ্যে মধ্যে মা-বাপ-দাদা-দিদিকে মনে পড়ে। এ মনে পড়া জমাদার বা পুলিস প্রসঙ্গে মনে পড়া হইতে স্বতন্ত্র। গ্রামে ভিক্ষা করিতে গিয়া কোন বাড়িতে তাহাদের বাড়ির সঙ্গে কোন সাদৃশ্য দেখিলে, অথবা কাহারও মুখের সহিত আপনজনের মুখের আদল দেখিলে তাহার এ ধারার স্মৃতি জাগিয়া উঠে। বিশেষ করিয়া কোন সুন্দরী তরুণীকে দেখিলে তার মনে পড়ে দিদি চারুকে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িয়া যায় বাড়ির কথা। এই ধারার মনে পড়ার আরও একটা ভিন্ন রূপ আছে। গ্রামে গিয়া ঢাকের বাজনা শুনিয়া তাহার মন চঞ্চল হয়, সে সমস্ত গ্রামখানা খুঁজিয়া দেখে, কোথায় কোন্ ঠাকুরের পূজা হইতেছে। সেদিন তার মনে পড়ে বন্ধুদের কথা, গ্রামের লোকের কথা, বাবুদের চণ্ডীমণ্ডপের কথা; মনে পড়ে প্রতিমা-গঠনকারী

কারীগরদের, বলিদানের ছেত্তাদারকে, পালকের প্রকাণ্ড ফুলওয়ালা ঢাক কাঁধে শ্রীমন্ত বায়েনকে; মনে পড়ে বলিদানের সময়ের জনতার মত্ততা, মনে পড়ে বিসর্জনের সমারোহ, আলো, বাজনা, রাত্রির আকাশে ছুটন্ত এবং জ্বলন্ত হাউই বাজি, বিসর্জনের দীঘি, দীঘির পাশে হাটতলা, হাটতলার কাছে স্কুলের খেলার মাঠ, খেলার মাঠের পরে সবুজ মাঠ, মাঠের ওপারে আবার গ্রাম। সেদিন সে উদাস হইয়া থাকে।

রুকণী সেদিন তাহার কাছে আসিয়া সামান্য কয়েকটা কথা বলিয়াই অকস্মাৎ চলিয়া যায়, আবার আসে—আবার চলিয়া যায়, শেষ পর্যন্ত পানুর সঙ্গে দুর্দান্ত কলহ জুড়িয়া দেয়। এখন আর সে তাহার সঙ্গে মারামারি করিতে আসে না। পানু এখন তাহার চেয়ে মাথায় অন্তত ছয়-সাত আঙুল বড় হইয়া উঠিয়াছে, হৃষ্টপুষ্টতায়ও সে রুকণীর চেয়ে অনেক হৃষ্ট-পুষ্ট। রুকণী এখন বরং আগের চেয়ে শীর্ণ হইয়াছে, আগের সেই গোলগাল মোটাসোটা চেহারার মেয়েটি নয়। এখন খানিকটা লম্বা দেখায়, তাহার ঝাঁকড়া চুলগুলি বেশ খানিকটা লম্বা হইয়াছে, সেই মোটা গাল দুইটা ঝড়িয়া গিয়াছে, খাঁদা নাকটা খানিকটা টিকলো হইয়াছে, গলার আওয়াজও তাহার এখন আর এক রকম হইয়াছে। একটা যেন সুর আসিয়াছে। যতক্ষণ পর্যন্ত পানু উদাস হইয়া থাকে ততক্ষণ আর রুকণীরও স্বস্তি থাকে না, পানুকে সে স্বস্তি দেয় না। ঝগড়া করিয়া কখনও বা কাঁদিয়া চলিয়া যায়, আবার আসে—আবার আসে—আবার আসে। শেষ পর্যন্ত পানুও অতীত কথা ভুলিয়া রুকণীর সঙ্গে ঝগড়ায় মাতিয়া উঠে। রুকণী নিজের কুকুর আনিয়া পানুর কুকুরের সঙ্গে ঝগড়া বাধাইয়া দেয়; কখনও বা নিজেই লাঠি দিয়া পেটে। মোট কথা পানুর চুপ করিয়া বসিয়া থাকা হয় না।

এই মেয়েটা যেন তাহাকে গভীর আকর্ষণে টানিয়া অতীত কালের জীবন—জীবন-স্মৃতি হইতে লইয়া চলিয়াছে তাহাদের এই জীবনে। অরণ্য-প্রান্তরের বুকে একান্তে সমগ্র সভ্য-সমাজের নিয়ম-শৃঙ্খলা ধ্যান-ধারণাকে বর্জন করা বিচিত্র সমাজ। তাহাদের মস্তিষ্ক গ্রহণ করিতে পারে কি পারে না—কে জানে! হয় তো পারে—অন্তত কিছুটা পারে, কিন্তু তাহাদের যেন শপথ আছে কিছুতেই গ্রহণ করিবে না। উন্মত্ত আনন্দে উল্লাসের স্বাদে বিভোর হইয়া কত যুগ পশ্চাতের অরণ্য জীবন, যাযাবর সভ্যতা। পানু বিংশ শতাব্দীতে জন্মিয়া—কত সহস্র শতাব্দী অতীত কালের মধ্যে গিয়া পড়িয়াছে; ভুলিয়া যাইতেছে—শত শত শতাব্দীর সাধনায় পরিশ্রুত রক্ত তাহার ক্রমশ গাঢ় হইয়া সে সাধনার ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে। নদী যেন উজানে ফিরিয়া অরণ্য উপত্যকায় ফিরিয়া চলিয়াছে। সমুদ্র-সঙ্গমে আর যাইবে না।

কিছু দিন পর।

হঠাৎ সেদিন তাহার জীবনে একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল। তাহার জীবনে সে যেন একটা ভূমিকম্পের মত ঘটনা। সে কম্পনে তাহার মনের অতীত জীবনের পুরাতন অধ্যায়গুলি প্রাচীন জীর্ণ কুটিরশ্রেণীর মত ধ্বসিয়া পড়িয়া গেল।

রুকণীর সঙ্গে সেদিন তাহার প্রচণ্ড ঝগড়া বাধিয়া গেল।

সেই ঝগড়ায় তাহার জীবনের অতীত যেটুকু গোপন অন্তস্তলে লুকাইয়া বাঁচিয়াছিল, একটা ধ্বস নামিয়া সেটুকুও বুঝি শেষ হইয়া গেল।

দুপহর বেলায় রুকণী একটা গ্রামে ভিক্ষা করিতে গিয়াছিল। সঙ্গে ছিল পানু। বোধ হয় সেটা চৈত্র মাস। গরমের আমেজ, বাতাসে ধূলা এবং অশোক ও লাল কাঞ্চনের ফুল দেখিয়া পানুর মনে হইল মাসটা চৈত্রের শেষ বা বৈশাখের প্রথম। গৃহস্থ-বাড়িতে লোকজনেরা ঘুম শুরু করিয়াছে। হা-ঘরেদের পক্ষে সময়টা ভারি সুবিধার। জনবিরল বাড়িতে দরজা খোলা

পাইলে যাহা সম্মুখে পড়িবে তাহা লইয়াই সরিয়া পড়িতে পারা যাইবে। অবশ্য পানু রুকণীকে প্রতিশ্রুত করাইয়া লইয়াছে যে, চুরি সে করিতে পারিবে না।

রুকণী হাঁকিতেছিল—এ খো-খার মা, ঝুমঝুমি লেবি ?

পানু হাঁকিতেছিল—বিষ পাথল। খুন পাথল! লে—লে—লে। বিষ পাথল। সাঁপে কাটে, বিচ্ছু কাটে, খুন গিরে, সব আরাম হো যায়গা।

একটি সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ির দরজা খুলিয়া একটা ঝি ডাকিল—এই, শোন্।

—ঝুমঝুম লেবি ? টুকরী লেবি ?

—না। শোন্। তোরা কাঁউরের বিদ্যে জানিস ?

রুকণী সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল—হাঁ, হাঁ, জানি কামিচ্ছা-মায়ীকি জয়! জয়।

—আমাদের বউয়ের ছেলে হয়ে বাঁচে না; মাদুলী আছে তোদের ?

—হাঁ। জড়ী আছে, ভূত-পিশাচ ভাগ যায়।

—না না। জড়ী ওষুধ তোদের খাবে কে ? মাদুলী আছে ? মন্তর-তন্তর জানিস ?

—হাঁ হাঁ, খানে নেই হোগা। জড়ী বেঁধে লিবি হাঁতমে। লাল ডুরিসে বাঁধবি।

—বেঁধে রাখলেই হবে ?

—হাঁ। জরুর হোবে, কামিচ্ছা-মায়িকী দয়াসে।

—আয়, তবে আয়। কিন্তু চেঁচামেচি করিস নে বাপু, বাবুরা কি গিন্নীরা উঠলে মুশকিল হবে।

—হাঁ হাঁ। চল্।

একটি সুন্দরী বধূ। বিষণ্ণ মুখ, চোখের কোলে কালি পড়িয়াছে, ব্যাকুল দৃষ্টিতে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। হঠাৎ পানুর মনে পড়িয়া গেল দিদি চারুকে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল, রুকণী ইহাকে প্রতারণা করিবে। তাহার মন চঞ্চল ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সে চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল, কি করিয়া মেয়েটিকে বুঝানো যায়—তামাম ঝুট, সব মিথ্যা।

এদিকে রুকণী তখন তাহার কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। মেয়েটির হাত দেখিয়া, তাহার চুল শুঁকিয়া, তাহার চারিদিকে ঘুরিয়া বলিল—এক পিচাশ ভর করেছে, সেই তোর ছেলে মেরে দেয়।

ঝি এবং বধূটি দুইজনেই শিহরিয়া উঠিল। রুকণী বলিল—ইসকে বাদ তোকে সুদ্ধ মারবে পিচাশ! শরীরের রক্ত চুষে নেবে, এই এমনি কাঠির মত হয়ে যাবি, সাদা প্যাঙাশ রঙ, তারপর একরোজ পিচাশ তোর ঘাড়টাও মট করে ভেঙে দেবে।

ঝি বলিল—তুই মাদুলী দিবি বললি, তাতে পিচাশ যাবে ?

—আলবৎ। তবে মাদুলী দেবার আগে ওকে ঝাড়তে হবে। মন্তর—মন্তর! একটো কাপড়া আন্।

—কাপড়া! কাপড়া-ফাপড়া নয়। মাদুলী দিবি, কি নিবি তাই বল ?

—ডরো মৎ। কাপড়া নেবে না হামি। সব তোমাদেরই থাকবে; তবে চাই।

—দেখিস ?

—হাঁ হাঁ। দেখবে। কাপড়া আন্। আওর 'চাউল' আন্ 'পান' সের।

—পাঁচ সের ? চাল কি হবে ?

—মন্তর। মন্তর। হামি মন্তর দেবে। ওই চাউল খাবি। পিচাশ ভাগ যায়গা।

চাল-কাপড় আসিল। ওদিকে পানু ক্রমশ অধীর হইয়া উঠিল। ঝিটা দেখিয়া শুনিয়া

একখানা পুরানো কাপড় আনিল। রুকণী কিন্তু তাহার অপেক্ষা অনেক হুঁশিয়ার, সে বলিল —রাখ্।

তারপর বিড়-বিড় করিয়া মন্ত্র পড়িয়া, একটা শিকড় মাথা হইতে পা পর্যন্ত বুলাইয়া দিয়া বলিল—পাকড়ো। বধূটি শিকড়টি লইল। রুকণী বলিল—আর কাপড়টা বদল কর। মন্তর। মন্তর। যেটা তুই প'রে আছিস, ওটা বদল কর্। ওটাতে এখনও পিচাশের বাতাস লেগে আছে। কর—বদল কর।

বধূটি জীর্ণ কাপড়খানা পরিয়া পরনের নূতন কাপড়খানা ছাড়িয়া ফেলিল।

রুকণী কাপড়খানার উপর চালগুলাকে তুলিতে আরম্ভ করিল। ঝিটা শঙ্কিত হইয়া বলিল —মন্তর! মন্তর! মন্তর দেগা?

চাল তুলিয়া বধূটির দিকে চাহিয়া রুকণী বলিল—একটুকরা সোনে—সোনে দে ইসকা উপর।

—সোনা? না। কাজ নাই আমাদের ঝাড়িয়ে।

—দেও। দেও।

—না।

—নেই দেগা?

—না। চালাকি করবি তো লোক ডাকব।

সঙ্গে সঙ্গে রুকণী চোখ দুইটা বড় এবং স্থির করিয়া বলিল—আব কামিচ্ছা-মায়ীর গোসা হো গেয়া। আঁ—আঁ—আঁ! বলিয়া সে ভয়ঙ্করীর মত তাহাদের দিকে অগ্রসর হইল। পানু দেখিল, ঝি ও বধূটি ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। চীৎকার করিবার মত সামর্থ্যও তাহাদের নাই। এইবার রুকণী গিয়া কাছে দাঁড়াইয়া মাথার চুলগুলো মুখের উপর ফেলিয়া আঁ-আঁ করিয়া যেই বলিবে—দো সোনে দো, অমনি উহারা কিছু একটা সোনার গহনা ফেলিয়া দিবে। পানু জানে। তাহার আর সহ্য হইল না। সে লাফাইয়া গিয়া রুকণীর হাত ধরিয়া ঝাঁকি দিয়া বলিল—খবরদার!

রুকণী তাহার মুখের দিকে চাহিয়াই সমস্ত বুঝিল, কিন্তু তবু শেষ চেষ্টা করিল। বলিল— সোনে দেনে কহো। সোনে—সোনে। নেহি তো কামিচ্ছা-মায়ী নেই শুনেগা।

—খবরদার! চলে আও। আও। পানু আবার ঝাঁকি দিয়া তাহাকে টানিল।

এবার রুকণী আর চেষ্টা না করিয়া একসঙ্গে বাঁধা চাল ও কাপড় কাঁধে তুলিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া আসিল। পানু তখনও তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছিল।

গ্রাম পার হইয়া একটা জঙ্গল, সেইখানে তাহাদের ঝগড়া আরম্ভ হইল। গ্রামের পথে রুকণী কিছু বলিতে সাহস করে নাই। রুকণী এবার বলিল—কাহে, কাহে? কেন তুই এমন করলি? ছোড় দে হামকো।

পানুর মুখে তখনও সেই বুলি—খবরদার!

রুকণী বলিল—শয়তান—বেইমান!

—খবরদার!

রুকণী তাহার হাতে একটা কামড় বসাইয়া দিল। পানু তাহার হাত ছাড়িয়া দিয়া অন্য হাতে চোয়ালের কশ দুইটা চাপিয়া ধরিল নির্মমভাবে। যন্ত্রণায় রুকণীও কামড় ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল, পরক্ষণেই সে তাহার বোঝা এবং চাল-বাঁধা কাপড়টা ফেলিয়া দিয়া পানুর উপর লাফাইয়া পড়িল। দুইজনে ক্রুদ্ধ আক্রোশে পরস্পরকে নির্মমভাবে আক্রমণ করিল। রুকণীর

নখের আঁচড়ে পানুর বুক-হাত ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল ; পানু তাহার চুল ছিঁড়িয়া দিল, প্রচণ্ড আক্রমণে সে তাহাকে বিপর্যস্ত করিয়া তুলিল। পানু এখন রুকণী অপেক্ষা অনেক সবল। চুলের মুঠি ধরিয়া তাহাকে টানিয়া মাটিতে আছড়াইয়া ফেলিয়া পানু রুকণীর বুকে চাপিয়া বসিয়া গলা টিপিয়া ধরিল। রুকণী তাহার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিল। পানু হিংস্র আক্রোশে ব্যঙ্গভরে হাসিতেছিল। সহসা সে দেখিল, রুকণীর দৃষ্টি বদলাইয়া আসিতেছে। অদ্ভুত সে দৃষ্টি! সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁটে ফুটিয়া উঠিয়াছে বিচিত্র মদির হাসি। পানুর বুকের মধ্যে জাগিয়া উঠিল এক প্রচণ্ড আবেগ। রুকণী দুই হাত বাড়াইয়া পানুর গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার মুখটা টানিয়া আনিল আপনার মুখের উপর, প্রচণ্ড আবেগে পানুর মুখটা চুমায় চুমায় ভরিয়া দিল। উষ্ণ নিশ্বাসে চুম্বনে পানুর শরীরে যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

সাত

সব শেষ হইয়া গেল। সব ভুলিয়া গেল পানু। তাহার পূর্বপুরুষেরা অন্ধকার নরকে ডুবিয়া গেল। পুরাণে আছে জরৎকারু মুনি একদা অন্ধকার গহ্বরে তাঁহার পূর্বপুরুষদের এক গোছা ঘাসের শিকড় ধরিয়া ঝুলিতে দেখিয়াছিলেন। সে শিকড়ও আবার একটা ইঁদুর কাটিতেছিল ; কাটিলেই ওই বিস্মৃতির অন্ধকূপে পড়িবার কথা। পানুর পূর্বপুরুষ সেই অন্ধকূপে পড়িয়া গেল বোধ হয়। রুকণীকে লইয়া পানু উন্মত্ত হইয়া সব অতীত ভুলিয়া একেবারে উহাদের একজন বনিয়া গেল।

রুকণীর সাহচর্য তাহার জীবনের অক্ষয় স্মৃতি। সমস্ত পৃথিবী তাহার কাছে পরম উপভোগ্য হইয়া উঠিল। সে সব ভুলিয়া গেল ; অতীত জীবনের কথা দিনান্তে তাহার একবারের জন্যও মনে হইত না। ধীরে ধীরে সে উপলব্ধি করিল, পেট পুরিয়া আহার—বিশেষ করিয়া পশুমাংস আহার তাহার সঙ্গে মদ্যপানজনিত সুগভীর উত্তেজনার বিহ্বলতা আর ওই রুকণীর উন্মত্ত সাহচর্য, এই হইল পরম সুখ। এ সুখ উপভোগের জন্য চাই দুর্দান্ত সাহস এবং প্রচণ্ড শক্তি। ও দুইটা না থাকিলে পৃথিবীতে কিছুই পাওয়া যায় না। পাইবার অধিকারও নাই কাহারও। উপলব্ধিটা অবশ্য জন্মিল ক্রমশ—অভিজ্ঞতা হইতে।

পূর্বেই রুকণীর একজনের সঙ্গে বিবাহ হইয়াছিল। বিবাহ নামক প্রথাটা ইহাদের আছে, অতি সামান্য কিছু অনুষ্ঠানও আছে। উহাদের গুণীন বিবাহের স্থান নির্দেশ করে, অর্থাৎ প্রান্তরে পথে বনে চলিতে চলিতে একটা দেবতাশ্রিত স্থান সে আবিষ্কার করে। পাহাড়ের কোন অন্ধকার গুহা-মুখ, বনের মধ্যে প্রকাণ্ড কোন বনস্পতির তলদেশ অথবা ধূ-ধূ করা প্রান্তরের মধ্যে কোন এক শিলাস্তূপের পাদদেশ, সেইখানে দেবতার দরবারে বিবাহ হয়। গুণীন প্রধান ব্যক্তি। কিন্তু বিবাহবিচ্ছেদও হয়, অতি অল্প কারণেই হয়। তিনবার, চারবার, পাঁচবার—কতবার হয় তার স্থিরতা নাই। তবে প্রতিবারই বিচ্ছেদের সময় খানিকটা রক্তারক্তি হইয়া যায়, কখনও কখনও খুনও হয়, সে খুনের কথা পুলিসের খাতায় উঠে না ; সে ক্ষেত্রে মৃতদেহটা তাহারা জ্বালাইয়া দেয়। বিচার করে দলপতি, সাজা হয়। বৃদ্ধবয়সের বিবাহই ইহাদের বিবাহ, সে বিবাহে আর বিচ্ছেদ ঘটে না। কিন্তু রুকণী তরুণী। রুকণীর স্বামী তরুণ নয়, বয়স্ক জোয়ান। লোকটি এই হা-ঘরের মধ্যে সম্পন্ন ব্যক্তি, বয়সে রুকণীর সঙ্গে তাহার ব্যবধান খানিকটা বেশী। লোকটির সম্পন্নতার কারণ, তাহার চুরিবিদ্যায় অসাধারণ দক্ষতা।

লোকটি শক্তিতে খুব সবল নয়, বয়সও চল্লিশের ওপারে ; কিন্তু দীর্ঘদেহ ব্যক্তিটি সিঁধ কাটিয়া চুরি করিতে শৃগালের চেয়েও চতুর। রাত্রে বাহির হইয়া সে কখনও রিক্ত হস্তে ফেরে না। আর পারে ছুটিতে। লম্বা লম্বা পায়ে ঈষৎ হেঁট হইয়া সে ছোটে খরগোশের মত। মধ্যে মধ্যে এক-একটা লাফ দিয়া একেবারে পাঁচ-সাত হাত ডিঙাইয়া চলিয়া যায়। ইহার পূর্বে তাহার তিনটা বিবাহ হইয়া গিয়াছে, রুকণী তাহার চতুর্থতমা স্ত্রী। পূর্বের তিনটার মধ্যে দুইটার সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ হইয়াছে, একটা—সেটা তাহার দ্বিতীয়া স্ত্রী—সতীন সত্ত্বেও ঘর করিতেছে। রুকণীকে প্রৌঢ় টাকা দিয়া কিনিয়াছিল। রুকণীর বাপের জেল হইলে সে-ই রুকণীর মা ও রুকণীর ভরণ-পোষণ চালাইয়াছিল।

ওই সতীনটাই স্বামীকে রুকণীর সঙ্গে পান্নুর গোপন সম্বন্ধের সংবাদ দিল। গভীর রাত্রে রুকণী তাঁবু হইতে বাহির হইয়া যায়।

ওদিকে পান্নু অশ্রান্ত পদক্ষেপে নির্দিষ্ট স্থান হইতে রুকণীদের তাঁবুর প্রান্ত পর্যন্ত কুকুরগুলার দৃষ্টি বাঁচাইয়া আনাগোনা করে।

ওই মেয়েটা একদিন ব্যাপারটা দেখিয়া ফেলিল। রুকণীর নির্যাতনে তাহার পরম আনন্দ। সে একদিন স্বামীকে জাগাইয়া সব দেখাইয়া দিল। স্বামীর সে কি গভীর ঘুম! কিছুতেই ভাঙে না। মায়াবিনী রুকণী পান্নুর মারফতে বুধনের কাছ হইতে ঘুমের ঔষধ সংগ্রহ করিয়াছিল, নিত্য স্বামীকে আহার্যের সঙ্গে খাওয়াইত। ভুল হইয়াছিল, সতীনকে খাওয়ায় নাই। রুকণীর সতীন স্বামীকে অনেক ঠেলিয়া খোঁচা দিয়া জাগাইয়া দেখাইল, রুকণী নাই। দুইজনে বাহির হইয়াও রুকণীকে পাইল না। অগত্যা অপেক্ষা করিয়া রহিল। রুকণী ফিরিতেই লোকটা খপ করিয়া তাহার টুঁটি টিপিয়া ধরিল। নলীর দুই পাশে নখ দিয়া টিপিয়া ধরিয়াছিল—অল্প সময়ের মধ্যেই রুকণীর জীবন শেষ হইয়া যাইবার কথা। কিন্তু ব্যাপারটা পান্নুও দেখিয়াছিল। সে রুকণীকে পৌঁছাইয়া দিতে আসিয়াছিল। ছুটিয়া আসিয়া পান্নু লোকটার চোয়ালে বসাইয়া দিল প্রচণ্ড এক ঘুষি!

তারপর আরম্ভ হইল দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ।

পান্নুর বয়স কচি, এখনও শক্তি পরিপক্ক সামর্থ্যে জমাট বাঁধিয়া উঠে নাই। পান্নু প্রচণ্ড মার খাইল। কিন্তু তবু হার মানিল না।

আবার একদিন দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ হইয়া গেল। সেদিন বুধন না থাকিলে লোকটা পান্নুকে শেষ করিয়া দিত। সর্দার বিচার করিয়া সাজা দিল রুকণীকে একা। অন্যায় তো রুকণীর। তাহাদের বিচারে অন্যায় নারীর—এদিকে অন্যায় পুরুষের নাই। শাস্তি অনুযায়ী একটা খুঁটি পুঁতিয়া সেই খুঁটির সঙ্গে রুকণীকে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া প্রহার করা হইল। রুকণীর পিঠ কাটিয়া দড়ির দাগ বসিয়া গেল!

পান্নু উন্মাদ হইয়া গেল। তাহার মনে পড়িয়া গেল নিজের পিঠের দাগগুলার কথা, সেদিনের সেই যন্ত্রণার কথা। সারাটা দিন সে পড়িয়া পড়িয়া কাঁদিয়া সারা হইল। বুধন এবং তাহার স্ত্রী তাহাকে অনেক বুঝাইল, অন্য একটি কিশোরী মেয়েকে আনিয়া দেখাইয়া বলিল—ইহাকেই তুমি সাদি কর। আজই সাদির ব্যবস্থা করিব। কিন্তু পান্নু শুনিল না।

সেই দিনই গভীর রাত্রে সে ছুরি লইয়া বাহির হইল। বুকে হাঁটিয়া তাঁবু কাটিয়া রুকণীদের তাঁবুতে প্রবেশ করিল, তারপর চাপিয়া বসিল রুকণীর স্বামীর বুকে।

রুকণীর স্বামী জাগিয়া উঠিল কিন্তু তখন তাহার নিরুপায় অবস্থা।

পান্নু ছুরিখানা লইয়া নিষ্ঠুর আনন্দে ভাবিতেছিল, কেমন করিয়া লোকটাকে সে হত্যা

করিবে! একেবারে বুকে বসাইয়া দিবে? অথবা গলার নলিটা কাটিয়া দিবে, যেমন করিয়া তাহারা পশুর নলিটা সর্বাগ্রে কাটিয়া দেয়! হঠাৎ তাহার নাকু দত্তের কথা মনে পড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা দুর্দান্ত আবেগ তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, তাহার সমস্ত শরীর যেন অবশ হইয়া আসিতেছিল। হঠাৎ সে চীৎকার করিয়া উঠিল—সেই বিস্ময়কর চীৎকার। নিজের চুল টানিল, তারপর ধীরে ধীরে লোকটাকে ছাড়িয়া দিয়া বলিল—আমাকে তুই খুন করে ফেল।

লোকটা আশ্চর্য হইয়া গেল। সেও পানুকে কিছু বলিল না। নিজে আসিয়া রুকণীর বাঁধন খুলিয়া দিয়া বলিল—যা, নিয়ে যা তুই।

রুকণীকে লইয়া সে পৃথক করিয়া ঘর-সংসার পাতিল। ঘর-সংসার মানে ছেঁড়া একটা তাঁবু, পুরু লম্বা একখানা চট। দুইটা বাঁশের খুঁটির মাথায় আর একটা লম্বা বাঁশ বাঁধিয়া তাহার উপর চটখানা ফেলিয়া চটটার দুই দিকে কয়েকটা খুঁটির সঙ্গে বাঁধিয়া দেয়। চটখানা এবং ঘর-সংসারের সব সামগ্রীই তাহাকে দিল বুধন ও তাহার স্ত্রী। সংসার শুরু করিতে গিয়া পানুর অতীত জীবন মনে পড়িল। সে জীবনের ঘরের শৃঙ্খলা, রুচি, পরিচ্ছন্নতা—অনেক কিছু মনে পড়িল, সেগুলি কাজেও আসিল। গোটা বেদে পাড়াটা অবাক হইয়া গেল।

রুকণী যে রুকণী, সেও বলিল—তাহার মত আদমী সে দেখে নাই। দুই হাতে গলা জড়াইয়া ধরিয়া পানুকে সমাদর করিয়া ঝুলিতে আরম্ভ করিল। বলিল—দেখিস তুই, রুকণী তোর সঙ্গে কখনও বেইমানী করবে না। তাহার ঘাড়টি নাড়িয়া এদিক হইতে ওদিক পর্যন্ত মাথাটি নাড়িয়া বলিল—ক—ভি—না।

পানু গলিয়া গেল।

সে দিন সে কাঁটায় সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করিয়া একটা বনস্পতিতুল্য শিমুল গাছে চড়িয়া এক আঁচল টকটকে রাঙা শিমুলফুল পাড়িয়া আনিয়া গুচ্ছ বাঁধিয়া রুকণীর খোঁপায় পরাইয়া দিল। কালো মেয়ের মাথায় রুক্ষ কালো চুলে এক গুচ্ছ রক্তরাঙা ফুল!

রুকণী কিন্তু সাক্ষাৎ শয়তানী। স্বভাবের মধ্যে তাহার শয়তান বাস করিত, সে কি করিবে? মাস কয়েক যাইতে না যাইতে সে অন্য একটি তরুণের প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িল। পানুও উভয়কে একসঙ্গে আবিষ্কার করিল।

বুধন বলিল—ওটাকে ছোড় দে। দুসরা সাদি কর।

পানু কিন্তু রুকণীর প্রেমে পাগল। নিষ্ঠুর নির্যাতনে রুকণীকে নির্যাতিত করিয়া সে তাহাকে শাসন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে চাহিল। একদিন এই দ্বন্দ্বের মধ্যে রুকণী তাহার হাতে বসাইয়া দিল ছুরি।

এবার সর্দার বিচার করিয়া রুকণীর মাথা মুড়াইয়া দিতে হুকুম দিল এবং বলিয়া দিল—মেয়েটাকে কেহ সাদি করিতে পাইবে না। লোকে বলিল ঠিক হইয়াছে। রুকণী কিন্তু বিচিত্র মেয়ে। সে বলিল—তাহার চুল সে মুড়াইতে দিবে না। সে হিংস্র বাঘিনীর মত দাঁড়াইল। কিন্তু এতগুলি লোকের কাছে সে কি করিবে? জোর করিয়া তাহার মাথা মুড়াইয়া দেওয়া হইল। পরদিন সকালে দেখা গেল একটা গাছের ডালে দড়ি বাঁধিয়া রুকণী গলায় ফাঁস লাগাইয়া ঝুলিতেছে।

পানু বুক চাপড়াইয়া কাঁদিল। তারপর দেখা গেল, সে কেমন অন্য মানুষ হইয়া গিয়াছে।

বুধন এবং তাহার স্ত্রী তাহাকে সাদির জন্য ধরিল, কিন্তু সে বলিল—না। সে এবার মাতিয়া

গেল বুধনের সংসার লইয়া। তাহাদের ভঁইষা দুইটার পরিচর্যা করে, ঘাস কাটিয়া আনে, ডাল কাটিয়া আনে, দুধ হইতে ঘি তৈয়ার করে, সঞ্চয় করে। যেখানে তাহারা তাঁবু ফেলে, সেখানে নিকটস্থ গ্রামে গিয়া ঘি বেচিয়া আসে। বন হইতে লতা কাটিয়া আনিয়া টুকরি বোনে, ঝুমঝুমি তৈয়ারী করে। তাহার প্রথম জীবনের সামাজিক সংসারজ্ঞান এবং সেই জীবনের রুচি হইতে সে এই সব বস্তুর অনেক পরিবর্তন করিল। যাহার ফলে বুধনের স্ত্রীর জিনিস পল্লীর লোকেরা আদর করিয়া কিনিতে আরম্ভ করিল। বুধনের সংসারে স্বাচ্ছল্যের সীমা রহিল না। অন্য পরিবারগুলি ঈর্ষাতুর হইয়া উঠিল। এমন কি দলের সর্দার পর্যন্ত।

ক্রমে পানু দেখিল, হা-ঘরেদের কিশোরী যুবতী মেয়েগুলি তাহার মনোযোগ আকর্ষণের জন্য লালায়িত হইয়া ফেরে। তাহারা চোর ডাকাত দুর্দান্ত জোয়ান দেখিয়াছে; পানুর সে শৌর্যেরও অভাব নাই; উপরন্তু তাহার এ এক অদ্ভুত শক্তি! ঘরকে এমন পরিপাটি করিয়া গুছাইয়া সাজাইয়া তুলিতে তাহাদের কেহ পারে না। এমন তীক্ষ্ণ ব্যবসায় বুদ্ধি তাহাদের কাহারও নাই। এমন রুচি কোন পুরুষের নাই, এমন পরিচ্ছন্ন কেহ নয়। মেয়েগুলা সপ্রেম দৃষ্টিতে কটাক্ষ হানিয়া কথা বলে, হাসে। পানু হাসিয়া বলে—ভাগ।

একদা স্বয়ং সর্দারের মেয়ে তাহার কাছে আসিল। একটা প্রান্তরে তাঁবু পড়িয়াছিল, বড় বড় পাথরের চাঁই চারিদিকে। একখানা পাথরের উপর বসিয়া দুলিতে দুলিতে বলিল—সর্দারের বেটী এল।

পানু কথা বলিল না।

সে বলিল—তুহার পাশে এল।

পানু কথা বলিল না।

সে বলিল—হামাকে সাদি করবি?

পানু হাসিল।

সর্দারের মেয়ে বলিল—কোইকে পাশ যাবে না হামি।

পানু এবার বলিল—যাও হিঁয়াসে।

—না।

পানু ডাকিল—বাবা! বুধনকে ডাকিল।

বুধনকে এ-দলের সকলের বড় ভয়। সে গুণিন, তাহার উপর এখন সে দলের মধ্যে সকলের চেয়ে অবস্থাপন্ন লোক। সর্দার পর্যন্ত তাহার কাছে টাকা ধার করিয়াছে। মেয়েটা সকরুণ স্বরে বলিল—পানু!

পানু আবার ডাকিল—বাবা!

এবার সে উঠিয়া গেল।

দলের অন্য মাতব্বরেরা আপন আপন কন্যার জন্য বুধনকে ধরিল—তোমার বেটার সঙ্গে আমার বেটীর সাদি দাও। ভঁইসা দিব, কুত্তা দিব!

বুধন পানুকে বলিল। কিন্তু পানু বলিল—নেহি। বার বার ঘাড় নাড়িয়া বলিল—ন, ন, ন, ন। বুধনেরা বিস্মিত হইয়া গেল। বুধন বলিল—আরে বেটা, ইয়ে তুমারা বেওকুফি। যো গিয়া—সো গিয়া। ঝুটমুট—বিলকুল ঝুটমুট!

তবু না। পানু কেমন হইয়া গিয়াছে। ক্রমে অবশ্য রুকণীর শোক কমিল। কিন্তু রুকণীর মোহ কাটিলেও ইহাদের মেয়েগুলিকে দেখিয়া কেমন একটা বিতৃষ্ণা জন্মায় তাহার। বিশেষ করিয়া সে যখন গ্রামে যায়, গ্রামের কন্যা-বধূগুলিকে দেখে, তখন তাহার সমস্ত অন্তর হা-ঘরেদের

উপর ঘৃণায় ভরিয়া উঠে।

গ্রামের মেয়েরা যখন বলে—দেখিস দেখিস, ছোঁয়া পড়বে! মাগো, কি গন্ধ গায়ে! তখন তাহার চীৎকার করিতে ইচ্ছা করে, সেই বিচিত্র চীৎকার। সেদিন রাত্রে ঘুম হয় না, সে বসিয়া থাকে—ভাবে। এক এক সময় মনে হয়, গভীর রাত্রে উঠিয়া পলাইয়া যায়। কিন্তু ভয় হয়। তাহাকে পানু বলিয়া চিনিলে পুলিস তাহাকে গ্রেপ্তার করিবে। গত্যন্তরহীন হইয়া সে হা-ঘরেদের মধ্যেই কাটাইয়া চলে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। গ্রাম হইতে গ্রামান্তর, এক জেলা হইতে অন্য জেলায়, বাংলা দেশ পার হইয়া সাঁওতাল পরগণায়, সেখান হইতে বিহারের গ্রামে। আবার পাক দিয়া ফেরে। পৌষ-মাঘ মাসটা তাহারা বাংলা দেশে আসে। পৌষ হইতে আষাঢ়—বর্ষার প্রারম্ভ পর্যন্ত, বাংলা দেশের গ্রামে গ্রামে ফেরে। এ সময়ে দেশটায় লোকের হাতে সম্পদ থাকে।

হঠাৎ আবার জীবনে আসিল একটা বিপর্যয়।

সময়টা পৌষ মাস। তাহারা সাঁওতাল পরগণা পার হইয়া বাংলা দেশের প্রান্তদেশে তাঁবু গাড়িয়াছিল। ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে সরকারী পাকা সড়কের দুই পাশে ছোট কয়েকটা দোকান। সাঁওতাল পরগণা হইতে শালপাতা, কাঠ লইয়া যে সব গাড়ী যায়, তাহারা এইখানে 'আঁট' দিয়া বিশ্রাম করে। ময়ূরাক্ষীর ওপারেও আর একটা বাজার। ওদিকের বাজারটাই বেশ বড়। অনেকগুলি দোকান, পাশে পল্লীও আছে। পানু বাজার দেখিয়া হাঁড়ি লইয়া নদী পার হইয়া ওপারে গিয়া উঠিল।

—ঘিউ লেবে বাবু, ঘিউ! ভঁয়ষা ঘিউ।

কেহ কেহ আঙুলে লইয়া শুঁকিয়া হাতের উপর ঘষিয়া দেখিল, তারপর বলিল—চর্বি হ্যায়। সাঁপকে চর্বি দিয়া।

পানু দাঁত বাহির করিয়া গর্জন করিয়া উঠিল।

বাংলা ভাষায় লোকে তাহাকে গাল দিল। পানুর বুঝিতে দেরি হইল না। গোটা বাজারটা ফিরিয়াও কেহ তাহার ঘি লইল না। লইল না নয়, যে দরে তাহারা লইতে চায়—সে দরটা যে অত্যন্ত অসঙ্গত, তাহারা যে তাহাকে ঠকাইয়া লইতে চায়, সে বিষয়ে তাহার সন্দেহ রহিল না। রুকণী যদি আজ বাঁচিয়া থাকিত, তবে সে ছুরি বাহির করিয়া বসিত। সে চলিল পল্লীটার মধ্যে। বহুদিন পরে বাংলা কথা তাহার বড় ভাল লাগিতেছে। বড় মিষ্ট মনে হইতেছে। বিহার হইতে সাঁওতাল পরগণায় আসিয়া লোকের কথার মধ্যে এই ভাষায় যেন একটা দূরাগত সুর শুনিয়াছিল। বহু দূরের বাঁশীর ক্ষীণ আওয়াজের মত সাঁওতাল পরগণার ভাষার মধ্যে এই ভাষার ক্ষীণ সুর মিশিয়া আছে; আজ সেই ভাষা শুনিয়া তাহার কান যেন জুড়াইয়া গেল। ইচ্ছা হইল, সেও এই ভাষায় কথা বলে। কিন্তু সাহস হইল না।

—ঘিউ লেবে বাবু, ঘিউ! ভঁয়ষা ঘিউ!

—এই ঘি! এই! গ্রামের মোড়েই একজন দোকানদার ডাকিল।

—ভঁয়ষা ঘিউ। বহুৎ আচ্ছা। পানু হাঁড়িটা মাথা হইতে নামাইয়া দুই হাতে তাহার সম্মুখে ধরিল।

লোকটি আঙুলের ডগায় ঘি লইয়া বার কয়েক শুঁকিয়া দেখিয়া বলিল—চর্বি-টর্বি নাই তো রে?

—নেই বাবু! রামজী কসম।

—হুঁ! কসম তো মুখে লেগেই আছে তোদের! আবার একবার শুঁকিয়াও সে বোধ হয় নিঃসন্দেহ হইতে পারিল না। ডাকিল—ওগো! শুনছ! ওগো!

বাহির হইয়া আসিল সুন্দরী যুবতী একটি মেয়ে।—কি? কি বলছ?

পানুর হাত-পা সর্বাঙ্গ থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। দুই হাতে আলগোছা ধরিয়া রাখা হাঁড়িটা অকস্মাৎ তাহার হাত হইতে খসিয়া দাওয়ার উপর পড়িয়া গেল।

গৃহস্থের স্বামী-স্ত্রী দুইজনেই বলিয়া উঠিল—যা!

পানু একটা চীৎকার করিয়া উঠিল, সেই বিচিত্র চীৎকার। তারপর দুই হাতে চুলের মুঠা ধরিয়া ছুটিতে শুরু করিল। দিদি—দিদি—তাহার দিদি চারু!

এ মেয়েটি তাহার দিদি চারু। চিনিতে তাহার ভুল হয় নাই। তাহার মুখ দাড়ি-গোঁফে ভরিয়া উঠিয়াছে, চোদ্দ বছরের পানু আঠারো বছরের জোয়ান হইয়া উঠিয়াছে, চারু তাহাকে চিনিতে পারে নাই। পানু ঠিক চিনিয়াছে। চিনিয়াও কিন্তু 'দিদি' বলিয়া ডাকিতে পারিল না, ওই বিচিত্র চীৎকার করিয়া পাগলের মত ছুটিতে লাগিল। বাজারের লোক চমকিয়া উঠিল।

আট

তাহার দিদি চারু! হাঁ, সে তাহার দিদি চারুই। ভুল হয় নাই। মনের ছবির সঙ্গে মুহূর্তে মিলিয়া গেল; তাহার বুকের ভিতরের ছবি মুহূর্তে অস্পষ্টতা আবছায়া কাটাইয়া জলজলে ডগডগে হইয়া উঠিল। মুহূর্তে কত কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। ঠিক জলছবির মত। ইস্কুলের কথা মনে পড়িল। ইস্কুলে বইয়ের উপর জলছবি লাগাইত। কাগজের উপর ছবি-গুলা থাকিত ঝাপসা মত। জলে ভিজাইয়া কাগজটার ছবির দিকটা বইয়ের উপর বসাইয়া দিত। তারপর টানিয়া তুলিয়া লইত কাগজখানা। ছবিগুলা তখন বইয়ের পাতার উপর ডগডগে হইয়া ফুটিয়া উঠিত। আজও ঠিক যেন এই মুহূর্তে কাগজখানা মন হইতে উঠিয়া গেল। ঘরের—গ্রামের ছবিগুলা ঝলমল করিতেছে, টাটকা আঁকা ছবির মত। তাহার দিদি চারু। বুকের ভিতর তাহার অন্তরাত্মা মাথা কুটিতেছে, পানু চীৎকার করিতেছে। তাহার দিদি চারু।

দিদি চারু এখানে কেন? হয়তো তাহারই মত পলাইয়া আসিয়াছে। কিন্তু ও লোকটা কে? ও তো দিদির স্বামী নয়। তাহার দিদির বিবাহ হইয়াছিল গ্রামে। কৃষ্ণলালকে তো তাহার মনে পড়িতেছে। কোঁকড়া লম্বা চুল, বড় বড় ড্যাবা-ড্যাবা চোখ, মুখে বসন্তের দাগ; কুস্তি-করা মুগুর-ভাঁজা শরীর। এ তো সে নয়!

বাবা কোথায়? মা কোথায়? দাদা কোথায়? একজনের কথা লইয়া মন কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিতেছিল না। একজনের কথা মনে হইতে-না-হইতে আর একজন সম্মুখে দাঁড়াইতেছিল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে আর একজন। বাবাকে কি ফাঁসীকাঠে…? ভাবিতে গিয়া তাহার নিশ্বাস যেন বন্ধ হইয়া আসিল। দুঃসহ ক্রোধে দেহের পেশীগুলি ফুলিয়া উঠিল, দাড়ি-গোঁফ সমাচ্ছন্ন মুখখানা হইয়া উঠিল ভীষণ, ভয়াবহ। আরও জোরে সে চীৎকার করিয়া উঠিল।

চলিয়াছিল সে অপথে। ময়ূরাক্ষীর তীর ধরিয়া শনবন-কুলঝোপের পাশ দিয়া কুশাঙ্কুর-

আস্তীর্ণ বালুভূমির উপর দিয়া। কোন দিকেই লক্ষ্য ছিল না। কেন, সে তাহা জানে না। শুধু সে চীৎকার করিতেছে।

প্রায় সারাটা দিন দূর দূরান্তরে এমনি একা চীৎকার করিয়া শেষে শ্রান্ত হইয়া সে তাঁবুতে ফিরিল অপরাহ্নবেলায়। বুধন এবং তাহার স্ত্রী তাহার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল। তাহারা ইতিমধ্যেই বাজারে মিয়ের হাঁড়ি ভাঙার খবর পাইয়াছে। তাহারা ভাবিয়াছিল, এই জন্যই বোধ হয় পান্‌কু দুঃখে ভয়ে পলাইয়া গিয়াছে।

পান্নু ফিরিতেই বুধন বলিল—গেয়া তো কেয়া হুয়া? ভঁইষা তো তুহার হ্যায়। ঘিউভি তুহার। তু বনায়া। তোহারা হাঁতসে গির গিয়া—ঘিউ বরবাদ হুয়া, তো কেয়া হুয়া? যানে দো।

তাহার স্ত্রী বলিল—ইসব বিলকুল চিজ তোহারা হ্যায়। হামলোক তো বুঢ্‌ঢা হো গয়া, যব যায়েগা, সব তুহার হোগা।

পান্নুর চোখে জল আসিল। ঝরঝর করিয়া কাঁদিল। কাহার জন্য কাঁদিল সে নিজেই বুঝিতে পারিল না। বুধন এবং তাহার স্ত্রী সযত্নে তাহার চোখ মুছাইয়া দিল। ভবিষ্যতের কত গল্প শুনাইল।

পান্‌কুর যদি এই দলের মেয়েদের কাহাকেও পছন্দ না হয় তবে তাহাদেরই গোত্রীয় অন্য দল হইতে মেয়ে বাছিয়া তাহার বিবাহ দিবে। সে জন্য যদি দরকার হয় তাহারাই অন্য দলে চলিয়া যাইবে। পান্‌কুকে একটা 'হারা' অর্থাৎ সবুজ রঙের তেরপলের তাঁবু কিনিয়া দিবে। তেরপলের তাঁবুতে জল পড়ে না, তেমনি মজবুত হয়। কোন শহরে গেলে—যে শহরে থাকে সাহেব লোক, গোরা লোক, সেই শহর হইতে পান্‌কুর জন্য সংগ্রহ করিয়া দিবে একটা সফেদ রঙের আর একটা কালো রঙের ডালকুত্তার বাচ্চা। নেপালীদের সঙ্গে মুলাকাৎ হইলে খুব ভাল একটা ভোজালি কিনিয়া দিবে। বুধন বলিল, এইবার তাহার সব চেয়ে তাজা মন্তরগুলি সে পান্নুকে শিখাইবে। সে মন্তরের বহুৎ গুণ। সেই মন্তর পড়িয়া যাহাকে ইচ্ছা কুত্তার মত বশীভূত করা যায়। আর একটা মন্তর পড়িয়া বালি, খেজুর কাঁটা, সাপের দাঁত আকাশে ছাড়িয়া দিলে, সে সনসন করিয়া ছুটিয়া, যাহার নাম তুমি করিয়া দিবে তাহার বুকে গিয়া মোক্ষম আঘাত করিবে। লোকটা যেমনই বলবান হউক, হউক না কেন সে ভীমের মত, তাহাকে ঘায়েল হইতেই হইবে। কঠিন রোগে শয্যাশায়ী হইয়া শুকাইয়া শুকাইয়া মরিবে। আর একটা মন্তর আছে সেটা পড়িলে যেমনই বন্ধনে বাঁধুক না তোমাকে, খুলিয়া যাইবে। এমন কি সরকার বাহাদুরের হাতকড়িও যদি তোমার হাতে পরাইয়া দেয়, তবে সেও খুলিয়া যাইবে।

বুধনের স্ত্রী বলিল—পান্‌কু বলুক না কেন, কোন্ ছুঁড়ীকে তাহার পছন্দ, সে তাহাকেই আনিয়া তাহার পায়ে লুটাইয়া দিতেছে। পান্‌কু সাদি করিতেছে না, এ কি তাহার কম দুঃখ। পান্‌কুর সাদি হইবে, তাহার ছোট্ট বাচ্চা হইবে, 'ওঁয়া-ওঁয়া' শব্দ করিয়া কাঁদিবে, সে তাহাকে কোলে তুলিয়া দোলা দিবে—কত আদর করিবে। তাহার গলার হাঁসুলিয়া খুলিয়া সে তাহাকে পরাইয়া দিবে। পান্‌কুর বধূকে সে দিবে নাকের বেঁসর, কানের মাকড়ী। তাহার সব গহনাই একে একে দিবে। সে বুঢ্‌ঢী হইয়াছে, কি প্রয়োজন তাহার গহনায়? পান্‌কুকে সে দিবে তাহার গলার মাদুলীটা। এই মাদুলীটা তাহাকে দিয়াছিল তাহার বাপ। সেও ছিল মস্ত বড় গুণিন। সে নাকি এমন মন্তর জানিত যে, সিন্দুকের মধ্যে বন্ধ করিয়া তালা চাবি দিলেও সে তাহার ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিত। তাহার দেওয়া এই মাদুলীর বহুত গুণ। কোন

ডাইনীর দৃষ্টি তাহার ক্ষতি করিতে পারিবে না। ভূত, প্রেত, পিশাচ যাহারা হাওয়ার মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা ফিরিতেছে, তাহারা সসম্মানে পথ ছাড়িয়া দিবে।

ওদিকে গল্পের মধ্যে রাত্রি গভীর হইয়া আসিল। বৃদ্ধ-বৃদ্ধার মুখর কণ্ঠ ক্রমশ মৃদু এবং মধ্যে মধ্যে স্তব্ধ হইয়া আসিতে আসিতে একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল। তাহারা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। পানুর কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসিল না। তাহার দিদি চারু! সেই টকটকে ফরসা রঙ, সেই সুন্দর মুখ, ছোট চোখ দুইটির অদ্ভুত স্তিমিত দৃষ্টি, সেই বিড়ালের মত চোখের তাঁরা, একপিঠ চুল, সেই সব—তাহার দিদি চারু, তাহাতে তাহার কোন সন্দেহ নাই।

প্রান্তরের বুকে চারিদিকে শেয়াল ডাকিয়া উঠিল এক সঙ্গে। এই প্রথমবার নয়, এইবার তৃতীয় প্রহরের ডাক। যাহারা চুরি করিতে যায়, এই ডাক শুনিয়া তাহারা ফেরে। ইহার পর আর কেহ তাঁবুর বাহিরে থাকে না।

পানু ভাবিতেছিল—চারু! চারু! তাহার দিদি চারু!

পরদিন উঠিয়া আবার সে গেল সেই দোকানে। দোকানী তাহাকে চিনিল। সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বলিল—কাল তোর বহুৎ ঘিউ বরবাদ হয়ে গেল।

সে এক পাশে বসিয়া বলিল—হাঁ।

—কাল তোকে খুব মেরেছে তোর বাপ মা?

—নেহি।

—তবে কোথায় পালিয়ে গিয়েছিলি? দু-তিনবার খুঁজতে এল এক বুঢ্ঢা আর এক বুঢ্ঢী।

—হাঁ। অর্থহীনভাবে পানু বলিল—হাঁ।

ঠিক এক সময়েই বাহির হইয়া আসিল তাহার দিদি। হাঁ, এই তাহার দিদি। ঘাড়ে, ঠিক কানের নীচে সেই কালো জড়ুল রহিয়াছে। তাহার দিদি বলিল—কালকের সেই ছোঁড়া না?

—হ্যাঁ।

সস্নেহে তাহার দিদি বলিল—ঘিয়ের হাঁড়ি ভেঙে ছুটে পালাল কাল। আহা-হা!

লোকটি বলিল—দাও, চারটি মুড়ি দাও ওকে।

মুড়ি লইয়াও পানু বসিয়া রহিল। তাহাকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া লোকটি বলিল—কি রে? আবার বসে রইলি যে?

পানু বসিয়া আছে—ওই মেয়েটির নাম শুনিবার জন্য। কিন্তু সে প্রশ্ন সে করিতে পারিল না।

—কি? কি মতলব আছে আর? লোকটি এবার সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল।

তাহার দিদি বলিল—হ্যাঁ, ওরা আবার চোরের একশেষ।

—ভাগ বলছি, ভাগ!

পানু উঠিল। হতাশ হইয়া উঠিল। তাহার চেহারার মধ্যে বাল্যকালের চেহারার কি এতটুকু সাদৃশ্য আর নাই, যাহা দেখিয়া দিদির মনে বারেকের জন্যও মনে হয়—পানুর মত মনে হইতেছে যেন?

পথে একটা পানের দোকানে সে দাঁড়াইল। দোকানে একখানা বিবর্ণ আয়না ঝুলিতেছিল। সেই আয়নাখানার সম্মুখে দাঁড়াইয়া সে নিজেকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখিল। নিজেকে দেখিয়া সে যেন কিছুতেই চিনিতে পারিল না। গোল গোল শরীর—সুন্দর না হইলেও, একখানি কালো কচি মুখ, ক্ষারে-কাচা মোটা কাপড়, ছিটের কামিজ গায়ে ছেলেটির সঙ্গে তাহার কোন মিল নাই।

নিজেরই তাহার বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না।

সেদিনও সমস্ত রাত্রিটা তাহার জাগিয়া কাটিয়া গেল। তৃতীয় প্রহরে আজও শিয়ালগুলা ডাকিল, তখনও সে জাগিয়া রহিয়াছে। ভাবিতেছে—কেমন করিয়া জানা যায়, মেয়েটির নাম চারু কি না? কেমন করিয়া বলা যায়—দিদি, আমি পানু, তোমার ভাই পানু!

হঠাৎ বাহিরের লঘু-দ্রুত পদধ্বনি শুনিয়া সে উঠিয়া বসিল। আজ দলের লোক চুরি করিতে বাহির হইয়াছিল, তাহারাই ফিরিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার বুকখানা দ্বিগুণিত হতাশায় ভরিয়া উঠিল। আজ রাত্রে ইহারা চুরি করিয়াছে। তবে কালই এখান হইতে তাঁবু উঠিবে। ভোর হইতে না হইতেই এখান হইতে রওনা হইবে।

তাহার দিদি, তাহার দিদি চারু! তাহাকে ফেলিয়া কোথায় যাইবে সে? আর কখনও দেখা হইবে কি না সন্দেহ।

অনুমান তাহার মিথ্যা নয়, ভোর হইবার পূর্বেই হা-ঘরের দল তাঁবু উঠাইয়া রওনা হইল। পানু বার বার পিছাইয়া পড়িতেছিল। দলের লোক বিরক্ত হইল। বুধন জিজ্ঞাসা করিল—কেয়া রে বেটা? তোর তবিয়ৎ কি খারাপ মালুম হচ্ছে?

পানু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ক্লান্তভাবেই বলিল—হাঁ।

বুধন তাহাকে একটা ভঁইষার পিঠে সওয়ার করিয়া দিল। দলের অন্য লোকে হাসিল, মেয়েরা টিটকারি দিল। পানু কিন্তু উদাস বিহ্বল।

প্রায় সমস্ত দিনটা হাঁটিয়া মিলল একটি শহর। সেইখানে তাঁবু পড়িল। দিন শেষ হইয়া আসিয়াছে, হা-ঘরেদের ভিক্ষায় বা জিনিস-পত্র বেচিবার জন্য বাহির হইবার আর সময় নাই। তবু অনেকে শহরটা দেখিবার জন্য, অথবা প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র—নিমক, মরচাই, তেল কিনিতে বাহির হইল।

শহর পানু অনেক দেখিয়াছে। তবু মনিহারীর দোকান, বড় বড় বাড়ি বাগান দেখিতে ভাল লাগে। আজ কিন্তু তাহার সে সব ভাল লাগিল না। একটা চৌমাথার উপর তাহাদের দল দাঁড়াইয়া ছিল। চৌমাথাটার চারিদিকে দোকান—এইখানেই প্রয়োজনীয় সব জিনিস মিলিবে। দুই-চারিজন করিয়া দলে দলে বিভক্ত হইয়া তাহারা এ-দোকানে ও-দোকানে সওদা করিতে আরম্ভ করিল।

সামান্য কয়েকটা জিনিস কিনিয়া পানু রাস্তায় নামিয়া দাঁড়াইল। সামনেই একটা টিনের চালা, বাঁধানো মেঝে; সেই মেঝের উপর বসিয়া নৌয়া অর্থাৎ নাপিত এই অপরাহ্নবেলাতেও লোকের দাড়ি চাঁচিয়া দিতেছে। হঠাৎ তাহার চোখের উপর একটা লোকের চেহারা অন্য রকম হইয়া গেল। লোকটা বেশ বড় একজোড়া গোঁফ লইয়া বসিয়া ছিল। নৌয়া'টা হাতের অস্ত্র দিয়া নিঃশেষে তাহার গোঁফগুলা চাঁচিয়া ফেলিয়া দিল। মনে হইল, সে লোকই এ নয়। এ আর কেউ। এ যেন যাদু!

তাহার বুকের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিল। ফিরিবার পথে বার বার সে আপন দাড়ি-গোঁফে হাত বুলাইল। তখন এগুলা ছিল না। এগুলা চলিয়া গেলে—এ চেহারা তাহার যাদুর মত পাল্টাইয়া যাইবে।

তাঁবুতে ফিরিয়া জিনিস-পত্রগুলি দিয়াই সে আবার বাহির হইয়া পড়িল—সকলের অলক্ষ্যে। একবার কোমরে হাত দিয়া দেখিল, তাহার গেঁজলেতে কঠিন গোলাকার বস্তুগুলি ঠিক আছে। সে দ্রুতপদে আসিয়া শহরের মধ্যে ঢুকিল। কয়েকবার রাস্তা ভুল করিয়া অনেকটা

ঘুরিয়া সে সেই টিনের চালাটা বাহির করিল। নৌয়াটা তখনও বসিয়া আছে। সে গেঁজলে হইতে বাহির করিল একটা গোল কঠিন বস্তু। সেটা আধুলি। আধুলিটা সে নাপিতটার সামনে রাখিয়া বলিল—হাঁ, দেও। বলিয়া সে দাড়ি-গোঁফে হাত বুলাইয়া মাথার লম্বা বাবরী চুল দেখাইয়া দিল।

নাপিতটা প্রথমটা অবাক হইয়া গিয়াছিল। কুৎসিতদর্শন, সর্বাঙ্গে দুর্গন্ধ, গলায় লাল পলার মালা—দেখিবামাত্র হাঘরে বলিয়া চেনা যায়, সে চুল কাটিবে, দাঁড়ি-গোঁফ কামাইবে? কিন্তু আধুলিটা দেখিয়া সে তাহার মনের বিস্ময় মনে চাপিয়া গেল। ভাবিল, তরুণ যাযাবর ছোকরাটির সাধ হইয়াছে শহরের বাবুদের দেখিয়া। সে হাসিয়া বলিল—একদম বাবু বনা দেগা। তারপর সে কাঁচি চালাইয়া দিল তাহার চুলে। তাহার কামানো যখন শেষ হইল তখন আর বেশী বেলা নাই। নাপিতটা তাহার সম্মুখে ধরিল একখানা আয়না। আপনার প্রতিবিম্ব দেখিয়া পানু অবাক হইয়া গেল। হা-ঘরে হারাইয়া গিয়াছে! এ কে? এ কে?

সেই ছোট কালো, কচি মুখের সঙ্গে এ মুখের অনেকটা মিল যেন খুঁজিয়া পাওয়া যায়! হাঁ, পাওয়া যায়। কিন্তু বেলা শেষ হইয়া আসিয়াছে, তাহাকে না পাইলে বুধন উৎকণ্ঠিত হইয়া খুঁজিতে বাহির হইবে, বুধনের স্ত্রী বাহির হইবে। সে আর দাঁড়াইল না। শহর হইতে বাহির হইয়া যে পথ ধরিয়া তাহারা আসিয়াছিল, সেই পথেই ফিরিল। চারু—তাহার দিদি চারু!

চারু—তাহার দিদি চারুর বাড়ির মুখে চলিল। প্রথম খানিকটা সে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিল। যখন সে চারুর বাড়ির সম্মুখে উপস্থিত হইল, তখনও রাত্রি আছে। সে দাওয়াটার উপরেই শুইয়া পড়িল।

তাহার ঘুম ভাঙিল চারুর কণ্ঠস্বরে—কে? কে? এ কে শুয়ে আছে?

পানু উঠিয়া বসিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বহুদিন-না-বলা—তাহার কাছে বড় মিঠা-লাগা বাংলায় টানিয়া টানিয়া বলিল—দিদি! হামি পানু।

নয়

—দিদি! হামি পানু।

স্থির দৃষ্টিতে চারু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

—চিনতে পারছিস না? শঙ্কাতুর করুণ দৃষ্টি মেলিয়া চারুর মুখের দিকে চাহিল।—হামি পানু, তোহার সেই ছোট ভাই?

চারু এবার খানিকটা ঝুঁকিয়া তাহাকে দেখিতে আরম্ভ করিল।

পানুর মনে পড়িয়া গেল জমাদারের বেতের দাগের কথা। তৎক্ষণাৎ সে পিঠ বাঁকাইয়া দেখাইয়া বলিল—এই দেখ, পিঠে সেই জমাদার মারিয়েছিল, বেত চালাইয়েছিল। দেখ, দাগ দেখ! বুচ্‌চা নাকু দত্তকে গলা কাটিয়ে দিল। থানামে বাবাকে ধরিয়ে নিয়ে গেল, মায়ীকে নিয়ে গেল, তুকে নিয়ে গেল, হামাকে নিয়ে গেল। বাবাকে বাঁধলে জমাদার, বেত চালাইলে। তুকে মারলে দারোগাবাবু। হামি জমাদারকে মারলাম—

চারু এবার ঝুঁকিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল কিছুক্ষণ। তারপর বলিল—পানু! হ্যাঁ, তুই পানু। পানুই তো বটে আমার। কোথায় ছিলি ভাই? কোথা থেকে এলি? পানুই তো বটে আমার। ঝরঝর করিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল।

পান্নুরও কান্না পাইতেছিল, কিন্তু কান্নার চেয়েও প্রবলতর আবেগে একটা গভীর উৎকণ্ঠায় তাহার বুকটা কেমন করিতেছিল; সে বলিল—দিদি, বাবা? হামাদের বাবা? পুলিস—পুলিস—পুলিস বাবাকে ঝুলাইয়ে দিলে ফাঁসিকাঠে? বাবার ফাঁসি হইয়ে গেল? দিদি?

চারু কাঁদিতে কাঁদিতেই বলিল—না। বাবা বেঁচে আছে ভাই, মা আমাদের চলে গিয়েছে। মা নাই।

—মা নাই? মা মরিয়ে গেল? পুলিস মাকে ফাঁসি দিলে?

—ছি। বার বার পুলিস, ফাঁসি বলছিস কেন? মায়ের ফাঁসি হবে কেন—কিসের জন্যে! মায়ের অসুখ করেছিল। তোর জন্যে মায়ের সে কত দুঃখ! তুই এতদিন কোথায় ছিলি ভাই?

পান্নু বলিল—পুলিসকে ডরকে মারে দিদি, জঙ্গলমে, পাহাড়মে, এক মুল্লুকসে আওর এক

পান্নু বলিল আপনার কথা।

চারু বলিল বাপের কথা, মায়ের কথা, বড় ভাইয়ের কথা। পান্নু স্থির হইয়া বসিয়া শুনিল।

চারু সর্বাগ্রে বলিল—নাকু দত্তের খুনী ধরা পড়ে নাই। কে যে খুন করিয়াছে, সে তথ্য পুলিস দেশ তোলপাড় করিয়া তদন্ত করিয়াও আবিষ্কার করিতে পারে নাই। পান্নু যে সদরে গিয়া পুলিস সাহেবের কাছে নালিশ জানাইয়াছিল, তাহার ফলে সে কি কাণ্ড! বাপকে তাহার চালান দিল, ইন্সপেক্টার আসিল, গোয়েন্দা পুলিস আসিল। দিনের পর দিন ডাক পড়িত তাহাদের। বিশেষ করিয়া চারুর।

সে সব কথা পান্নুকে বলিতে গিয়া সে বার বার শিহরিয়া উঠিল। তবে জমাদারের সাজা হইয়াছিল। জমাদার হইতে তাহাকে কনস্টেবল করিয়া অন্য থানায় বদলির হুকুম হইয়াছিল সরকারের। ওদিকে দিন-কতক সমস্ত গ্রামখানায় মানুষের আহার নিদ্রা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। বড় বড় বাবুদের বাড়ি পর্যন্ত খানাতল্লাশ হইয়া গেল। বাবুদের দুইজন ছেলেকেও চালান দিল পুলিস। গণ্ডার হাড়ি, মুরশিদাবাদের দর্জি, মাধব ময়রাও চালান গেল। তারপর একদা সকলকেই পুলিস ছাড়িয়া দিল। বলিল—প্রমাণ ঠিক পাওয়া গেল না। কিন্তু ততদিনে চারুর বাপের যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে। ব্যবসা গিয়াছে, সঞ্চিত অর্থ গিয়াছে, চারুর ইজ্জৎ গিয়াছে, পান্নু নিরুদ্দেশ। চারুর বাপ বলিল—এর চেয়ে ফাঁসি হল না কেন আমার? হে ভগবান্!

—ভগবান! ভগবান নাই সে আমি হাজার বার বলব। চারু বলিল।—নইলে এমনি হয়? যদি হয়, তবে যারা করে তারা ধনে-পুত্রে মানে-সম্মানে বাড়ে দিন দিন!

—নাই। ভগবান নাই। আবার একটু ভাবিয়া বলিল—যদি থাকে তবে কানাও বটে, কালাও বটে। আমার বাবার কি দোষে এ শাস্তি তা বলুক!

—ঘটি বাটি জমি জেরাত যা ছিল, পরানের ডাহাতে তা বেচে উকীল মোক্তারকে ঢেলে দিতে হল সব। ওদিকে আমার শ্বশুররা বলল—ও বউ আর নোব না। গাঁয়ের লোক, তাদের কাছে গোপন তো কিছু ছিল না। জেনে শুনেই বা তারা আমাকে নেয় কি করে? সোয়ামী আমার মনের দুঃখে পাগল হয়ে গেল। পান্নু, সে এখন গায়ে ধুলো-কাদা মেখে বেড়ায়। সে আমাকে ভালবাসত। সত্যিই ভালবাসত।

পান্নু সেদিন কথাটার মর্ম বুঝিতে পারে নাই। অবাক হইয়া দিদির মুখের দিকে চাহিয়া ছিল।

চারু বলিল—জ্ঞাতিরা সব পতিত করলে বাবাকে। বললে—ও কন্তে তোমার ঘরে থাকলে তোমার সঙ্গে আমরা চলব না। তুমি পতিত। বাবা চুপ করে থাকল। কোনও জবাব দিল না। তারপর—। চারু একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিল।

ইহার পরের স্মৃতি বড় মর্মান্তিক।

নিঃস্ব-রিক্ত সর্বস্বান্ত আত্মীয়-স্বজন-জ্ঞাতি গ্রামবাসীদের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত পানুর বাপের বাড়ির চারিদিকে ক্ষুধার্ত লোলুপ নেকড়ের দৃষ্টির মত মানুষের দৃষ্টি ফিরিতে লাগিল। হরিণীর মত চারু আতঙ্কিত হইয়া উঠিল।

রামমুণি বেণেনী, এককালে তরঙ্গময়ী স্বৈরিণী ছিল, বৃদ্ধ বয়সে সে গ্রামের রতনবাবুর দৌত্য বহন করিয়া লইয়া আসিল চারুর মায়ের কাছে।—রতনবাবু বলেছে, পঁচিশ টাকা দেবে। পাঠিয়ে দে চারুকে।

চারুর মা শিহরিয়া উঠিয়া বলিল—কি বলছ ঠাকুরঝি? তুমি না চারুর পিসী?

—তাতেই তো বউ। মেয়েটার ভালর জন্তেই বলছি। নইলে আমার আর কি বল?

চারুর মা বলিল—না না না। হতভাগীর কপালে যা ছিল ঘটেছে। কিন্তু আমি মা হয়ে পেটের ভাতের জন্তে সে পারব না। তুমি ওসব কথা বলো না।

রামমুণি চারুর মায়ের মুখের দিকে চাহিল সাপের মত স্থির দৃষ্টিতে। তারপর বলিল—তা হলে সত্যি বল?

—কি?

—নাকু দত্তের টাকা তোরাই পেয়েছিস?

—কি বলছ দিদি?

—লোকে বলে, বিশ্বাস করি নাই। এইবার বুঝলাম। রামমুণি হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। শিহরিয়া উঠিল চারুর মা। রামমুণি যাহা বলিয়া গেল সে কথা প্রচার করিবে না তো? আবার পুলিস হাঙ্গামা হইবে না তো?

তারপর আসিল কৃষ্ণচন্দ্র স্বর্ণকার। স্বর্ণকার গহনা গড়ে; তাহার কারবার মেয়েদের সঙ্গে, —কেহ মাসি, কেহ পিসি, কেহ দিদি, কেহ বউদিদি, কেহ খুড়ী। চারুর মাকে কৃষ্ণচন্দ্র বলিত খুড়ী। তাহাদের ঘরে সোনার গহনার রেওয়াজ নাই; গহনা তাহাদের সবই রূপার। সোনার গহনার মধ্যে নাকছাবি, কানের টাপ্। তাহাদের মধ্যে যাহাদের অবস্থা ভাল, তাহাদের গলায় সরু বিছাহার, হাতে শাখাবাঁধা দেখা যায়। বড়লোক যাহারা, তাহারা গলায় মোটা দড়িহার পরে। কৃষ্ণচন্দ্র নীল কাগজের একটি মোড়ক হাতে আসিয়া ঘরে ঢুকিল।—খুড়ী, খুড়ী কোথায় গো?

চারুর মা শঙ্কিত হইয়া উঠিল। তাহাদের বাড়ির রূপার গহনাগুলি সে কৃষ্ণচন্দ্রের হাত দিয়াই বিক্রয় করিয়াছে। সে লইয়া কোন গণ্ডগোল বাধিল নাকি?

কেষ্ট আসিয়া হাসিয়া বলিল—ভাল আছ খুড়ী?

শঙ্কিত ভাবে ঘাড় নাড়িয়া চারুর মা জানাইল—হাঁ, ভাল আছি।

হাতের নীল কাগজের মোড়কটি খুলিয়া কেষ্ট বলিল—দেখ দেখি খুড়ী জিনিসটা কেমন হল?

গিনি সোনার বিছাহার একগাছি। আগুনের মত দীপ্তি এবং বর্ণ।

চারুর মা মুগ্ধ হইয়া গেল। অক্ষম অন্তরের কামনা লোভ হইয়া জাগিয়া উঠিল দুইটি চোখের দৃষ্টিতে। সে কাঙালের মত বলিল—বড় সুন্দর হয়েছে বাবা, বড় সুন্দর হয়েছে। তুমি গড়লে বাবা?

--গড়েছি আমিই। হাসিল কৃষ্ণচন্দ্র।

চারুর মা হার ছড়াটা কৃষ্ণচন্দ্রের হাতে ফিরাইয়া দিতে উদ্যত হইল।

কেষ্ট খানিকটা সরিয়া গিয়া বলিল—না। তারপর একটু মৃদুস্বরে বলিল—দাও, চারুর গলায় পরিয়ে দাও, দেখি কেমন মানায়!

—না বাবা। পরের জিনিস, বড়লোকের সামিগগিরি, আমাদের গলায় তো উঠবার নয়। নাও।

—দাও না তুমি চারুর গলায় পরিয়ে। আমি বলছি। তারপর ফিসফিস করিয়া বলিল—যতীনবাবু দিয়েছে চারুকে।

যতীনবাবু ধনীর ছেলে, শৌখীন তরুণ, রাস্তা দিয়া সে যখন যায়—তখন আশপাশ ভরিয়া উঠে মিষ্ট পুষ্পসারের গন্ধে, আকাশের রৌদ্রের ছটা তাহার গায়ের সিল্কের পাঞ্জাবিতে প্রতিফলিত হইয়া ঝলমল করে। পল্লীর মানুষগুলি, চিরজীবন যাহাদের একমাত্র কামনা মোটা ভাত আর মোটা কাপড়, সেই সব মানুষ অবাক বিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিয়া থাকে। যতীনবাবু লক্ষপতি ধনীর সন্তান। জুড়িগাড়ী হাঁকাইয়া যায়। যতীনবাবু এখানে ইন্দ্ররাজার পুত্র জয়ন্ত।

চারুর মা তবুও বলিল—না।

কেষ্ট অনেক অনুনয় করিল। চারুর মা তবুও সম্মত হইল না। ঘরের মধ্য হইতে চারু সব শুনিয়াছিল। তাহার বুকের ভিতরটা তোলপাড় করিয়া উঠিল। যতীনবাবু! রাজাবাবু! সোনার হার! যে বস্তুটাকে অমূল্য দুর্লভ বলিয়া যতীনবাবুর দিকে চাহিয়া সঙ্গে সঙ্গেই সে চিরদিন চোখ ফিরাইয়া লইয়াছে, সে বস্তু ওই দারোগা আর জমাদার ধূলায় লুটাইয়া দিয়াছে। শাস্তি তাহাদের হইয়াছে। পুলিস সাহেব তাহাদের চাকরিতে নামাইয়া দিয়াছেন, অনেক কটু কথাও নাকি বলিয়াছেন; কিন্তু তাহার তাহাতে কি? যাহা ধূলায় মিশাইয়া যায় মাটি খুঁড়িলে তাহা কি ফিরিয়া পাওয়া যায়? পাড়ার মেয়েরা তাহাকে দেখিয়া হাসে। তাহার শ্বশুর তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, স্বামী পাগল হইয়া গিয়াছে। বাপ সর্বস্বান্ত। ঘরের মধ্যে সে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। পানু নিরুদ্দেশ। গন্ধবেণের ছেলে হইয়া তাহার বড় ভাই পেটের জ্বালায় গ্রামেই লইয়াছে চাকরের কাজ। ময়লা কাপড় কাচে, ঘর ঝাঁট দেয়, বাবুদের জুতা পরিষ্কার করে। কিসের জন্য, কেন সে কেষ্টদাদার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিবে? রাজাবাবু—যতীনবাবু! আগুনের মত রঙের গিনি সোনার হার! সে খিড়কীর পথে ছুটিয়া আসিয়া একটা গলির মুখে দাঁড়াইয়া ডাকিল—কেষ্টদাদা!

কেষ্ট ফিরিয়া তাহাকে দেখিয়া হাসিল।

চারু হাত পাতিয়া বলিল—দাও। দিয়ে যাও।

কেষ্ট গলিপথে আসিয়া হার ছড়াটি হাতে দিয়া হাসিয়া বলিল—আমার ইচ্ছে ছিল নিজের হাতে তোর গলায় পরিয়ে দি। তা—। গলির এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিয়া কেষ্ট বলিল—তা, কে কে কোথায় দেখবে! থাক, আমার মনের সাধ মনেই থাক।

চারুর অন্তরে তখন একটা জোর আসিয়াছে। যতীনবাবু, রাজাবাবু! যাহার গায়ের সৌরভে আশপাশ ভরিয়া যায়, সে গন্ধ যাহার বুকের মধ্যে প্রবেশ করে তাহার বুকটা তোলপাড় করিয়া উঠে। আগুনের বর্ণ সোনার হার দিয়াছে সে! তাহার মনে হইল, অন্ধকার অমাবস্যার রাত্রির পর্দাটা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া সে হঠাৎ পূর্ণ চাঁদের রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে। চাঁদের রাজ্যে থাকে কলঙ্ক, তাহার জীবনের চারিদিক স্নিগ্ধ নীলাভ জ্যোৎস্নায় ভরিয়া উঠিয়াছে। কেষ্টচন্দ্রের কথার উত্তরে চারু লীলাভরে হাসিয়া মুখ বাঁকাইয়া বলিল—মরণ। তারপর বলিল—তা তোমার

সাধই বা বাকি থাকবে কেন? দাও, পরিয়ে দাও।

তারপর চারুর জীবনে সে এক বিচিত্র অধ্যায়!

রাজপুত্রের সঙ্গে আসিল মন্ত্রীপুত্র, সেনাপতিপুত্র, কোটালপুত্র, সওদাগরপুত্র, আরও কত জন। কৃষ্ণচন্দ্র স্বর্ণকারও আসিল।

চারুর মা কেমন হইয়া গেল—বোকা, নির্বোধ। কন্যার কীর্তিকলাপ চোখে দেখিয়াও একটা কথা বলিতে পারিল না। কন্যার উপার্জন দেখিয়া সে ফ্যালফ্যাল করিয়া শুধু চাহিয়া রহিল। ধনী সহৃদয় আগন্তুককেও কোনদিন বলিতে মনে হইল না—আমার কাপড় ছিঁড়েছে বাবা, একখানা নতুন কাপড়—

চারুর অনুপস্থিতিতে কোন দূতী বা দূত আসিয়া তাহার হাতে টাকা দিয়া গেলে সে 'না' বলিতেও পারিত না, আবার কয়টা টাকা গণিয়াও লইত না। মেকী কি আসল সে দেখিয়া লইতেও তাহার বুদ্ধি হইত না। প্রবৃত্তিই যেন মরিয়া গিয়াছিল। কেবলমাত্র কোন জনের নিকট হইতে আহার্য উপঢৌকন আসিলে সে খানিকটা সজীব হইয়া উঠিত। চারুকে না জানাইয়া খানিকটা অংশ সে তুলিয়া লইত। অন্ধকার ঘরে বসিয়া অথবা নির্জন পুকুরঘাটে সেগুলা গবগব করিয়া পরম তৃপ্তির সঙ্গে খাইয়া যাইত।

চারুর বাপ কিন্তু ধীরে ধীরে ধাক্কাটা কাটাইয়া উঠিল। সে ঘর হইতে বাহির হইল। অত্যন্ত ধার্মিকের বেশে বাহির হইল। ফোঁটা তিলক কাটিল, গলায় একটা ঝুলি ঝুলাইল; কন্যার উপার্জনে আহার্যের উপাদেয়তায় এবং প্রাচুর্যে—সংসারের স্বাচ্ছল্যের নিশ্চিন্ততায় চিক্কণ দেহে নির্বিকার চিত্তে লোকসমাজে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল। মুখে অবিরাম ধ্বনি—হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!

কাহারও সঙ্গে দেখা হইলে, কুশল জিজ্ঞাসা করিলেই সে হাসিয়া বলিত—হরিবোল! অনিত্য সংসার। এ সংসারে কেউ কারু নয়। আমিও আমার নই। ভাল—সব ভাল। হরিবোল!

তারপর সহসা চারুর জীবনে আসিয়াছিল আবার এক নূতন অধ্যায়। আবার একটা বিপর্যয়।

আয়নায় একদা আপনার প্রতিবিম্ব দেখিয়া চারু নিজেই শিহরিয়া উঠিয়াছিল। তাহার রূপ যেন শতগুণে বাড়িয়া গিয়াছে। কূলে কূলে জলে-ভরা দীঘি জল-ভরা পদ্মবনের শোভায় যেন ঝলমল করিতেছে। তাহার দেহে রূপ যেন আর ধরে না। বুকের ভিতরটা তাহার তোলপাড় করিয়া উঠিয়াছিল। এ কি হইল তাহার?

চারু বলিল—সে কি দিন ভাই! সে কি বলব! মা তো হাবা হয়েই গিয়েছিল, বাবার মুখে শুধু—হরিবোল। আমার মাথায় ভেঙে পড়ল বাজ। কি করব? কোলে কে আসবে তাকে নিয়ে কি করে পথে বের হব? মনে হল, বিষ খাই, গলায় দড়ি দি। তাও পারলাম না। রামমুণিকে বললাম, কেষ্টদাদাকে বললাম—তারা বললে, ভয় কি? কাঁটা তুলে দোব। কেউ জানবে না। আমি তাও পারলাম না। আমার কোল-আলো-করা ধন, সাতরাজার ধন মানিক—

আজও চারু ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

পানু অবাক হইয়া শুনিতেছিল। সমস্ত কথা সম্পূর্ণরূপে সেদিন সে বুঝিতে পারে নাই। সে অবাক হইয়া গিয়াছিল।

চোখ মুছিয়া চারু বলিল—সেই দিন এল এই মানুষটি। বললে—ভয় কি ; আমি তোমাকে মাথায় করে রাখব। বিদেশী মানুষ। এসেছিল চাকরি করতে ওই রাজাবাবুদের বাড়ি। রাজা-বাবুর খাস খানসামা ছিল সে। আমি যেতাম, আসতাম। আমাকে নিয়ে যেতে আসত, আবার বাড়ি পৌঁছে দিয়ে যেত। যেত-আসত চাকরের মত, কোন দিন একটা হাসি-তামাশা পর্যন্ত করে নাই। সেদিন আমি মাটিতে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদছি। এসেছিল আমাকে ডাকতে, আমার কান্না দেখে বললে—তুমি কেঁদো না।

আজও সে লোকটি দোকানের তক্তপোশে বসিয়া তামাক টানিতেছিল, সে হাসিয়া বলিল—ওসব কথা এখন থাক না কেন। পরে বলবার ঢের সময় পাবে। এখন হারানো ভাইকে পেলে—চান করাও ভাল করে। একখানা সুগন্ধি সাবান ঘষো গায়ে। খেতে দাও।

চারু তাহার কথা গ্রাহ্য করিল না। সে বলিয়াই গেল। সেদিনের স্মৃতি তাহার জীবনের অক্ষয় সম্পদ।

পাড়া-প্রতিবেশী, গ্রামের মানুষ তাহাকে পাপ বলিয়া প্রকাশ্যে ঘোষণা করিয়াছে, ঘৃণা করিয়াছে, বর্জনের অভিনয় করিয়াছে, গোপনে আবার তাহাকেই লইয়া বিলাস করিয়াছে। যেদিন তাহাদের পাপ সুদ্ধ চারুর ঘাড়ে চাপিল, পাপের বোঝার ভারে চারু যেদিন ডুবিতে বসিল, সেদিন সমস্ত জানিয়া শুনিয়া এই লোকটি বলিল—তুমি কেঁদো না।

চারু বলিয়াছিল—যাও যাও, বিরক্ত করো না তুমি। আমি যাব না, তোমার বাবুকে বলগে তুমি।

তবু লোকটি যায় নাই। বলিয়াছিল—তুমি কেঁদো না। তুমি যদি রাজী হও, আমি তোমাকে মাথায় করে রাখব।

চারু অবাক হইয়া গিয়াছিল।

লোকটি বলিয়াছিল—তুমি যদি রাজী থাক, তবে বোষ্টম হয়ে মালা-চন্দন করে তোমাকে আমি বিয়ে করব। দেশান্তরে চলে যাব। বলব—আমারই ছেলে।

গলায় কলসী বাঁধিয়া যাহাকে দশজনে জলে ডুবাইয়া দিল, সেই গলার ভরা-কলসী সমেত তাহাকে এই লোকটি মুহূর্তে মাথায় করিয়া জল হইতে উদ্ধার করিল। তাহাকে বুক ভরিয়া দিল মুক্ত বাতাস, মুক্ত আকাশের তলায় রৌদ্রের আলোকচ্ছটার জ্যোতি, তাহার উত্তাপের সঞ্জীবনী স্পর্শ, দিল ঘাসে ভরা পৃথিবীর এই নরম বুকে মাথা তুলিয়া চলিবার অধিকার। সে কথা কি না-বলিয়া থাকা যায় ?

চারু বলিয়াই চলিল।

দশ

—গাঁয়ে সে কি হৈ-হৈ কাণ্ড ভাই! সে কি মজলিস! সে কি ছি-ছি! লোকে আমাদের দোরের সামনে দিয়ে যেত, চীৎকার করে বলে যেত—'যাকে দশে করে ছি, তার জীবনে কাজ কি ?' দারোগাবাবু—

পানু চমকিয়া বলিল—সেই দারোগা ?

—না। এ নতুন দারোগা। বাবাকে ডেকে শাসালে, যেন কোন বে-আইনী কাজ না হয়। থানার সামনেই বাড়ি, পুলিস চিলের মত চোখ রেখে বসে রইল।

—কাহে ? কেনে ? পানু সভয়ে প্রশ্ন করিল।

চারুর সেই লোকটি হাসিল ; চারুও একটু হাসিল। তারপর সে বলিয়া গেল, অকুণ্ঠিতভাবে হাত নাড়িয়া তাহাকে বুঝাইয়া দিল। এ চারু সে চারু নয়। সঙ্কুচিতা, ভয়ত্রস্তা হরিণীর মত মেয়েটি নয় ; এ এক অসঙ্কুচিতা মুখরা বাঘিনীর মত মেয়ে, অসঙ্কোচে সমস্ত কথা ব্যক্ত করিল —তাহার সহোদরের সম্মুখে সপ্রতিভ ভাবেই ব্যক্ত করিল। কথাটা পানুকে শুনাইতেই তার বাকী ছিল, নতুবা ও-কথা সে তাহার এই বাঘিনীত্ব প্রাপ্তির দিন হইতেই সংসারকে এমনি ভাবে ঘোষণা করিয়া শুনাইয়া আসিয়াছে। সে পানুকে বুঝাইয়া দিল—সমাজে স্বামীহীনা, স্বামী-পরিত্যক্তার সন্তানবতী হওয়ার মত পাপ বা অপরাধ আর হয় না। সেই পাপ গোপনের জন্য, হতভাগিনীদের গর্ভে আবির্ভূত হয় যে সব সাত রাজার ধন মানিক, তাহাদের হয় পরিত্যাগ করিতে হয় ; নয় বিষ-প্রয়োগে ভ্রূণ অবস্থাতেই তাহাদের হত্যা করিয়া জননীর বত্রিশ নাড়ীর বন্ধন ছিঁড়িয়া বাহিরে আনিয়া আবর্জনার স্তূপে কিংবা নদীর জলে ফেলিয়া দেয়, নয়তো ফেলে মাটির তলায়। ভ্রূণহত্যা রাজার আইনে অন্যায়। সাজা হয়।

চারু হাসিল। বলিল—বাবা হয়েছিল ধর্মের ঢেঁকি—কপালে তেলক, নাকে রসকলি, গলায় কণ্ঠি, মুখে হরি—হরি ; 'হরি হরি' বলতে বলতেই ফিরে এল বাড়ি। এসে চুপ করে বসল। আগে বিড়বিড় করে বলত—হরি হরি। এবার চেঁচাতে লাগল। মা কাঁদতে লাগল। আমি আর থাকতে পারলাম না। নেমে চলে গেলাম থানায়।

চারু থানায় গিয়া প্রথম এই মূর্তিতে দাঁড়াইয়াছিল। বলিয়াছিল—বাবাকে ডেকেছিলেন কেন ? দারোগা তাহাকে ধমক দিয়া পাপটার গুরুত্ব বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু চারু তাহাকে বাধা দিয়া উচ্চকণ্ঠে সেই থানায় দাঁড়াইয়া বলিয়াছিল—হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ। আমার কোঁকে আমার সাগর-ছেঁচা ধন, আকাশের চাঁদ, আমার জল-পিণ্ডির আধার। হ্যাঁ, আমার সন্তান হবে। আমার কোল হবে, জীবন সার্থক হবে। তাকে কেন আমি মারব ? কিসের জন্য সে পাপ করব ? তুমি নিশ্চিন্দি হয়ে ঘুমোও।

দারোগা ভড়কাইয়া গিয়াছিল।

একটা কনস্টেবল শুধু বলিয়াছিল—এই মাগী, থাম ! সরম লাগছে না তোর ?

—না না না। চারু বলিয়াছিল—সরম ? সে হাসিয়া উঠিয়াছিল।—না, সরম আমার নাই। এ তুই বুঝবি না—দারোগার চাকর তুই—দারোগার সঙ্গে আমার কথা হচ্ছে, তার মধ্যে কথা বলতে তোর সরম হচ্ছে না ? সে দারোগা যখন ছিল, তখন যখন তুই আমাকে ডাকতে যেতিস তোর সরম লাগত না ?

কনস্টেবলটা পলাইয়া গিয়াছিল।

চারু হাসিয়াছিল। তারপর দারোগাকে বলিয়াছিল—শোন দারোগাবাবু, তুমি অবিশ্যি সে-হিসেবে ভাল লোক। তোমাকে সে দোষ দিতে আমি পারব না। কিন্তু শোন, তুমি আর আমার বাবাকে ডেকে এমন করে শাসিয়ো না। ভয় নাই, আমার কোল-আলো করা চাঁদ নিয়ে তোমাকে দেখিয়ে যাব। প্রণাম করে যাব।

—বাড়িতে ফিরলাম ভাই। বলিয়াই চারু স্তব্ধ হইয়া গেল। সে যেন মনশ্চক্ষে কি দেখিতেছিল। সে ছবি তাহার ভুলিবার নয়। জীবনে, সময় মানে না—অসময় মানে না, এই ছবিটা তাহার চোখের সম্মুখে অকস্মাৎ আসিয়া দাঁড়ায়। কাজ করিতে করিতে হাত থামিয়া যায়, খাইতে খাইতে মুখ বন্ধ হয় ; রাত্রে স্বপ্নের মধ্যে ভাসিয়া উঠে, ঘুম ভাঙিয়া যায়। বাড়িতে ফিরিয়া চারু দেখিয়াছিল, মা উঠানের উপর পড়িয়া আছে অসাড় নিস্পন্দ, কাদায় সর্বাঙ্গ মাখা,

স্থির বিস্ফারিত দৃষ্টি—শুধু মধ্যে মধ্যে ঠোঁটের দুইটা পাশ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে।

তাহার বাবা দাওয়ায় বসিয়া চীৎকার করিতেছে—হরি হরি হরি! হরিবোল! হরি! হরিবোল! হরি!

চারুর মা গিয়াছিল স্নানের ঘাটে।

সেখানে প্রতিবেশিনীরা তাহাকে প্রশ্নে, বিদ্রূপে, তিরস্কারে জর্জরিত করিয়া তুলিয়াছিল। বুদ্ধিভ্রংশা নির্বোধ চারুর মা প্রথমটা ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া ছিল। তারপর অকস্মাৎ এক সময় যখন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ গভীর ভাবে তাহার মর্ম বিদ্ধ করিয়া তুলিল—মর্মস্থলবিদ্ধ পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর মতই তখন সে সচেতন হইয়া উঠিয়া সভয়ে পলাইয়া আসিয়াছিল। বাড়িতে ঢুকিয়া উঠানের উপর সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল। বাড়ির ঠিক সম্মুখেই রাস্তার ওপারেই থানা, থানার প্রাঙ্গণ হইতে ভাসিয়া আসিতেছে চারুর উচ্চ তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর।

—আমার কোঁকে আছে আমার সাগর-ছেঁচা ধন, আকাশের চাঁদ, জল-পিণ্ডির আধার।

চারুর মা বিবর্ণ মুখে দাঁড়াইয়া থরথর করিয়া কাঁপিতে আরম্ভ করিল।

চারুর বাপ তারস্বরে হরিনাম করিতেছিল। সে চাপা গলায় বলিল—দারোগাবাবু আমাকে বললে, চারুর কাঁটা খসাবার যদি চেষ্টা করিস তবে গুষ্টিসুদ্ধ চালান দেব। বললে—বলিস তোর পরিবারকে, বেটিকে।

চারুর মার কোমর হইতে জলের ঘড়াটা হঠাৎ খসিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সেও পড়িয়া গেল মাটির পুতুলের মত।

চারুর চোখ দিয়া আবার জল গড়াইয়া পড়িল। সে আক্ষেপ করিয়া বলিল—আঃ! সে কি যাতনা মায়ের! হাত পা ছোঁড়ে নাই, মুখে আঃ-উঃ করে নাই, তবু সে কি যাতনা চোখের দৃষ্টিতে চাউনিতে দেখেছি আমি! সে চাউনি মনে হয়, এখনও বুঝি মা চেয়ে রয়েছে। দুদিন বেঁচে ছিল, আমি মাথার শিয়র থেকে নড়ি নাই।

পানুর চোখ দিয়াও জল গড়াইয়া পড়িল। মায়ের ছবি আজ তাহার মনে স্পষ্ট। মায়ের প্রতি অঙ্গটি মনে পড়িতেছে, প্রতি ভঙ্গিটি মনে পড়িতেছে; কত কথা মনে পড়িতেছে। তাহার মা মরিয়া গিয়াছে!

মৃত্যু সে দেখিয়াছে দুইটা।

একটা নাকু দত্তের ছিন্নকণ্ঠ দেহ। অন্যটা দড়ি গলায় বাঁধিয়া ঝুলানো রুকণী। তাহার মায়ের চেহারাও কি এমনি হইয়াছিল? উঃ, সে কি ভয়ঙ্কর!

চারুই সান্ত্বনা দিয়া বলিল—কাঁদিস না ভাই, কাঁদিস না। কেঁদে আর কি করবি?

চারুর সেই লোকটি গম্ভীর স্বরে ডাকিয়া উঠিল—গোবিন্দ, গোবিন্দ!

চারু তীব্রস্বরে বলিল—এমন করে গোবিন্দ গোবিন্দ করো না তুমি।

লোকটি হাসিয়া বলিল—কেন? কি হল?

—কি হল? চারু স্থির দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল—কি হল? মনে মনে মানুষ যখন পাপের ফন্দি আঁটে তখনই ডাকে—গোবিন্দ! গোবিন্দ! হরি হরি! দুর্গা দুর্গা! বুড়ো ষাট বছর বয়েস হেমবাবু অহরহ ডাকে—কালী! কালী! দুর্গা! দুর্গা! রাত্রে আমাকে ডাকত। তার সঙ্গী জ্ঞানোবাবু হরিনাম করত—আমাকে ডাকত রাত্রে। চরণবাবু ওদের চেয়েও বুড়ো, তার ঘরেই সে রেখেছিল মতি গোয়ালিনীকে।

তারপর সে হাসিয়া উঠিল। বলিল—বাবা, আমার বাবা দিনরাত বলত, হরি হরি, হরিবোল! যে সব বাবুরা আমার পায়ে গড়াগড়ি যেত, তাদের কাছে বকশিশ নিত। শেষ-

কালে—শেষকালে বাবা কি করলে জানিস পানু ?

চারুর বাপ সেই দিনই স্ত্রীর সৎকারের অবকাশে চারুকে ফেলিয়া পলাইয়াছিল। স্ত্রীর সৎকারও সে করে নাই। কোন চেষ্টা পর্যন্ত না।

গ্রামের লোক মৃতদেহ সৎকারে সাহায্য করে নাই। কেন করিবে, তখন তাহারা সমাজে পতিত! চারুর বাপ কেবল হরিনামই করিতেছিল। চারু বলিয়াছিল—যাও, একবার জ্ঞাতি-দের কাছে। হাত জোড় করে বল। আমার জন্যে আপত্তি হয়, আমাকে ত্যাগ কর।

—হরিবোল হরিবোল! তার চেয়ে ফেলে রেখে দে। তুইও পথ দেখ। হরি বলে আমিও পথ দেখি। গাঁয়ের মধ্যে মড়া পচুক, চিল শকুনি নামুক। পচা মড়ার মাছিতে গাঁয়ে মড়ক লাগুক, হরিবোল! বলিয়াই সে আরম্ভ করিয়াছিল—বোল্ হরিবোল্, বোল্ হরিবোল্, বোল হরিবোল্! চারু আর তাহাকে বিরক্ত করে নাই। বরং ওই কথাটাই তাহার ভাল লাগিয়া-ছিল। সেই ভাল। পচুক মড়া। নামুক শকুনি চিল। লাগুক মড়ক।

এই লোকটি বলিয়াছিল—তা কি হয়! তোমার মা! বলিয়া সে ভাড়া করিয়া আনিয়া-ছিল একখানা গরুর গাড়ী, অস্পৃশ্য জাতির গাড়ী। ভাড়া নয়, গোটা গাড়ীটার দাম লাগিয়া-ছিল। গাড়ীতে শব চাপাইয়া ওই লোকটিই গরু চালাইয়াছিল। চারুর বাপ এবারও হরি বলিয়া 'না' বলিয়াছিল। বলিয়াছিল—আমি হরি বলে যেতেও পারব না মুখে আমি আগুনও দিব না, হরিবোল, সংসারে কে কার? যেতে হয় তুই যা। আমি হরি বলে বরং ঘুরে আসি খানিক।

চারু আর কোন অনুরোধ বাপকে করে নাই। এই লোকটিকে সঙ্গে করিয়া সে গাড়ীর সঙ্গে গিয়া মায়ের শব নদীর জলে ভাসাইয়া দিয়াছিল।

চারু আজ সে কথা বলিতে গিয়া চোখের জল ফেলিল। সেদিনও ফেলিয়াছিল। বলিয়াছিল —অনেক জ্বলেছ; পোড়াতে পারলাম না, কিন্তু তার জন্যে খেদ নাই। জলে ভেসে জুড়াও তুমি। সেখান হইতে বাড়ি ফিরিয়া আর বাপকে দেখিতে পায় নাই। প্রথমটা ভাবিয়াছিল, বোধ হয় কোথাও নির্জনে বসিয়া সে হরিনাম জপ করিতে গিয়াছে। কিন্তু সন্ধ্যা পর্যন্ত যখন ফিরিল না, তখন সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। কিন্তু খোঁজ কে-ই বা করিবে? সে নিজেই একবার পথে নামিয়াছিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ মনে হইয়াছিল, কোথায় খোঁজ করিবে?

ঠিক সেই সময়েই এই লোকটি আসিয়া বলিয়াছিল—চাকরিতে আমি জবাব দিয়ে এলাম চারু।

—জবাব দিলে?

—আমি দিলাম না। বাবুই জবাব দিলেন। বললেন—তোমার বদনাম শুনেছিলাম, গ্রাহ্য করি নাই। আজ তুমি সদর রাস্তা দিয়ে ওই মেয়েটার মায়ের মড়া নিয়ে শ্মশানে গেলে! লজ্জা হল না তোমার? এই নাও তোমার মাইনে। আমার বাড়ি থেকে চলে যাও। চলে এলাম।

চারুও আর দ্বিধা করে নাই, সে সম্ভাষণ জানাইয়া তাহাকে সেই গোধূলিলগ্নে জীবনে আবাহন করিয়া বলিয়াছিল—এস।

বাড়ির দুয়ারে তাহারা পা দিয়াছে, এমন সময় রাস্তা হইতে কে ডাকিল—কে? কারা?

চারু ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে উত্তর দিয়াছিল—কেন?

—চারু? শ্যামাদাসের মেয়ে?

—হ্যাঁ। কে তুমি?

—আমি নরোত্তম সিং!

নরোত্তম সিং! তাহাদের গন্ধবেণে সমাজের ধনী ব্যবসায়ী নরোত্তম! নরোত্তমই তাহাদের সমাজের সমাজপতি। কি চায় সে? শাসন করিতে আসিয়াছে? সে তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিয়াছিল —কি চাই?

নরোত্তম কাছে আসিয়া বসিল—তোমার বাবা আজ আমাকে এ বাড়ি বিক্রী করেছে।

—বিক্রী করেছে? চারু স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল।

—হ্যাঁ। দুশো টাকা—রেজেস্ট্রী আপিসে গুনে নিয়ে দলিল রেজেস্ট্রী করে দিয়ে গিয়েছে।

—গিয়েছে? কোথায় গিয়েছে?

—সে জানি না। তবে গাঁ থেকে চলে গিয়েছে। বোধ হয় তীর্থ-ধর্ম করতে যাবে।

চারুর মুখে আর কথা ফুটে নাই।

নরোত্তম বলিয়াছিল—আজ রাত্রে তুমি অবিশ্যি থাকতে পার। কিন্তু কাল সকালেই আমায় বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে।

চারু কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিয়াছিল—দাঁড়ান। না, দাঁড়াবেনই বা কেন? আসুন আমার সঙ্গে। বাড়ীর ভেতরেই আসুন।—এস গো, এস। শেষে ডাকিয়া ছিল তাহার নবজীবনে বরণ করা এই মানুষটিকে।

বাড়ির ভিতর আসিয়া আপনার তোরঙ্গটা লইয়া লোকটির মাথায় তুলিয়া দিয়া বলিয়াছিল —চল।

নরোত্তমকে বলিয়াছিল—নেন আপনার বাড়ি, আজই এখুনি নেন।—চল গো চল।

নরোত্তম অবাক হইয়া গিয়াছিল; তারপর বলিয়াছিল—আজই তো আমি যেতে বলি নাই। আজ তো থাকতেই বলছি।

—বলেছেন। কিন্তু আমি তো আপনার হুকুমের দাসী নই। আমি আজই যাব।

—কিন্তু জিনিস-পত্র? ঘড়া ঘটি বাসন হাঁড়ি-কুঁড়ি বিছানা—

—ওসব আমার নয়। আমার এই তোরঙ্গটা আর—হ্যাঁ, ভাল মনে করিয়ে দিয়েছেন—এই পুরু তোশক বিছানা আমি করিয়েছিলাম। ওটা নিতে হবে। বাকী যা সব থাকল। ইচ্ছে হয় ফেলে দেবেন। দয়া হয় রেখে দেবেন। দাদা আছে কাতরাসের কয়লা-কুঠীতে—জানেন তো? আমাদের গাঁয়ের বাবুদের সঙ্গে খানসামার কাজ করতে গিয়েছে। সে এলে তাকেই দেবেন। নয়তো বাড়ি কিনেছেন, ওগুলো ফাউ হিসেবে নেবেন।—চল গো চল।

—বাক্স বিছানা মাথায় করে দুজনে পথে এসে দাঁড়ালাম ভাই। অন্ধকার রাত। দুনিয়াতে কোথা যাব, কি করব কিছু ঠিক নাই। আমি বললাম, চল। চল তো বটে। কিন্তু কোথা চল তার কিছু ঠিক নাই। শেষে ও বললে, দাঁড়াও। একখানা গাড়ী ভাড়া করে আনি।

গরুর গাড়ী ভাড়া করিয়া তাহারা দুইজনে সেই রাত্রেই অন্ধকারের মধ্যে যাত্রা করিয়াছিল। চারু বলিল—সেই আঁধার রেতে মনে হল যেন গেরাম নয়, পিথিবী ছেড়ে মায়াপুরীই বুঝি চললাম। গাড়োয়ান গাড়ী চালিয়ে যাচ্ছে। সে জানে, গাড়ী ভাড়া করে লোক ইস্টিশানে যায়। সে সেই পথেই গাড়ী ছেড়েছে। গরু দুটো ঠুকঠুক করে চলেছে। পথে জন-মনিষ্যির দেখা নাই, সাড়া নাই। শেষে গাড়ী যখন ইস্টিশানে এল তখন রাত তিন প্রহর। গাড়োয়ান বললে—নাম। আমরা নামলাম। ইস্টিশান দেখে মনে হল, বাঁচলাম। ভাড়ার ওপরে

গাড়োয়ানকে আমি দু-আনা পয়সা বেশি দিয়েছিলাম জলখাবার জন্যে। সে-ই যেন পথ দেখিয়ে দিলে—ধরিয়ে দিলে।

চারু চুপ করিল।

—তারপর কত জায়গা ঘুরলাম! এখান—ওখান। আমার খোকা হল। রাজপুত্তুরের মতো খোকা। সেই খোকা আমার দেড় বছরের হয়ে মারা গেল। ছিলাম রামপুরহাটে। ঘরদোর করেছিলাম। সেখান থেকে এলাম এখানে।

আবার সে স্তব্ধ হইল। এ স্তব্ধতা আর ভাঙিতে চায় না। দরদরধারে চারুর চোখ দিয়া শুধু জলই গড়াইতেছিল, কিন্তু এতটুকু শব্দ মুখ দিয়া তাহার ফুটিল না। তাহার সে খোকার জন্য এমন কান্নাই সে চিরদিন কাঁদিয়াছে, সেই প্রথম দিন হইতেই। এ বোধ তাহার জাগ্রত বুদ্ধি-বিচার করা বোধ নয়, সে বিলাপ করিয়া তাহার দুঃখ ঘোষণা করিয়া কাঁদিতে পারে নাই। সে জানে, তাহার দুঃখ পৃথিবীর লোক শুনিলে ঘৃণা করিয়া বলিবে—কি নির্লজ্জ মেয়েটা, পাপের ফলের জন্যে কাঁদে?

বহুক্ষণ পর লোকটি বলিল—ওঠ। আর কেঁদো না। পানুকে ফিরে পেলে; ওকে যত্ন করো। কিছু খেতে দাও। তারপর নিজ হাতে সাবান মাখিয়ে চান করাও দেখি।

স্নান করিয়া পানুর মনে হইল, সে যেন নূতন মানুষ হইয়াছে। এ যেন নূতন জীবন।

এগার

স্নান করিয়া মনে হইয়াছিল, সে নূতন হইয়াছে। হা-ঘরের জীবন ঘুচিয়া আবার নূতন জীবন আরম্ভ হইল। ঘটনাটা আজ হইতে দীর্ঘকাল পূর্বের ঘটনা।

আজ পানুর বয়স প্রায় চল্লিশ। হা-ঘরের সংস্রব হইতে পলাইয়া যখন আসিয়াছিল তখন সে সদ্য জোয়ান। বয়স তখন ষোল কি সতের। তেইশ চব্বিশ বৎসর পূর্বের ঘটনা। ঘটনাগুলি তাহার মনে পড়িয়া গেল বলিলে ঠিক হইবে না। চোখের সম্মুখে যেন সব ছবির মত স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হইয়া একটির পর একটি পর পর ভাসিয়া গেল।

চোখের সম্মুখে বাছুরটা পড়িয়া আছে। তাহার চোখেও জল গড়াইতেছে, পানুর চোখ হইতেও ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরিয়া পড়িতেছে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সব তাহার মনে পড়িল। এইটুকুই তাহার শেষ নয়। ইহার পর আবার আরম্ভ হইল জীবনের নূতন ধারা। বিচিত্র ঘটনাচক্রে সে গিয়া পড়িয়াছিল আদিম সভ্যতার অন্ধকারে। আলোর আকর্ষণে সে ফিরিল। উঃ, কি মমতা এই জীবনের!

হঠাৎ তাহার মুখে এক বিচিত্র হাসি ফুটিয়া উঠিল। নূতন জীবন, না, ছাই। তুলনা করিয়া দেখিল, হা-ঘরের জীবন এর চেয়ে ভাল ছিল। অনেক ভাল। তাহাদের মধ্যে থাকিলে সে এ জীবনের অপেক্ষা বহুগুণে সুখী হইতে পারিত। জমিদারের প্রজা নয়, মহাজনের খাতক নয়,—জাত-জ্ঞাতের বালাই নাই, ঘর-দুয়ারের ঝঞ্ঝাট নাই, জমিজেরাত লইয়া মামলা নাই, সে জীবন এর চেয়ে অনেক ভাল। হাজার—লক্ষ্য গুণে ভাল। কতবার সে ভাবিয়াছে, এ সব ছাড়িয়া আবার সে বাহির হইয়া পড়ে তাহাদের সন্ধানে। কিন্তু আশ্চর্য মমতা ঘরদুয়ার, জমিজেরাত এবং এই সব মানুষগুলির, যাহাদের কোনক্রমেই সে আপনার করিতে পারিল না, সে নিজেও

যাহাদের আপনার হইতে পারিল না। যাহাদের অত্যাচারে অবিচারে সে জীবনে ঘর বাঁধিয়াও হা-ঘরেদের মত বার বার ঘর বদল করিয়াছে।

পানুর এই ঘরদুয়ার চতুর্থতম নীড়। ইহার পূর্বে সে আর তিন জায়গায় ঘর পাতিয়াছিল। কিন্তু ওই গ্রামের লোকের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া অথবা জমিদারের সঙ্গে বিবাদ করিয়া সে সব ছাড়িয়া দিয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে। বর্বর জীবনের অভ্যাস লইয়া সে ফিরিয়াছে। ওই বর্বর জীবন তাহার শৈশবের অত্যাচারিত জীবনে—স্বজনচ্যুতির বেদনা, আহারে বিহারে আচারে আচরণে হাজার অভ্যাসের বিপরীত বন্য অভ্যাসকে জীবনে গ্রহণ করার অস্বস্তিকর দুঃখ সত্ত্বেও একটা মুক্তি আনিয়া দিয়াছিল। ভালবাসিতে সে জানে, ভাল সে বাসিয়াছে। কিন্তু ভালবাসার অপমান তাহার সহ্য হয় না; আঘাতকে সে ক্ষমা করে না। ভালবাসার জীবনে দুঃখ আসিলে দুঃখ মোচনের জন্য পানু প্রাণ দিতে পারে; কিন্তু তাহাকে প্রতারণা করিলে, দুঃখ দিলে, অপমান করিলে পানু তাহার জীবন লইয়া শোধ তুলিবে। এই শিক্ষা সে অর্জন করিয়া ফিরিয়াছিল। সে শিক্ষা তাহার দিন দিন কঠিন হইতে কঠিনতর হইয়া রুক্ষ পাহাড়ের মত আত্মঘোষণা করিয়া চলিয়াছে। কাহারও সঙ্গে তাহার মিলে না। প্রতিটি মানুষ তাহার সঙ্গে প্রতারণা করিয়াছে। ওই দিদি? ওই চারু? যাহাকে দেখিয়া মমতায় প্রায় আত্মহারা হইয়া বাবা বুধনকে, মায়ীকে, হা-ঘরের দলকে ছাড়িয়া পলাইয়া আসিল, সেই দিদির সঙ্গে কি ঘটিল?

তাহার সঙ্গেই কি বনিল? না, বনিল না। সে জন্যই তো জীবনে কোন দিন কাহাকেও ক্ষমা করে নাই। কেন সে ক্ষমা করিবে? লোকে তাহার উপর অত্যাচার করিলে সে তাহার শোধ লইবে। মানুষ, জানোয়ার, এমন কি পাখিকেও সে কোন দিন ক্ষমা করে নাই। কত কাক যে তাহার বাঁটুলের আঘাতে লুটাইয়া পড়িয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কোন জিনিস রৌদ্রে দিয়াছে, কাকে আসিয়া তাহাতে মুখ দিল, একবার তাড়াইয়া দিল—দুইবার, তিনবারের বার পানু বাঁটুলের ধনুকটা লইয়া অব্যর্থ লক্ষ্যে হানিল মাটির গুলি; কাকটা মরিতেই কাক-সম্প্রদায়ের স্বভাবধর্ম অনুযায়ী ঝাঁক বাঁধিয়া কাকগুলা কলরব আরম্ভ করিল; পানুরও বাঁটুল ছুটিতে আরম্ভ করিল। একটার পর একটা করিয়া কাক মরিল।

কুকুর সে ভালবাসে। নিজের পোষা কুকুর তাহার আছে। কিন্তু অন্য কুকুর আসিয়া কোন কিছুতে মুখ দিলে তাহার রক্ষা নাই, সে তাহাকে দুর্দান্ত প্রহার করে; নিষ্ঠুর কৌতুকে পিছনের পা দুইটা ধরিয়া বন-বন শব্দে পাক দিয়া ছাড়িয়া দেয়, হতভাগ্য জানোয়ারটা ছিটকাইয়া গিয়া পড়ে।

•

কিন্তু আজ তাহার এ কি হইল? এই বাছুরটাকে আঘাত করিয়া সমস্ত অন্তরাত্মা যেন হায়-হায় করিয়া উঠিল, তাহার বুকের মধ্যে যেন একটা ভূমিকম্পের কম্পন বহিয়া যাইতেছে।

শরৎকালের দুপুরবেলা।

পূজা চলিয়া গিয়াছে। আশ্বিনের শেষ। পৃথিবীর বুক গাঢ় সবুজ রঙে ভরিয়া উঠিয়াছে; আকাশ গাঢ় নীল। রৌদ্রের রঙ আতশী কাচের মত ঝলমল করিতেছে। গাছের পাতায় পাতায় সে প্রভার দীপ্তি, দূর্বার অগ্রবিন্দুগুলি পর্যন্ত রৌদ্রচ্ছটায় সবুজ মণিকণার মত মনে হইতেছে। এই সবুজের নেশা পানুর বড় ভাল লাগে। তাহার মনে হইল, সব যেন কালো কুৎসিত হইয়া গিয়াছে। বাছুরটা ততক্ষণে তাহার হাত চাটিয়া অনেকখানি যেন সাহস পাইয়াছে। সে পানুর মুখের দিকেই চাহিয়া আছে। তাহার কালো চোখটার উপর

মধ্যদিনের সূর্য একটি বিন্দুর আকারে প্রতিবিম্বিত হইয়া জ্বলিতেছে।

পানু গভীর মমতার সহিত বাছুরটার পাঁজরাগুলির উপর হাত বুলাইয়া দিল। তারপর সে সযত্নে বাছুরটাকে তুলিয়া দাঁড় করাইয়া দিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বাছুরটা মাটির উপর পড়িয়া গেল। পিছনের একটা পা বোধ হয় একেবারে ভাঙিয়া গিয়াছে।

পানু এবার বাছুরটাকে কোলে তুলিয়া দাওয়ার উপর শোয়াইয়া দিল। হঠাৎ নজরে পড়িল, এখনকার বড় বউ রাজু একটা বড় বাটি হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। সে জিজ্ঞাসা করিল—কি? রাজু বলিল—মাড় আর দুধ। রাজু বাটিটা বাছুরটার মুখের কাছে ধরিল। বাছুরটা একবার তাহার দিকে চাহিল, তারপর বাটির খাদ্যবস্তুটা শুঁকিল; একবার জিভ দিয়া লেহন করিয়া দেখিল, শেষে গ্রীষ্মকালের বালিতে যেমন করিয়া জল শুষিয়া লয়, জলের ভিজা দাগটুকু পর্যন্ত যেমনভাবে মিলিয়া যায়, তেমনি ভাবেই বাটির দুধ-মেশানো মাড় খাইয়া শেষ করিয়া চাটিয়া মাড় ও দুধের চিহ্ন পর্যন্ত বিলুপ্ত করিয়া দিল। বহুদিন বোধ হয় এমন করিয়া কোন সুপেয় পানীয় খাদ্য খাইতে পায় নাই। পানু জানে, কেমন করিয়া নিঃশেষ করিয়া হতভাগ্য জীবটার মাতৃস্তন্য গৃহস্থেরা দোহন করিয়া লয়। সন্ধ্যা হইতে বাছুরটা বাঁধা থাকে, সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইয়া যায়, তৃষ্ণায় ক্ষুধায় বাছুরটা চেঁচায়; দূরে বাঁধা থাকে তাহার মা; স্তন্য ক্ষীরভার তাহার স্তনভাণ্ডের কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়া ফাটিয়া পড়িতে চায়, শিরাগুলা টনটন করে। সেও স্নেহের বেদনায়, দৈহিক যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া শাবককে ডাকে, শাবকের ডাকে সাড়া দেয়; রাত্রি শেষ হয়, মানুষ আসিয়া বাছুরটাকে আনিয়া বারেকের জন্য মাতৃস্তন্য লেহন করিতে দেয়। মাতৃস্তন্য-ভাণ্ডে—উথলিয়া উঠে শুভ্র ফেনিল ক্ষীর-সমুদ্র, সঙ্গে সঙ্গে মানুষ বাছুরটাকে টানিয়া ধরে, তারপর সেই উচ্ছ্বসিত ফেনিল দুগ্ধধারার শেষ বিন্দুটি পর্যন্ত টানিয়া বাহির করিয়া লয়। বাছুরটা ইহার পর নিঃশেষিতক্ষীর মাতৃস্তনে মুখ দিয়া আঘাতের পর আঘাত করে, যেন মাথা কুটিয়া মরে, কিন্তু এক বিন্দুও পায় না। আবার দিনের অগ্রগতির সঙ্গে মাতৃস্তনে দুধ জমিতে শুরু হয়; মানুষ আবার শাবকটাকে সরাইয়া আনিয়া বাঁধে। অপরাহ্নে আবার একবার দোহন করিয়া লয়। তাহারই মায়ের দুধে মানুষের দেহ নধর হইয়া উঠিতেছে আর তাহার কচি লাবণ্য শুকাইয়া অস্থিপঞ্জসার হইয়া গিয়াছে।

আঃ, এখনও বাছুরটা জিভ দিয়া আপনার মুখ ঠোঁট চাটিতেছে!

পানুও সেদিন এমনিভাবে আপনার উচ্ছিষ্ট-মাখা হাতখানা বার বার চাটিয়াছিল।

সেদিন অর্থাৎ চারুর বাড়িতে যেদিন সে প্রথম ফিরিয়াছিল সেই দিন। স্নান করিয়াছিল প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরিয়া। দিদি একখানা সাবান দিয়াছিল। সাবান ঘষিয়া শরীর হইতে সে কী ক্লেদ বাহির হইয়াছিল! সাবান মাখার ক্ষীণ স্মৃতি তাহার ছিল। দিদি বলিয়াও দিল। হাতের উপর হাত ঘষিয়া বলিল—এমনি করে ঘষবি।

দিদির সেই লোকটি, তাহার নাম দীনু—দীননাথ। দীননাথ হাসিয়া বলিয়াছিল—তেল মাখ হে। নইলে শরীরে একেবারে চড়চড় করে ফেটে যাবে।

সাবান মাখা শেষ করিয়া তেল মাখিয়া আবার সে স্নান করিয়াছিল। সে যে তাহার মুক্তিস্নান। সভ্য সমাজের মধ্যে জন্মিয়া, তের-চোদ্দ বৎসর পর্যন্ত সেই সমাজের মধ্যে মানুষ হইয়া তাহার সুখ-দুঃখের সঙ্গে বত্রিশ বাঁধনে বাঁধা পড়িয়াছিল, ঘর বাড়ি সংসার, ঘোমটা-দেওয়া টুকটুকে বউ; বারো মাসে তেরো পার্বণ, দুর্গা-কালী-কার্তিক-ঠাকুর, যাত্রা-পাঁচালী-গান; বাংলা বুলি, ধানে ভরা ক্ষেত, মরাই ভরা খামার, পৈত্রিক বেনেতির দোকান—এই সব লইয়া ভবিষ্যৎ জীবনের যে কল্পনা ওই চোদ্দ বৎসরের মধ্যেই অক্ষয়মূল, দূর্বার মত তাহার

মনের ক্ষেত্রে জন্ম লইয়া ছিল, সে কল্পনা ওই যাযাবর জীবনের দীর্ঘ কয় বৎসরের প্রখর গ্রীষ্মেও মরিয়া যায় নাই। উপরের লতাজাল শুকাইয়া গিয়াছিল, রুকণী তাহাতে আগুন ধরাইয়া দিয়াছিল, তবুও মনের ক্ষেত্রের গভীর তলদেশে তাহার মূলজাল ছিল অমর হইয়া। তাই যে মুহূর্তে আবার সে ফিরিয়া আসিল তাহার দিদির ঘরে, বাঙালীর সংসারে—সজল বর্ষার মত যাহার রূপ—সেই মুহূর্তেই আবার ক্ষেত্রের উপর দেখা দিল দূর্বাজালের সবুজ অঙ্কুরকণা। স্নান করিয়া সে বলিয়াছিল—বাঁচলম গো দিদি! আরে বাপ্ রে, কি গর্দা! আঃ, মন লিছে কি নতুন মানুষ হলম আমি।

তারপর তাহার দিদি তাহাকে খাইতে দিল। ভাত, ডাল, তরকারী, অম্বল। তাহার মাংসাশী রসনা যেন অমৃতের আস্বাদ পাইল। সে সেদিন রাক্ষসের মত আহার করিয়াছিল।

চারু বলিয়াছিল—আর খাস না পানু, অসুখ করবে।

দীনু ধমক দিয়াছিল—আঃ! না না, খাও, তুমি পেট ভরে খাও।

লজ্জিত হইয়া পানু তাহার হাতখানা চাটিতে চাটিতে উঠিয়া গিয়াছিল। ওই বাছুরটা যেমন বার বার জিভ দিয়া মুখ চাটিতেছে, তেমনি করিয়াই সে হাত চাটিয়াছিল।

আশ্চর্য! আশ্চর্য! যেন গ্রীষ্মের সাঁওতাল পরগণার তৃণহীন লাল মাটিতে একটা প্রবল বর্ষণ হইয়া গেল, আর পরদিন প্রভাতে দেখা দিল তৃণাঙ্কুর! কোথায় ছিল এই তৃণাঙ্কুরের বীজ কি মূল? কেমন করিয়া ছিল মরুভূমির মত প্রান্তরে অগ্নিবর্ষী গ্রীষ্মে? সত্যই ধীরে ধীরে আবার তাহার মনের ক্ষেত্র সবুজ দূর্বার আস্তরণের মত কত আশা আকাঙ্ক্ষার জটিল জালে ভরিয়া উঠিয়াছিল। প্রত্যেকটার সঙ্গে প্রত্যেকটা এমনভাবে জড়িত যে, একটাকে ধরিয়া টান দিলে সমস্ত লতার জালটাতেই টান পড়ে।

প্রথম টান সে অনুভব করিল কয়েক দিন পরেই। টান দিল তাহার দিদি।

সে নিজেই দিদির সংসারের কতকগুলা কাজ গ্রহণ করিয়াছিল। বাড়িতে দুইটা গরু ছিল, পানু সেই দুটার সেবা লইয়া পড়িল। ঘরের কাঠ কাটিত। ময়ূরাক্ষীর পার-ঘাটার উপর বাজার জায়গা, কাঠের গুঁড়ি কিনিতে হয়, মজুর লাগাইয়া সেই কাঠ খানা-খানা করিয়া লওয়ার রেওয়াজ। পানু বলিল—উ হামি করবে। কুড়াল দে দিদি।

একা সে প্রায় দেড়া মজুরের উপযোগী কাঠ চেলা করিয়া ফেলিল।

দীনু লোকটি অদ্ভুত। সে বার বার বারণ করিল—আর থাক—আর থাক।

পানু নিজের শক্তি দেখাইয়া তাহাদের বিস্মিত করিয়া দিতে চায়, আপনার সকল শক্তি প্রয়োগে কাজ করিয়া অকৃত্রিম আত্মীয় হইতে চায়, সে হাসিয়া বলিল—না, না, পারব, হামি অনেক পারব। আরও পারব।

চারু বলিল—হ্যাঁ, পানু পারবে। দেখ না তুমি। শরীর দেখছ না!

পানুর দেহ গৌরবে স্ফীত হইয়া উঠিল।

পরের দিনই সে কুড়ুল কাঁধে করিয়া বাহির হইয়া গেল। কাহাকেও কিছু বলিল না। ময়ূরাক্ষীর তটভূমিতে সুদীর্ঘ ঘন জঙ্গল, বড় বড় গাছ; সেই জঙ্গলে চলিয়া গেল। জঙ্গল দেখিয়া সেদিন মনে পড়িয়াছিল যাযাবর জীবনের বন্য আস্বাদের তৃপ্তি; রুকণীকে মনে পড়িয়াছিল। ওই রুকণীর স্মৃতিই সেদিন তাহার যাযাবর আত্মীয়দের বিরহবেদনাকে লাঘব করিয়া দিল। রুকণী নাই, সেখানে আর কি সুখ আছে? বুড়া কাঁদিতেছে, বুড়ী কাঁদিতেছে, তাহাদের জন্য তাহারও চোখে জল আসিল। কিন্তু বুড়া-বুড়ী কয়দিন? তাহার পর? তাহার পর কোন্ সুখ সে সেখানে পাইত? সে জঙ্গলের একটা প্রাচীন গাছের কাছে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল।

বুড়া হা-ঘরে ওস্তাদ লোক—তাহাকে অনেক শিখাইয়াছিল ; সেই শিক্ষা হইতে পানু জটিল লতাজালে আচ্ছন্ন প্রকাণ্ড বড় গাছটাকে দেখিয়াই বুঝিল—এইখানে থাকেন জঙ্গলকে দেও, বনের দেবতা।

সে ভূমিষ্ঠ হইয়া দেওতাকে প্রণাম করিল। বুড়ার শিখানো মন্ত্র পড়িল। তারপর বলিল—হে দেওতা! হে বাপা! তুমি বুড়া-বুড়ীকে দয়া করিয়ো—তাহাদের দুঃখে তুমি দেখিয়ো, আমার জন্য রাত্রে যখন বুড়া-বুড়ীর চোখে নিদ আসিবে না, জাগিয়া দুইজনে কথা বলিবে আর কাঁদিবে তখন তুমি ফুরফুর করিয়া বাতাস দিয়া তাহাদের চোখে নিদ আনিয়া দিয়ো। যখন তাহাদের অসুখ করিবে, তখন হে জঙ্গলকে দেও, বাপা, তুমি চোখের সামনে তাহাদের পায়ের কাছে ফেলিয়া দিয়ো শিকড়-জড়ি। কিংবা সামনের মাটিতেই গাছ হইয়া থাকিয়ো, যেন তাহারা দাওয়াই পায়। আর হে জঙ্গলকে দেও, হে বাপা, আমার কসুর তুমি মাফ করিয়ো বাপা। আমি দল হইতে পলাইয়াছি—রুকণী নাই, আমি পলাইয়া আসিয়াছি। আমি তো হা-ঘরে নই, আমি ঘর-সংসারী জাতের ছেলে, আমি ঘর-সংসারে আসিয়াছি, তবুও আমি তোমাকে ভুলিব না। তোমার পূজা আমি করিব। তোমাকে 'পরণাম' আমি করিব। আমার কসুর তুমি মাফ করিয়ো। আমার দিদির ঘর তোমার জঙ্গলের কাঠে ভরিয়া দিয়ো। তোমার লতার ফুল দিয়ো, আমি সাদী করিয়া আমার পিয়ারীর চুলে পরাইয়া দিব। তোমাকে পরণাম করিতেছি বাপা।

তারপর সে অন্য একটা প্রকাণ্ড গাছ দেখিয়া সেইটার উপরে উঠিয়া বড় একটা ডাল কাটিয়া ফেলিল। প্রকাণ্ড ডাল। সে ডাল বহিতে কয়েকখানা গাড়ীরই প্রয়োজন। পানু ডালটার খানিকটা অংশ কাটিয়া লইয়া কাঁধে বহিয়া বাড়ি ফিরিয়া দুম করিয়া ফেলিল।

—এ কি? এ কোত্থেকে আনলে? জিজ্ঞাসা করিল দীনু।

—জঙ্গলসে! গামছা দিয়া কপালের ঘাম মুছিয়া পানু বলিল—থোড়া পানি।

চারু স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। সে বলিল—ওইটা তুই জঙ্গল থেকে কাঁধে করে আনলি?

পানু অহঙ্কার করিয়া বলিল—হাঁ। আনলম। আওর বহুৎ কাঠ আছে দিদি। আনব। রোজ লিয়ে লিয়ে আসব। থোড়া পানি—জল দিদি।

জলের কথাটি চারু আমলেই আনিল না। বলিল—তোকে নিয়ে তো আমার বিপদ হবে পানু। জঙ্গল সরকারের। জঙ্গলে মহলদার আছে। ধরে যখন থানায় দেবে, তখন আমাদের নিয়ে টানাটানি করবে যে। এ তোমার হা-ঘরের দল নয় যে, এল, দু দিন থাকল, দুটো কাঠ-কুটো কাটল—মহলদার কিছু বললে না। এ দেখলেই পুলিসে দেবে।

পানু পুলিসের আর ভয় করে না। তবু তাহার মনে একটা সুপ্ত ভয় আছে। সে বিস্মিত এবং ঈষৎ আতঙ্কিত হইয়া দিদির মুখের দিকে চাহিয়া রইল।

দিদি বলিল—আমার সুসার করে তোমার কাজ নাই। ওসব করলে ভাই আমার ঘরে তোমাকে ঠাঁই দিতে পারব না।

দীনু বলিল—আঃ কি বলছ? ওকে সে আমি বুঝিয়ে দোব পরে। এখন বেচারা জল চাইছে, জল দাও।

পানু অপ্রতিভ হইয়া গিয়াছিল। দিদির কথায় সে একটু বেদনাও অনুভব করিল। মনে পড়িল হা-ঘরের দলের কথা।

চারু গজগজ করিতে করিতে একটা ঘটিতে করিয়া জল আনিয়া বলিল—নে, হাত পাত।

দীনু বলিল—একটা কিছুতে করে দাও না।

—কিছুতে করে? আমার বাসনে ওকে খেতে দোব নাকি? ওর কি জাত আছে? হা-ঘরের দলে কি না খেয়েছে? মায়ের পেটের ভাই বলে ওর দায়ে জাত-ধম্ম সব জলাঞ্জলি দেব নাকি?

পানুর বুকে কথাটা তীরের মত গিয়া বিঁধিয়াছিল। দিদি বলিতেছে, তাহার জাত নাই। তবে সে দিদির ভাই কি করিয়া হইবে? তবে সে কেন ফিরিল? অদ্ভুত দৃষ্টিতে সে দিদির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সে হয়তো সেই বিচিত্র চীৎকার করিয়া উঠিত; কিন্তু তাহার পূর্বে দীনু নিজেই একটা টোল খাওয়া কলাই-উঠিয়া-যাওয়া স্টীলের গেলাস আনিয়া দিয়া বলিল—পানু, এইটাতে তুমি জল খাবে।

চারু বলিল—খাবে, কিন্তু ওটা বাইরে রাখবে। আমাদের বাসনের সঙ্গে ঠেকাবে না।

জল খাইতে গিয়া পানুর চোখের জল গেলাসের জলের সঙ্গে মিশিয়া গেল।

বারো

সেই স্টীলের গেলাসটা আজও তাহার কাছে আছে। অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে রাখিয়া দিয়াছে। সমস্ত পৃথিবীর মানুষকেই সে ঘৃণা করে, কিন্তু দিদির উপর ঘৃণা তাহার সবচেয়ে বেশী। না, সমস্ত পৃথিবীর মানুষকে সে ঘৃণা করে না। দিদির সেই মানুষটি—সেই দীনুকে সে ভালবাসে। আরও ভালবাসে সেই হা-ঘরেদের—সেই ওস্তাদ বুড়া, সেই বুড়ী আর রুকণী। হ্যাঁ, রুকণী তাহাকে প্রতারণা করিয়া থাকিলেও তাহাকে সে ভালবাসে। রুকণী প্রতারণা করে নাই, ওটা তাহার ভুল। আঃ, রুকণী যদি না মরিত, তবে সে কখনই আবার ফিরিয়া এই স্বার্থপর বদমাইশ মানুষগুলার মধ্যে আসিত না। কখনই না। রুকণী! রুকণী! তাহার রুকণী! রুকণীকে তো সে নিজেই মারিয়া ফেলিয়াছে। রুকণী তো তাহারই ছিল। সে তো তাহার পানুয়াকেই সবচেয়ে বেশী ভালবাসিত; এ কথা সে নিজেই তো সকলের চেয়ে বেশী জানে! রুকণীর দোষ, রুকণী একমাত্র তাহাকেই ভালবাসে নাই। অল্প খানিকটা ভালবাসা সে অন্যকেও দিয়াছিল। পানু নিজে তাহার জীবনে বেশ করিয়া বুঝিয়াছে, রুকণীর মত অন্যকে অল্প খানিকটা ভালবাসা দিবার জন্য প্রাণ কতখানি ব্যাকুল হয়! সে নিজে এই বয়সে চারবার বিবাহ করিয়াছে—একটা মরিয়াছে, একটা পলাইয়াছে, এখনও দুইটা ঘরে রহিয়াছে। রুকণীর কথা মনে হইলেই মন তাহার উদাস হয়, সে কাঁদে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তাহার স্ত্রীদের সম্বন্ধে সজাগ হইয়া উঠে। তীক্ষ্ণ লক্ষ্য রাখে। স্ত্রীদের কেহ কাহারও সহিত হাসিয়া কথা বলিলে তখন দুর্দান্ত প্রহারে তাহাকে শাস্তি দেয়। ঘরে বন্ধ করিয়াও রাখে।

রুকণী মরিয়াছে, সে দুঃখ তাহার যাইবার নয়। কিন্তু তাহার দিদি যদি এমন কঠিন দুঃখ না দিত, তবে সে এমন দুর্দান্ত ক্রোধী হইত না। তাহার নিজের জীবনের চেহারাটা যেন এই মুহূর্তে তাহার চোখের সম্মুখে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কত মানুষকে যে সে মারিয়াছে! চড়-চাপড় মারার হিসাব নাই, লাঠির আঘাতে কত জনের রক্তপাত সে করিয়াছে তাহার হিসাব যেন স্পষ্ট হইয়া অঙ্কের যোগফলের মত পানুর চোখের সামনে ভাসিতেছে! প্রথমেই সে মারিয়াছিল—লাঠি মারিয়া মাথা ফাটাইয়া দিয়াছিল দিদির ও দীনুর গুরুঠাকুরের, তাহার নিজেরও গুরুঠাকুর ছিল সে।

ওই জল খাওয়ার ঘটনা হইতেই ঘটনাটার উদ্ভব। দীনু তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া ভাঙা

তোবড়ানো স্টীলের গেলাসটা দিল। কিন্তু তাহাতেও তাহার মনের দুঃখ গেল না। কেমন করিয়া তাহার জাত ফিরিয়া পাইতে পারে এই ভাবনায় সে আকুল হইয়া উঠিল। জাত ফিরিয়া পাইলে সে তাহার দিদিকে ফিরিয়া পাইবে। দিদি তাহাকে ছুঁইলে স্নান করিবে না। পিঠে গায়ে হাত বুলাইয়া দিবে। তাহার মায়ের পেটের দিদিকে সে সত্য সত্য ফিরিয়া পাইবে।

দিদির বাড়ির বাহিরে বসিয়া থাকিত সে। একদিন গিয়াছিল বাজারে। দুপুরবেলা। বাজারে লোকজন বেচা-কেনা কম। একজন বুড়ো দোকানী সুর করিয়া কি পড়িতেছিল। তাহার মনে পড়িয়া গেল, তাহার বাবাও সন্ধ্যাবেলায় এমনি করিয়া কি পড়িত! রামায়ণ পড়িত। দীর্ঘদিন হা-ঘরেদের দলে থাকিয়া অন্যান্য পুরাণ-কাহিনী অনেক গোলমাল হইয়া গিয়াছে। কিন্তু রামায়ণটা মনে আছে। হা-ঘরেদের দলে রামনাম আছে। সীয়ারাম সীয়ারাম ধ্বনি তাহাদের মুখস্থ। অনেকের সর্বাঙ্গে উল্কি দিয়া রামনাম লেখা থাকে। বুধনের গোটা কপালটায় রামনামের উল্কি ছিল। সে দাঁড়াইল। দোকানীর সুরেলা কথাগুলির মধ্য হইতে রামনামটা কয়েকবার কানে আসিয়া ঢুকিল। মুদী পড়িতেছিল—

"মনুষ্য গো-হত্যা আদি যত পাপ করে।
একবার রামনামে সর্বপাপ হরে॥
মহাপাপী হইয়া যদি রামনাম কয়।
সংসার-সমুদ্র তার বৎস-পদ হয়।"

পানু বসিল। রামজীর নাম হইতেছে! সীয়ারাম! সীয়ারাম!

মুদী সুর করিয়া পড়িতেছিল। সমস্ত কথার অর্থ না বুঝিলেও শুনিতে শুনিতে মনের মধ্যে অতীত কালের শোনা গল্প ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিল। মনে পড়িল, চোর রত্নাকর নামে এক ব্রাহ্মণের ছেলে ছিল, সে মানুষ মারিত। তারপর একদিন ছলনা করিয়া ব্রাহ্মণের বেশে তাহার কাছে আসিল নারদমুনি। ব্রহ্মাকে তাহার মনে পড়িল না। মুদী বার বার ব্রহ্মার নাম করিল। নামটা পানুর চেনা-চেনা মনে হইল, কিন্তু সে যে কে, সঠিক ঠাওর করিতে পারিল না। কিন্তু নারদমুনিকে তাহার মনে আছে। যাত্রার দলে. পাঁচালীর দলে কতবার তাহাকে দেখিয়াছে। ঢেঁকিতে চড়িয়া যায়, ঝগড়া বাধাইয়া বেড়ায়, একতারা লইয়া গান করে। পাকা চুল, পাকা দাড়ি—নারদকে তাহার মনে আছে।

নারদ মুনি রত্নাকরকে রামনাম দিয়াছিল। যে মহাপাপ রত্নাকর করিয়াছিল সেই পাপক্ষয়ের জন্য রামনাম দিয়াছিল। রত্নাকরের মুখে কিন্তু কিছুতেই রামনাম আসে না। শেষে অনেক কষ্টে বলিল—মরা। মরা মরা বলিতে বলিতে আসিল রাম রাম রাম।

মুদিও পড়িল—

"মরা মরা বলিতে আইল রামনাম।
পাইল সকল পাপে মুনি পরিত্রাণ॥
তুলারাশি যেমন অগ্নিতে ভস্ম হয়।
একবার রামনামে সর্ব পাপ ক্ষয়॥"

পানু পরম আশ্বাস পাইয়া বাঁচিল। সে রাম রাম সীতারাম জপ করিতে করিতে ময়ূরাক্ষীর নির্জন তটভূমিতে গিয়া সেদিন সমস্ত অপরাহ্নবেলাটা অবিরাম উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়াছিল—রাম রাম সীতারাম। তারপর সন্ধ্যায় সে ময়ূরাক্ষীতে একবার স্নান করিয়া বাড়ি ফিরিল।

চারু ঝঙ্কার দিয়া উঠিয়াছিল—বলি আবার গিয়েছিলি কোথা?

দীনু আলো জ্বালাইয়া একখানা বই লইয়া বসিয়াছিল। সে হাসিয়া সস্নেহে বলিয়াছিল

—কি হে, গিয়েছিলে কোথা? আবার চান করলে যে?

চারু বলিল—করবে না! শরীরে ওর ডাহ কত! কত কত অখাদ্যি কুখাদ্যি খেয়েছে—শরীর একেবারে গরম হয়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্র ঘৃণার ভঙ্গিতে শিহরিয়া উঠিবার ভান করিয়া উঠিল।

পানু ধীরে ধীরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল দীনুর কাছে। চারুর কথাগুলি তাহাকে যেন চাবুক মারিল।

চারু চলিয়া গেল ঘরের মধ্যে। সে ঘরের মধ্যে যাইতেই পানু মৃদুস্বরে দীনুকে বলিয়াছিল—আজ হামার সব পাপ গেল। বহুৎ বললাম—রাম রাম রাম—সীয়ারাম সীয়ারাম সীয়ারাম।

দীনু তাহার মুখের দিকে চাহিল।

পানু আবার বলিল—হামার জাত তো আমি পেলম। হামার পাপ তো গেল—তাহার কথার মধ্যে প্রশ্নের সুর ছিল না; সঠিক উপলব্ধির বার্তা ছিল।

দীনু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কিছু ভাবিতেছিল।

পানু তাহার হাতের বইটার দিকে আঙুল দেখাইয়া প্রশ্ন করিল—রামায়ণ? বলিয়া সে অসঙ্কোচে বইটা খুলিয়া ফেলিল। কিন্তু কালো গুটি গুটি চিহ্নগুলার একটাকেও সে চিনিতে পারিল না।

দীনু বলিল—যাও, কাপড় ছাড়। তোমার জাতের ব্যবস্থা করছি।

পানু ও-কথাটা বিশেষ বুঝিল না। কিন্তু বইখানার অক্ষরগুলা চিনিতে না পারিয়া অত্যন্ত বেদনাবোধ করিল। মনে পড়িল তাহার স্কুল-জীবনের কথা। কত বই, কত ছবি, কত গল্প, কত ছড়া—বই খুলিয়া সে পড়িত। অনেক গল্প অনেক ছড়া তাহার মনে আছে। কিন্তু আখরগুলা দিদির মত পর হইয়া গেল নাকি? অন্তরটা তাহার হায় হায় করিয়া উঠিল।

পরদিন বাজারে গিয়া তাহার চোখে পড়িল একটা মনিহারীর দোকানে কতকগুলা রঙচঙে বই। বইগুলাকে চেনা মনে হইল। একটা বই লইয়া খুলিয়াই সে আনন্দে অধীর হইয়া গেল। রঙচঙে বইটার প্রথম পাতাতেই বড় বড় হইয়া বিচিত্র বর্ণে ফুটিয়া আছে—অ-আ-ই-ঈ। দেখিবামাত্র সে চিনিল। যেমন দেখিবামাত্র চিনিয়াছিল তাহার দিদির মুখ, যেমন দেখিবামাত্র চিনিতে পারিবে তাহার বাপের মুখ, তাহার মরা মা যদি আজ ফিরিয়া আসে তবে তাহার মুখও যেমন দেখিবামাত্র সে চিনিতে পারিবে, তেমন ভাবেই সে চিনিতে পারিল—অ-আ-ই-ঈ।

সে দোকানীকে জিজ্ঞাসা করিল—কেতনা দাম।

দোকানী বলিল—দু আনা।

গেঁজলে খুলিয়া সে সঙ্গে সঙ্গে বইখানা কিনিয়া বাড়ি ফিরিল। সেদিন দুপুরবেলায় আবার সে ময়ূরাক্ষীর নির্জন তটভূমিতে তন্ময় হইয়া বইখানার মধ্যে ডুবিয়া গেল। একে একে সব মনে পড়িল। চোদ্দ বৎসর বয়স পর্যন্ত সে সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলাকে আয়ত্ত করিয়াছিল—এই কয় বৎসরের অপরিচয়ে তাহার উপর যে বিস্মৃতির আবরণ পড়িয়াছিল তাহার পরিমাণ যতই হোক, দেখিতে দেখিতে সেগুলা কাটিতেছিল। সন্ধ্যার অন্ধকার তখন ঘনাইয়া আসিয়াছে। তখন সে পড়িতেছিল—জল পড়ে, পাতা নড়ে।

বাড়ি ফিরিতেই দীনু তাহাকে বলিল—পানু তোমার ব্যবস্থা করলাম হে। আমাদের গুরু গোসাঁই আসছেন, তুমি ভেক নাও, আমরাও বোষ্টম হয়েছি, তুমিও ভেক নাও। নিলেই সব গোল মিটে যাবে।

বোষ্টম! মনে পড়িল তিলক কাটিয়া মালা পরিয়া বাবাজীরা ভিক্ষা করিতে আসিত।

মন্দিরা বাজাইয়া গান করিত। সে গানেরও খানিকটা মনে আছে।

মনে পড়িয়া গেল, 'হরিনামের গুণে গহন বনে ডাকলে নিতাই পার করে' গান গাহিয়া বৈশাখে সংকীর্তনের দল বাহির হইত। মাখন মশায় ছিলেন মূল গায়েন। সেও কতদিন দলের সঙ্গে বাহির হইত। গানের সঙ্গে নাচিত।

কয়েক দিন পরেই গুরুঠাকুর আসিলেন। পানুর মাথা ন্যাড়া করিয়া দেওয়া হইল। গলায় মালা পরাইয়া দিল। তিলক ছাপ দিল কপালে। পানু বোষ্টম হইয়া গেল।

পানুর দিদি তাহাকে স্পর্শ করিল। কিন্তু তবু খাইতে দিবার সময় খাইতে দিল পাতায়। পানুর উৎসাহ আনন্দ যেন নিবিয়া গেল।

সেই দিনই সন্ধ্যাবেলা। দীনু তাহাকে বলিল—এস হে পানু, নদীর ধারে গুড়ের গাড়ী এসেছে দেখে আসি। পানু তাহার সঙ্গে গেল। পথে দীনু তাহাকে কত বলিল; বলিল—ভিয়েনের কাজ শেখ। তারপরে নিজে দোকান কর, বিয়ে কর। ঘর সংসার হোক।

নদীর ধারে গুড়ের গাড়ী আসিয়াছে। দোকানীরা ভিড় করিয়া ঘিরিয়া বসিয়াছে। এখন গুড় কিনিয়া রাখিবে। গোটা বৎসর এই গুড় হইতে মুড়কী পাটালি তৈয়ারী করিয়া বেচিবে। দীনুও কিনিয়া ফেলিল কয়েকটা টিন।

পানুকে বলিল—ওহে, একটা কাজ যে ভারী ভুল হয়ে গেল। ভার বইবার বাঁকটা আনলে তুমি দুটো টিন নিতে, আমি একটা নিতাম। যাও, একটা টিন বাড়িতে রেখে তুমি বাঁকটা নিয়ে এস।

বাঁক আনিবার জন্য পানু ফিরিতেছিল, ময়ূরাক্ষীর তীরভূমি ধরিয়া বসতির পিছনে শর-জঙ্গলে ভরা পতিত ভূমি—তাহারই মধ্য দিয়া পায়ে-চলা পথ আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে। বাজারের পথটা ঘুরপথ। তা ছাড়া বাজার-পথে লোকের ভিড়। এই কারণেই পানু বাজারের পথের চেয়ে এই পথটাই পছন্দ করে বেশী। হা-ঘরেদের সঙ্গে দীর্ঘকাল বাস করিয়া এইসব কাপড়-জামা-পরা ঘর-বাঁধিয়া-বাস-করা লোকগুলিকে পানু অবিশ্বাসও করে, হিংসাও করে। এইসব গাঁইয়ারা ভয়ানক আদমী। বুধন বলিত—বহুৎ হুঁশিয়ারি এদের সঙ্গে। জঙ্গলে গাছের উপর চুপ করে বসে থাকে পাজীর সর্দার চিতাবাঘ, সাড়া না, শব্দ না, তোমাকে যেই কায়দায় পাবে, অমনি ঝপ করে লাফ দিয়ে পড়বে তোমার ঘাড়ে। ঘাড়টা ভেঙে প্রথমেই খাবে তোমার বুকটা ফেড়ে তোমার কলিজা।

ভয়টা পানুর মধ্যেও সঞ্চারিত হইয়াছিল। তাহা ছাড়া এই সব সভ্য মানুষগুলির মধ্যে সে তাহার বন্য বর্বর স্বভাব ও অভ্যাস লইয়া ঘোরাফেরা করিতে কেমন সঙ্কোচ, কেমন অস্বস্তিও অনুভব করে। লোকগুলি ইহারই মধ্যে জানিয়া ফেলিয়াছে যে, সে হা-ঘরের দলের লোক। দীনু তাহাকে বশ মানাইয়া নিজের ঘরে রাখিয়াছে, পেট-ভাতায় একটা অসুর পাইয়াছে, অসুরের শক্তি লইয়া দীনুর সংসারে কাজকর্ম করে। তাহাকে আঙুল দিয়া দেখায়। তাহাকে ডাকে। বলে—আমাদের ঘরে কাজ কর না কেন! পানুর ইচ্ছা হয়, দাঁত বাহির করিয়া গোঙাইয়া থাবা মারিয়া উহাদের নাকটা ছিঁড়িয়া আনে। বলে—আমি হা-ঘরে নেহি, দিদির ভাই আছে। নোকর নেহি। কিন্তু সে উপায় নেই। চারু বলিয়া দিয়াছে—খবরদার! ভাই-টাই এ সব বলিস না পানু। খবরদার, হাজার ফ্যাসাদ হবে!

তা ছাড়া ঘুরপথও পানু পছন্দ করে না। সোজা পথ যখন আছে তখন ঘুরপথে ঘুরিবে কেন? ঘুরুক উহারা, ওই সব গেঁইয়া ডরফোক্‌নারা ঘুরুক। বুধন বলিত—রামজী বলিয়াছেন, ঘুরপথে ঘুরিবে না। সোজা পথে চলিতে দেও আসে, দানো আসে, রাক্‌সস্‌ আসে, তুমি লড়াই

করিয়া তাহাকে নিধন করকে' চলিয়া যাও। এতনা বড়া দুনিয়া, বাপ রে বাপ, কত যে বড় তাহার হিসাবনিকাশ নাই, তুমি যত যত চলিবে, শেষ মিলিবে না ; চলো না, দেখো, ওই যে দূরে মনে হইতেছে, 'আকাশ আওর দুনিয়া' মিলিয়া গিয়াছে, সব শেষ হইয়া গিয়াছে, পৌঁছো না হুঁয়া! মনে তো তোমার হইতেছে, এই তো! কিন্তু চল তো এইটুকু পথ, চল, দৌড়! তুমিও চলিবে, ও-ও চলিবে। তুমি ধীরসে যাইবে তো ও চলিবে ধীরে। তুমি দৌড়াইবে, ও দৌড়াইবে। তুমি দাঁড়াইবে, ও দাঁড়াইবে। দুনিয়ার শেষ নাই। এই দুনিয়ায় আবার তুমি যদি ঘুরপাকে হাঁটো, তবে কতটুকু হাঁটিবে তুমি? ভগোয়ান দুনিয়াতে মানুষকে জনম দিলে, পাঠাইলে,—ঘুরে এস, দেখে এস তামাম দুনিয়া। জনম-জনম তাই ঘুরছি আর ঘুরছি আর ঘুরছি। এই ঘুরে ঘুরে যে জনমে তানাম দুনিয়া হাঁটা শেষ হবে—সেই জনমে খতম। আর তোমাকে জনম নিতে হবে না। ঘুরপথে হেঁটে—জনমের ফের বাড়াবে কেন? চলো, সোজাপথে চলো।

পানু তাই ঘুরপথ পছন্দ করে না। সে সোজাপথে ওই জঙ্গলের ভিতরে ভিতরে চলিয়াছিল। ঘাস-জঙ্গলটার ভিতর সাপ আছে, বিচ্ছু আছে, শিয়াল আছে, দুই-চারিটা ছোট জানোয়ার আছে, এ সবকে গেঁইয়ারা ভয় করে করুক, সে করিবে কেন? সে দিদির মায়ায় ফিরিয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া ওই গেঁইয়াদের মত ভয়ে ঘুরপথে ঘুরিবে নাকি? তাহা সে ঘুরিবে না। ভয়ও কিছুকে করিবে না। সীয়ারাম—হরিবোল বলিয়া সে নির্ভয়ে হাঁটিবে। গুরু আজ তাহাকে বলিয়াছে—কিছু না, তুই শুধু হরিবোল বলিবি। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল। যখন সুবিধা পাইবি তখনই বলিবি, হরিবোল—হরিবোল! বাস্, তাহাতেই হইবে। পরে আবার আসিয়া যাহা করিবার করিব। হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল, সীয়ারাম—সীয়ারাম।

শা—লা! থমকিয়া দাঁড়াইল পানু! কি একটা গোঙাইতেছে! আশেপাশে ভাল করিয়া দেখিয়া পানু হাসিয়া ফেলিল। শা—লা! একটা সজারু। উল্লুক বদমাস বুরবকের যেমন বে-আক্কেল তেমনিই দশা হইয়াছে! একটা ঘন শরঝোপের মধ্যে বসিয়া বোধ হয় পানুকে দেখিয়াই কাঁটা ফুলাইয়া বিক্রম দেখাইতে গিয়াছিল, এখন শরগাছ ও পাতার ফাঁকে কাঁটাগুলা আটকাইয়া না পারিতেছে পলাইতে, না পারিতেছে কাঁটাগুলা গুটাইতে। একটা কাঁটার গোল তালের মত উল্লুকটার অবস্থা হইয়াছে। সীয়ারাম—হরিবোল! পানু সঙ্গে সঙ্গে তুলিয়া লইল একটা মোটা দেখিয়া পাথর। ময়ূরাক্ষীর গর্ভে, বিশেষ করিয়া সাঁওতাল পরগণার প্রান্তদেশে পাথরের অভাব নাই। পাথরটা লইয়া অব্যর্থ লক্ষ্যে সে সজারুটার মাথায় মারিয়া দিল। খুব খানিকটা চীৎকার করিয়া সজারুটা মরিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঝোপের ওপাশ হইতে একটা কি ছুটিয়া পলাইল। হরি হরি! শেয়াল! না, ওটা বোধ হয় নেকড়ে বাঘ। ওটাই সজারুটাকে আক্রমণ করিয়াছিল, তাই ও কাঁটা ফুলাইয়া বিক্রম-ভরে চীৎকার করিতেছিল। যাকগে, পানু খুশীই হইল। সজারুর মাংস খুব ভাল, চমৎকার। ভালই হইয়াছে। গুরু আসিয়াছেন, চমৎকার মাংস খাইয়া খুশীই হইবেন। হাঁ হাঁ, নিশ্চয় খুশী হইবেন! লোকটি খাইতে খুব ভালবাসে। খুব যত্ন করিয়া তাহার দিদি তাহাকে খাওয়ায়। দুধ, কলা, ডাল, ঘিউ, চমৎকার চালের ভাত, লুচি খাইতে দিয়া হাতজোড় করিয়া বসিয়া থাকে।' পানু সজারুটা তুলিয়া লইল। মাথাটা চুর হইয়া গিয়াছে, টপটপ করিয়া রক্ত ঝরিতেছে। সেটা লইয়া বাড়ি আসিয়া একেবারে গুরুর পায়ের উপর ফেলিয়া দিল। হাসিয়া বলিল—আনলম হামি। মারলম। তুমি খাবে, দিদি খাবে।

কিসে কি হইল পানু বুঝিল না, গুরু চমকাইয়া লাফাইয়া উঠিলেন। গুরুর পায়ে গায়ে সজারুর রক্ত লাগিয়াছে, দিদির গায়েও ছিটকাইয়া লাগিয়াছে; গুরুর পা কোলে করিয়া দিদি তাহাকে যত্ন করিতেছিল। গুরু লাফাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—চণ্ডাল, চণ্ডাল, ব্যাধ—ব্যাটা ব্যাধ! তারপর দুই হাতে পানুকে মারিতে শুরু করিল।

দিদি হাউমাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল—ওরে, কি পাপকে ঘরে ঠাঁই দিলাম রে, ওরে বাবা রে! ওরে ধর্ম গেল রে!

হাতে মারিয়াও গুরুর তৃপ্তি হইল না, একগাছা ঝাঁটা পড়িয়া ছিল তাই দিয়া পিটিতে শুরু করিল। এবার প্রচণ্ড ক্রোধে চীৎকার করিয়া উঠিল পানু, তারপর গুরুর ন্যাড়া মাথায় বসাইয়া দিল এক কিল। হয়তো আরও প্রহার সে করিত, কিন্তু পিছন হইতে দীনু হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিল।

—হাঁ-হাঁ পানু—হাঁ-হাঁ।

পানু ঘুরিয়া তাকাইল। বলিল—হামাকে মারছে।

—গুরু, গুরু, পানু গুরু।

—হামাকে মারলে। ঝাঁটাসে মারলে।

গুরু চীৎকার করিয়া উঠিল, দীনুকে বলিল—হারামজাদা চণ্ডাল কখনও বৈষ্ণব হয়? আমার ধর্ম গেল—মালাতে লাগল রক্তের ছিটে! আর তোরা? তোরাও তা হলে এমনি ভাবে অখাদ্য কুখাদ্য খাস। রাধাশ্যাম! হরি হরি হরি! ওরে ব্যাটা চণ্ডাল!

গুরু আবার পানুকে প্রহার শুরু করিয়া দিল।

পানু এবার আর মানিল না, গুরুকে প্রচণ্ড ঠেলা দিল, গুরু বেচারা দাওয়া হইতে একেবারে সশব্দে উঠানের উপর আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেল। শুধু পড়িয়াই গেল না, কামানো মাথাটা একটা খোলার কুচিতে কাটিয়া মাথা মুখ রক্তাক্ত করিয়া দিল।

দিদি অকস্মাৎ উনানশালের শিল-নোড়ার নোড়াটা পাগলের মতই পানুর কপাল লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া মারিল। নোড়াটা ছিল ভারী, চারু মেয়েছেলে—তাই পানুর কপাল মাথা বাঁচিয়া গেল, নোড়াটা আসিয়া পড়িল তাহার পায়ের উপর। একটি আঙুলের মাথা ছেঁচিয়া গেল। পানুর সে আঙুলটার আর নখ গজাইল না কোনদিন। ব্যাপারটা ঘটিয়া গেল মুহূর্তে। দীনু হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

* * *

তারপর—সেই দিনই—পানুর আপনজনের স্বপ্ন ভাঙিয়া চুরমার হইয়া গেল। যে দিদির মমতায়, যাহাকে ফিরিয়া পাইবার জন্য বুধন-বাবার, হা-ঘরে মায়ের স্নেহনীড় হইতে পলাইয়া আসিল, সেই দিদিই তাহাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিল। কুকুরের মত খেদাইয়া দিয়াছিল তাহাকে। ঝগড়াটা তখন থামিয়াছে। গুরু স্নান করিলেন, গঙ্গাজল স্পর্শ করিলেন—তবু তাঁহার রাগ গেল না। তিনি জিনিসপত্র গুছাইতে আরম্ভ করিলেন—আজই চলিয়া যাইবেন গঙ্গাস্নানের জন্য। গঙ্গাস্নান না করিয়া জল পর্যন্ত মুখে দিবেন না!

চারু প্রথমটা বসিয়া বসিয়া কাঁদিল! দীনু চুপ করিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া ছিল। পানুও কেমন হইয়া গিয়াছিল; ভাবিতেছিল, এ কি হইল? এ কি করিল সে? তাহার দিদি—! হঠাৎ চারু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আঙুল দেখাইয়া বলিল—মূর্তিমান পাপ, নরক—নরক! দূর কর—ওকে দূর কর বাড়ি থেকে।

পানু আর থাকিতে পারিল না, হাতজোড় করিয়া বলিতে গেল—আর হামি করবে না দিদি

এমন কাম—

পানুর বিনয় চারুর ক্রোধকে সবিক্রমে উৎসাহিত হইয়া উঠিবার সাহস দিল, সে মুহূর্তে জ্বলিয়া উঠিল। পাশেই পড়িয়া ছিল একগাছা ঝাঁটা, সেই ঝাঁটাগাছটা তুলিয়া লইয়া পানুকে পাগলের মত প্রহার আরম্ভ করিয়া দিল, মাথায় মুখে বুকে, যেখানে-সেখানে, আর মুখে শুধু বলিল—বেরো বেরো বেরো বেরো!

ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিল দীনু। ঝাঁটাগাছটা কাড়িয়া লইয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল —করছ কি?

চারু চীৎকার করিয়া উঠিল—ওকে নিয়ে কি স্বগ্যে যাব আমি? যে পাপে আমি ডুবেছি, তা থেকে তরব কি করে? তুমি বেটাছেলে, তোমার পাপ নাই—পাপের ভয়ও নাই। আমি? গুরু নইলে তরাবে কে?

সে মাথা খুঁড়িতে আরম্ভ করিল। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে।

চারু মাথা খুঁড়িয়া সে এক কাণ্ড করিয়া তুলিল। এখুনি বার কর। ওকে এখুনি বার কর বাড়ি থেকে। নইলে আমি মরব—মরব, মাথা খুঁড়েই মরব।

দীনু বলিল—পানু ভাই, এ বাড়িতে তোমার আর জায়গা হবে না।

পানু তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া চলিয়া আসিয়াছিল। তাহার বুকে একটা প্রচণ্ড বিদ্বেষ, ভীষণ আক্রোশ। যেমন আক্রোশ লইয়া সে কয়েক বৎসর পূর্বে বাহির হইয়াছিল অন্ধকার রাত্রে—সাহেবের কাছে নালিশ জানাইতে। শুধু আসিবার সময় তুলিয়া লইল কুড়ুলখানা।

কনকনে শীতের রাত্রি। পানু লোকালয় ছাড়িয়া আসিয়া বসিয়াছিল ময়ূরাক্ষীর তট-ভূমিতে। ধূ-ধূ করা বালুচর, ওপারে ঘন জঙ্গল, আকাশে ছিল আধখানারও কিছু বেশী আকাশের চাঁদ। খানিকটা রাত্রি হইতেই শীতের ময়ূরাক্ষীর ছিলছিলে জলের ধারা হইতে কুয়াশা উঠিতে আরম্ভ হইল। রাত্রি দুপুরের সময় ভিজা বালির বুক হইতেও কুয়াশা জাগিল। বালুচরের উপর এখানে ওখানে শরের ও কাশের ঝোপ, পাতাগুলা পাকিয়া হলুদ হইয়া আসিয়াছে, মাথায় দুলিতেছে সাদা ফুল। মধ্যে মধ্যে শিয়ালগুলা ছুটিয়া বেড়াইতেছিল। পানুর এসব দিকে ভ্রূক্ষেপ ছিল না। জনহীন প্রান্তরে তাহার ভয় নাই, নির্জন সুবিস্তীর্ণ বালুচরের বুকের কুয়াসা ও আকাশের চাঁদের আলোর কোন আবেদন তাহার মনের কাছে নাই। ঘন শীতের তীক্ষ্ণতাও তাহার গায়ে তেমন বিঁধিতেছিল না, দীর্ঘ দিনের যাযাবর-জীবনে এসবকে সে জয় করিয়াছে। সমগ্রভাবে এই পারিপার্শ্বিক কেবল তাহাকে বেদনাতুর করিয়া তুলিয়াছিল সেই যাযাবর সম্প্রদায়ের জন্য। মনে পড়িতেছিল বুধনকে, মনে পড়িতেছিল সেই বুড়ীকে। কেন? কেন সে তাহাদের ত্যাগ করিয়া আসিল? তাহারা তাহাকে এমন করিয়া খেদাইয়া দিতে পারিত না। মনে বার বার ইচ্ছা হইতেছিল, সে এই রাত্রে এখনি আবার তাহাদের সন্ধানে যাত্রা শুরু করে। পথে পথে বৎসরের পর বৎসর ঘুরিয়া তাহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিবে। পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিবে। কিন্তু প্রতিবারই পরক্ষণেই মন বলিয়াছিল, না—না—না। কোন্ মায়া, কিসের মায়া, সে সেদিনও বুঝে নাই আজও বুঝে না। শুধু সেদিন মনে হইয়াছিল, গ্রামখানি বড় ভাল। কেমন ঘর দুয়ার, কত আরাম, কত জিনিস এখানে আছে। মানুষদের জামা-কাপড় পরিয়া কত সুন্দর দেখায়! এখানে এমনি ঘর বাঁধিবে, জিনিসপত্রে ঘর ভরিয়া তুলিবে। এমনি ভাল পরিষ্কার কাপড়-পরা টুকটুকে একটি মেয়েকে লইয়া ঘর করিবে। জামা-কাপড় পরিয়া এমনি ভদ্র মানুষ হইবে। আজ মনে হয়, সেদিন যে

সে যায় নাই, ভাল কাজই করিয়াছিল। আজ চারিপাশে সে একটা রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছে। বাগান, পুকুর, জমি-জমা, দুই-দুইটা স্ত্রী, গরু, বাছুর—কত সম্পদ তাহার! দুনিয়াতে কাহাকেও সে ভ্রূক্ষেপ করে না। কাহাকেও না।

সমস্তই তাহার উপর গাছের দেবতার দয়া।

সেই রাত্রে কি করিবে মনঃস্থির করিতে না পারিয়া সে গিয়াছিল বৃক্ষদেবতার কাছে। কিছু-দিন আগে জঙ্গলে গিয়া যে দেবতাকে সে আবিষ্কার করিয়াছিল, সেই স্থানের উদ্দেশ্যে। দেবতার কাছে সে বলিতে চাহিয়াছিল, হে বাবা, হে দেবতা, তুমি বলিয়া দাও, আমি কি করিব? যদি বুধনের কাছে যাইতে বল, তবে স্বপ্নে বলিয়া দাও তাহাদের পাত্তা। কোথায় কত দূরে তাহারা এই শীতের রাত্রে তাঁবু ফেলিয়াছে বলিয়া দাও।

কনকনে ঠাণ্ডা ময়ূরাক্ষীর জল। সেই জল পার হইয়া পানু বনের প্রবেশমুখেই শুনিল একটা অদ্ভুত শব্দ। ক্যাঁ-ক্যাঁ করিয়া কোন একটা জানোয়ার চেঁচাইতেছে। শব্দ শুনিবামাত্র সে বুঝিল, কোন শক্তিমান জানোয়ার অপর কোন দুর্বলকে ধরিয়াছে। জানোয়ারের আওয়াজ সে চেনে। শুধু চেনে নয়, হা-ঘরেদের কাছে থাকিয়া সে বহু জানোয়ারের ডাক নকল করিতেও পারে। কিন্তু মরণ যখন চাপিয়া ধরে, তখন সব জানোয়ারের চীৎকারই এক রকম। মানুষ মরণকালে গোঙায়, সে গোঙানি পর্যন্ত ঠিক এই রকম।

পানুর চোখের উপর সব ভাসিতেছে।

ঘন জঙ্গলের ভিতরে জ্যোৎস্নার আলো আসিয়া পড়িয়াছে—চিতাবাঘের গায়ের গুলের মত যেন একটা প্রকাণ্ড কালো বাঘের গায়ে সাদা দাগের ছাপ। জঙ্গলের ভিতর দিয়া সন্তর্পণে সে আগাইয়া চলিয়াছিল। হাতের কুড়ুলটার মুঠা যেন লোহার মুঠা।

জানোয়ারটার মরণ-চীৎকার ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে।

হঠাৎ পানু থমকিয়া দাঁড়াইল। সম্মুখেই সেই বিরিখ-দেওতা বিরাট বনস্পতি। দেওতাকে প্রণাম করিয়া চুপি চুপি সে বলিল—কোথায় বাপা, কোথায় গরীবের উপর অত্যাচার হইতেছে বলিয়া দাও। দেখাইয়া দাও।

দেওতা মিথ্যা নয়। সঙ্গে সঙ্গে দেখাইয়া দিলেন। জানোয়ারটা হঠাৎ আবার তারস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। বোধ করি সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া শেষ চেষ্টা, শেষ সাহায্য প্রার্থনা করিতেছিল।

নিকটেই। খুব কাছে।

দ্রুতপদে পানু আগাইয়া গেল।

হাঁ। এই যে। এইখানে। সে স্থির হইয়া দাঁড়াইল। মাটির ভিতর হইতে শব্দ উঠিতেছে। তবে? হাঁ, ঠিক বুঝিয়াছে পানু। সাপ! গর্তের মধ্যে মুখ ঢুকাইয়া জানোয়ারটাকে ধরিয়াছে। বড় সাপ। পাহাড়ে চিতি। অন্যথায় এত বড় জানোয়ারকে ধরিবে কি করিয়া? অন্ধকারের মধ্যে পানুর চোখ জলজল করিয়া জ্বলিতেছিল। শয়তান! ওই গুরুঠাকুর! হাঁ, ওই গুরু-ঠাকুর। শয়তানের মুখ বাহিরে থাকিলে রক্ষা ছিল না। শয়তান পাক মারিয়া তাহাকে বেড়িয়া ধরিয়া পিষিয়া ফেলিত। 'শয়তানের এখন মুখ বাহির করিবার উপায় নাই। আচ্ছা, বহুৎ আচ্ছা হইয়াছে।

পানু বেশ ঠাওর করিয়া দেখিল, কোনখানে অজগরটা মুখ ঢুকাইয়াছে। হাঁ, এই যে। পাশে দাঁড়াইয়া পানু কুড়ুলটা দুই হাতে বাগাইয়া ধরিল। তারপর মাথার উপরে তুলিয়া দেহের সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া কোপ বসাইয়া দিল। সবল জোয়ান পানু—তাহার উপর অস্ত্রখানা

ধারালো। এক কোপে সাপটা দুইখানা হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় হইতে লেজের দিকটা কিলবিল করিয়া বাঁকিয়া যেন একটা বিদ্যুৎ-প্রবাহ বহিয়া গেল। সে আক্ষেপ যেমন-তেমন নয়। যেন একটা ঝড়ের ওলট-পালট। পানু আনন্দে নাচিতে লাগিল। শয়তানকে সে বধ করিয়াছে—শয়তানকে সে বধ করিয়াছে।

ওই শয়তানকে মারার জন্যই বৃক্ষ-দেওতা তাহাকে তাহার মঙ্গলের পথ দেখাইয়া দিয়াছিলেন।

সাপটার ছিন্ন দেহখানার আক্ষেপ স্তব্ধ হইবার পর সাপটাকে দেখিতে দেখিতে পানুর খেয়াল হইল, পাহাড়ে চিতিটা খুব বড় না হইলেও ছোট নয়। চর্বি অনেকখানি আছে। হা-ঘরের দলে থাকিতে সাপ মারিয়া চর্বি বাহির করিতে শিখিয়াছিল। ভঁইষার দুধ হইতে ঘিউ তৈয়ারী করিয়া সেই ঘিউয়ের সঙ্গে চর্বি ভেজাল দিতে হা-ঘরেদের ওস্তাদী হাত। পাহাড়ে চিতির—ধামন সাপের মাংস খায় তাহারা। আঃ, আজ যদি তাহার ভঁইষাটা থাকিত, তবে এই চর্বিটা লইয়া বহুত মুনাফা করিতে পারিত। কমসে কম তিন-চার টাকা।

হঠাৎ তাহার মনে হইল, সে যদি একটা ভঁইষা কেনে, তবে কেমন হয়? ময়ূরাক্ষীর ধারে অফুরন্ত ঘাস। ঘাস খাইয়া ভঁইষার বাঁট এই মোটা হইয়া উঠিবে, প্রচুর দুধ দিবে। সে দুধ বেচিবে, ঘিউ করিবে—বেচিবে। মুনাফা হইবে। তাহার উপর এই জঙ্গলে গাছের দেবতা তাহার উপর সদয়, তিনি তাহাকে এমনি করিয়া এই সব চর্বিওয়ালা শয়তানের সন্ধান দিবেন, সে তাহাদের মারিয়া চর্বি বাহির করিয়া লইবে। তারপর ঘিউয়ের সঙ্গে মিশাইয়া বিক্রয় করিবে। দুনা মুনাফা হইবে। ভঁইষাটার বাচ্ছাটা বড় হইবে, সেটাকে বেচিয়া দিবে। তাহাতে মুনাফা হইবে। আবার একটা কি দুইটা ভঁইষা কিনিবে। দুইটা—চারটা—আটটা—দশটা, এক পাল ভঁইষা।

পানু পথ দেখিতে পাইল। দেওতা তাহাকে পথ দেখাইয়া দিলেন। আপন গেঁজলেটা সে পরীক্ষা করিয়া দেখিল। টাকাগুলি বাহির করিয়া সাজাইল। গুনিয়া দেখিল। কয়েক মাস দীনুর কাছে থাকিয়া সংখ্যা-বিজ্ঞান আবার তাহার মনে পড়িয়া গিয়াছে। একশো পর্যন্ত সে বেশ গুনিতে পারে।

পঞ্চান্ন টাকা। সে ভাবিতে লাগিল। হঠাৎ সে উঠিয়া দাঁড়াইল। হইয়াছে, পথ পাইয়াছে সে।

এখান হইতে দশ ক্রোশ দূরে জানোয়ারের হাট। পানু এই পথে যাতায়াত করিবার সময় কয়েকবারই সে হাট দেখিয়াছে। পঞ্চাশ টাকায় বেশ একটা ভঁইষার গাই মিলিবে।

কয়েক দিন পরেই পানু ময়ূরাক্ষীর চরের শরবনের শর কাটিয়া গাছের ডাল কাটিয়া একটা চালা তুলিয়া ফেলিল। তারপর একদিন হাট হইতে মহিষ কিনিয়া ফিরিল। চালাঘরের এক পাশে সবৎসা মহিষটাকে বাঁধিয়া অন্য পাশে সে বাসা গড়িল। তাহার জীবনের সে দিনগুলি মনে আছে। মাথায় দুধের হাঁড়ি লইয়া বাজারে চারুর ঘরের সামনে দিয়া হাঁকিয়া যাইত—দুধ—দুধ লিবে! কয়েক দিন জমাইয়া ঘিয়ের ভাঁড় লইয়া যাইত—ঘিউ—ঘিউ লিবে! ভঁইষা ঘিউ!

তেরো

পানু ভঁইষাটার নাম রাখিয়াছিল লছমী। সত্য সত্যই পানুর ভাগ্যে লক্ষ্মী হইয়া আসিয়াছিল। লছমী বোধ হয় কোন গরীবের ঘরে প্রতিপালিত হইয়াছিল; হাড়-পাঁজরা বাহির করা মহিষটাকে কেহই পছন্দ করে নাই। পছন্দ করিয়াছিল পানু। দামেও কম হইয়াছিল। পানু মহিষ চিনিত, সে দেখিয়াই বুঝিল—বুড়ী দেখাইলেও সে বুড়ী নয়। বয়স কম। কোন বাবুভেইয়ার ঘরের মহিষ, তাহারা দুধ খায়, গরু-মহিষকে খাইতে দেয় না। লছমীর কোলে একটা মাদী বাছুর। লছমীকে কিনিয়া আনিয়া ময়ুরাক্ষীর চরে বাসা বাঁধিল। সকালে উঠিয়াই লছমীকে লইয়া বাহির হইত। ফিরিত সন্ধ্যায়। চরভূমির নরম ঘাস খাইয়া লছমী ইচ্ছামত বিচরণ করিত।

প্রথম লছমী দুধ দিত চার সের। দ্বিতীয় মাসে পাঁচ সের পর্যন্ত উঠিল। ফাল্গুন-চৈত্রে লছমী চোখ বুজিয়া দাঁড়াইয়া রোমন্থন করিত। আর পানু তাহার মোটা আঙুল দিয়া নরম বাট টানিয়া দুধ দোহন করিত;—একবারে এক দোহনে সাত সের দুধ লছমী ঢালিয়া দিত। সেই দুধ পানু বাজারে বেচিয়া আসিত। অবিক্রীত দুধ মথিয়া মাখন তুলিয়া ঘি তৈয়ারী করিত, নিজে পান করিত। দ্বিপ্রহরে ময়ুরাক্ষীর জলে লছমীকে বসাইয়া পরম যত্নে তাহার দেহের কাদা ক্লেদ ধুইয়া মুছিয়া স্নান করাইয়া দিত। তারপর মাখাইয়া দিত নারিকেলের তেল। হৃষ্টপুষ্ট নধর দেহ হইতে তেল গড়াইয়া পড়িত, রোদের ছটা লাগিয়া চকমক করিত। বৈকালেও গরু-মহিষ দুহিবার রীতি আছে, সকলেই দোহন করে। কিন্তু পানু কোনদিন লছমীকে বৈকালে দোহন করিত না। ও ভাগটা ছিল মংলীর। মংলী তাহাকে দিবে মঙ্গল।

কল্পনা তাহার মিথ্যা হয় নাই। লছমী বাঁচিয়াছিল দশ-এগারো বছর। মংলীর পরে আরও চারিটা সন্তান সে দিয়া গিয়াছে, দুইটা মরদ বাছুর—দুইটা বেটী। লছমীর দুধে ঘিয়ে সে অনেক পয়সা পাইয়াছে। মংলীও তাহার মঙ্গল করিয়াছে। মংলী যখন তরুণী হইয়া উঠিল, তখন সে তো তাহার প্রেমেই পড়িয়াছিল। মংলীর গলা ধরিয়া বসিয়া থাকিত, চুমা খাইত।

দীনু তাহার কাছে নিত্য আসিত। সে-ই তাহাকে উপদেশ দিয়া পথ ধরাইয়া দিয়াছে। সে-ই বলিয়াছিল—তুমি লক্ষ্মীমান পুরুষ পানু। কিন্তু ঘর নইলে লক্ষ্মী বাস করবেন কোথায়? তুমি ঘর কর। এই শর দিয়ে বাঁধা চালা, বর্ষার সময় এ চালা তো থাকবে না। তা ছাড়া এটা হল ময়ুরাক্ষীর চর, এখানে বান উঠবে যে!

ঘর! ঘর! ঘরেই সে জন্মিয়াছে, ঘরেই সে চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্যন্ত কাটাইয়াছে। ওই ঘরের টানেই সে হা-ঘরেদের ছাড়িয়া আসিয়াছে।

পানু মহা উৎসাহে উঠিয়া দাঁড়াইল—হ্যাঁ, ঘর করব। ঘর! ঘর! কয়েক মাসের মধ্যেই পানুর বাংলা বুলি আবার বেশ রপ্ত হইয়া আসিয়াছে।

চৈত্র মাস। ময়ুরাক্ষীর চরভূমিতে বেশ ঝিরঝিরে হাওয়া বহিতেছিল—সন্ধ্যার পর শুক্লপক্ষের চতুর্থী কি পঞ্চমীর চাঁদ ঠিক সম্মুখে পশ্চিম-আকাশে; জ্যোৎস্নাটা পানুর চালার সামনেই আসিয়া পড়িয়াছিল। সেই আলোতেই পানু দেখাইল—এইখানে এমনিভাবে সে ঘর করিবে।

দীনু হাসিয়া বলিল—তারপর বর্ষায় যখন বান আসবে?

হাঁ। বর্ষা! বান! কথাটা তাহার মনে হয় নাই! তবে? তবে কোথায় ঘর করিবে সে? সে দীনুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—তবে?

দীনু বলিল—উঁচু জায়গা দেখে গাঁয়ের ও-মাথায় ঘর কর।

পরদিনই পানু গ্রামের ও-পাশে জায়গা দেখিয়া পছন্দ করিল। পছন্দ হইল যখন, তখন আর অপেক্ষা কিসের? বাজারের দোকান হইতে কোদাল, টামনা, শাবল কিনিয়া সে কাজ আরম্ভ করিয়া দিল। লছমী-মংলীকে বলিল—যা, চরিয়া আয়। বেশী দূর যাস না যেন। খবরদার!

লছমী-মংলীকে ছাড়িয়া দিয়া সে মাটি কোপাইয়া ফেলিল। টিন-ভর্তি জল আনিয়া মাটির উপরে ঢালিয়া দিল। কাদা ভিজিয়া নরম হইলে আবার জল দিয়া কাদা করিয়া দেওয়াল দিতে আরম্ভ করিবে। বাস, দুই-কুঠারী ঘর। একটায় সে থাকিবে—অপরটায় থাকিবে লছমী ও মংলী। বাস।

ঠিক এই সময়েই একটা লোক আসিয়া হাজির হইল। জমিদারের পেয়াদা। ইহারই মধ্যে স্থানীয় কাছারিতে সংবাদ চলিয়া গিয়াছে। গম্ভীরভাবে লোকটা এই দিকেই আসিতেছিল। পানু দেখিয়াও কিছু বুঝিতে পারে নাই। লোকটার সঙ্গে তাহার পরিচয়ও আছে। ময়ূরাক্ষীর চরে ওই চালাটার জন্য একবার সে আসিয়া খাজনা দাবী করিয়াছিল। পানু একটা টাকা বিনা আপত্তিতেই তাহাকে দিয়াছিল। আরও দুই চারিবার আসিয়া দুধ লইয়াও গিয়াছে। সেও পানু দিয়াছে। পানু অবশ্য জানিত না যে, ময়ূরাক্ষীর ওই চরটা বেহার ও বাংলা দেশের সীমারেখা, ওটা কোন জমিদারেরই জমিদারি এলাকাভুক্ত নয়। লোকটা পানুর কাছে পড়িয়া-পাওয়া চোদ্দ আনার স্থলে এক টাকাই লইয়া গিয়াছে।

আজ সে খপ করিয়া পানুর হাত চাপিয়া ধরিল—চল কাছারিতে।

পানু প্রথমটা চমকিয়া উঠিল! তারপর বলিল—কাহে?

—কাহে? এখানে মাটি কুপিয়ে ঘর বানাবি, তোর বাবার জায়গা?

পানু বলিল—আমি খাজনা দোব।

—আরে, খাজনা দিব! খাজনার কথা কিসের? বিনা হুকুমে মাটিতে কোপ মারলি কেন তুই?

—কেন, দোষ কি হল? জায়গা তো পড়েই আছে।

—হাঁ, হাঁ, বিলকুল তামাম দুনিয়া পড়ে আছে। পড়ে আছে বলে তু যা খুশি করবি? চল কাছারিতে। লোকটা একটি হেঁচকা টান মারিয়া বসিল। পানু ইহাতেও কিছু বলে নাই। বলিল—চল, চল, তোমার কাছারিতেই চল।

—আগে পেয়াদার রোজ দে, পেয়াদার রোজ!

—সেটা কি?

—আমার পাওনা। তুকে ডাকতে এসেছি—তার মজুরী দে।

—কত?

—আট আনা।

তৎক্ষণাৎ আট আনা পয়সা পানু তাহাকে দিয়া দিল। তাহার সঞ্চয় সম্বল সব তাহার সঙ্গেই কোমরের গেঁজলেতে থাকে। পেয়াদাটা এবার নরম হইয়া বলিল—চল, তুকে সুবিধে করে দোব।

কাছারির নায়েব তাহাকে দেখিবামাত্র বলিল—বস বেটা, ওইখানে বস। কার হুকুমে মাটি কুপিয়েছিস তুই ?

পানু বলিল—খাজনা দোব আমি।

—আগে নিকাল পাঁচ টাকা জরিমানা বিনা হুকুমে মাটি কুপিয়েছিস তার জন্যে।

—পাঁচ টাকা ?

—হাঁ হাঁ।

পানুর কাছে পাঁচটা টাকার অনেক মূল্য। লছমী সাত সের দুধ দেয়, সাত সের দুধের দাম এখানে সাত আনা পয়সা। সাত আনার মধ্যে দুই তিন আনা তাহার নিজের খাইতে খরচ হয়। দৈহিক চার আনা হিসাবে কুড়ি দিনে পাঁচটা টাকা সে পায়। সে নিতান্ত অপরাধীর মতই চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

গর্জন করিয়া উঠিল পেয়াদাটা—নিকাল, নিকাল রে! বলিয়া সে নায়েবকে বলিল—ভারি হারামী শালা। গেঁজলেতে এক গেঁজলে টাকা হুজুর।

নায়েব বলিল—বাঁধ বেটাকে। ওই খুঁটির সঙ্গে বাঁধ।

'খুঁটির সঙ্গে বাঁধ'! মুহূর্তে তাহার মনে পড়িয়া গেল থানার থামে আবদ্ধ তাহার বাপের ছবি। থামের সঙ্গে আবদ্ধ তাহার বাপ পশুর মত চীৎকার করিয়া থামের গায়ে মাথা ঠুকিবার চেষ্টা করিতেছে। অদ্ভুত চোখের দৃষ্টি! চোখ দুইটা যেন দুইটা রক্তের ঢেলার মত ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া আসিবে। জমাদার নীরবে তাহার পিঠে বেতের পর বেত চালাইতেছে।

ঠিক সেই মুহূর্তটিতেই দূতটি তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল—নিকাল—

পরের কথা তাহার মুখেই থাকিয়া গেল। পানু হঠাৎ পাগল হইয়া উঠিল, কালাপাহাড়ের মত ভীষণ হিংস্র উন্মত্ত শক্তি প্রয়োগে সে তাহার গালে কষাইয়া দিল প্রচণ্ড এক চড়। চড় খাইয়া পেয়াদাটা 'বাপ' বলিয়া পানুকে ছাড়িয়া দিয়া টলিতে আরম্ভ করিল। পানু তখন উন্মত্ত। সঙ্গে সঙ্গে সে আবার বসাইয়া দিল লোকটাকে এক কিল। লোকটা এবার নির্ঘাত মাটির উপর পড়িয়া গেল। নায়েব তখন আসন ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িয়াছে। নিজের নিরাপত্তার জন্য বারান্দা হইতে সে ঘরের দরজার দিকে অগ্রসর হইতেছিল, কিন্তু মুখে চীৎকার করিতে থামে নাই, বলিতেছিল—ধর—ধর—

পানু চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, ধরিবার লোক কেহ নাই। লোকের মধ্যে একটা নীচু-জাতীয় নগ্‌দী ছিল—সেও পিছু হঠিতেছে। পানুর সাহস বাড়িয়া গেল। শুধু সাহস নয়, পৈশাচিক উল্লাসও সঙ্গে সঙ্গে জাগিয়া উঠিল। সে লাফ দিয়া ধরিল নায়েবকে। লোকটার নধর চেহারার সঙ্গে গুরুঠাকুরের মিল আছে। নায়েব লোকটি কিন্তু চতুর! পানু তাহার হাত ধরিবামাত্র সে উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল, আছাড় খাওয়ার সম্ভাবনা হইতে এবং সামনের দিকে অর্থাৎ মুখে চোখে বুকে পেটে মার খাওয়ার হাত হইতে বাঁচিবার চেষ্টা করিল। পানুর কিন্তু পিঠ—পিঠই সই। ক্ষাত্র রণনীতি সে জানেও না, মানেও না—বরং পিঠ দেখিয়া কিল মারিবার জন্যই প্রলুব্ধ হইয়া উঠিল। নায়েবের পিঠের উপর চাপিয়া বসিয়া চালাইতে আরম্ভ করিল কিলের পর কিল। লোকটার পিঠও অত্যন্ত নরম। কিল মারিয়া আরাম আছে। কিন্তু সাধ মিটিবার পূর্বেই পানুকে উঠিতে হইল। ওদিকে নগদীটা চীৎকার করিতেছে।

—মেরে ফেলালে গো! মেরে ফেলালে! কিল মেরে ফাটিয়ে দিলে গো!

পানু বুঝিল এইবার লোক জমিবে। সে নায়েবের পিঠ হইতে উঠিয়া গোটাকয়েক লাথি মারিয়া ছুটিতে আরম্ভ করিল। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া সে ময়ূরাক্ষীর তটভূমিতে আসিয়া উঠিল।

তারপর মুখে ডাকিতে আরম্ভ করিল মহিষের ডাক। বুকে মনে সে বলিতেছে—লছমী—মংলী! লছমী—মংলী! মুখে ডাকিতেছে—আঁ—আঁ—আঁ! অবিকল মহিষের আওয়াজ। কয়েক মুহূর্ত পরেই ওদিকের কতকগুলা শরবনের অন্তরাল হইতে সাড়া আসিল—আঁ—আঁ—আঁ। ঠিক পানুর ডাকের প্রতিধ্বনি। পানুর ডাকের মধ্যে যে ব্যগ্র আকুলতা, লছমীর ডাকের মধ্যেও সেই আকুলতা। এ যেন ডাকিতেছে—লছমী—মংলী—ওরে—ওরে ছুটিয়া আয়—ছুটিয়া আয়। লছমী ছুটিয়া আসিতেছে, আর যে ডাকে সাড়া দিতেছে তাহাতে বলিতেছে—যাই—যাই—যাই।

পানু ইতিমধ্যেই কর্তব্য ঠিক করিয়া লইয়াছে। নায়েব এখানকার মালিক, ঠাকুর। ঠাকুরকে সে ঠ্যাঙাইয়াছে—এইবার ঠাকুর ক্ষেপিয়া উঠিবে। আর ঠাকুরের প্রসাদভোজী অনেক। দারোগার সেপাই আছে। নায়েবের আরও অনেক পাইক নগদী আছে। দারোগার উপর সাহেব আছে, নায়েবের উপরে জমিদার ঠাকুর আছে। এখানে আর নয়। সে ময়ূরাক্ষীর চরভূমি ধরিয়া ওই ডাক ডাকিতে ডাকিতে ছুটিতে আরম্ভ করিল। লছমীও ছুটিল, তাহার পিছনে মংলী।

বহুক্ষণ ছুটিয়া সে যখন থামিল, তখন চারিদিক অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। আকাশের চাঁদ ক্রমশ স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে।

সর্বাঙ্গ দিয়া তাহার ঘাম ঝরিতেছিল। বুকটা উঠিতেছিল পড়িতেছিল কামারের হাপরের মত। সে বালির উপর বসিল। লছমী-মংলীও ক্লান্ত হইয়াছিল, তাহারাও বসিল। অনেকক্ষণ পর উঠিয়া ময়ূরাক্ষীর জলে স্নান করিয়া চরভূমির উপর লছমীর ঠিক পাশেই শুইয়া পড়িল।

ক্লান্ত শরীর। মন উদ্‌ভ্রান্ত। কোথায় যাইবে? কোনখানে, কোন রাজ্যে গিয়া সে সুখে শান্তিতে থাকিতে পাইবে?

হে দেওতা, দেখাইয়া দাও সেই দেশ। যেখানে এমন করিয়া দারোগা জমাদারে বেত মারিয়া পিঠের চামড়ায় দাগ কাটিয়া দেয় না, যেখানে নায়েবের পেয়াদা আসিয়া কাছারিতে ধরিয়া লইয়া নায়েবের হুকুমে সর্বস্ব কাড়িয়া লইতে চায় না, সেই দেশ দেখাইয়া দাও। সে কোন পাপ, কোন অন্যায় করিবে না। সে কেবল একখানা ঘর গড়িয়া লছমী এবং মংলীকে লইয়া থাকিবে। লছমীর দুধ দুহিয়া, দুধ ঘি তৈয়ারী করিয়া বেচিবে। দুধ ঘি বেচিয়া টাকা হইলে, সে শুধু এক টুকরো জমি কিনিবে। ন্যায্য দাম দিয়া এক টুকরা জমি। জমির টুকরাটা চষিয়া সে ফসল বুনিবে। সে ফসল হইতে তোমার ভোগ দিবে, নিজে খাইবে। যাহার নাই—সে চাহিলে দিবে। এ সব দিয়াও যদি থাকে তবে সেই উদ্বৃত্তটা বেচিবে।

হে দেওতা, যদি তুমি দয়া কর, মুখ তুলিয়া চাও, তবে সে সাদীও করিবে। বেশ একটি শক্তসমর্থ মেয়েকে 'বিয়া' করিবে। সে তাহার সঙ্গে খাটিবে। তাহাকে সে শাড়ী কিনিয়া দিবে, শাঁখা, গলায় মালা তাও কিনিয়া দিবে। তাহার কোলে আসিবে বেশ মোটাসোটা ছেলে। 'ওঁয়া—ওঁয়া' শব্দে কাঁদিবে। লছমীর দুধ খাইবে। ততদিনে মংলীরও বাচ্চা হইবে। মংলীর দুধই সে খাইবে। লছমীর দুধ তাহার—শুধু তাহার। লছমীর দুধের ভাগ সে কাহাকেও দিবে না।

হঠাৎ সে উঠিয়া বসিল।

বড় ক্ষুধা পাইয়াছে। পেট অনেকক্ষণ হইতেই জ্বলিতেছে। লছমীর দুধ তাহার, লছমীর দুধের ভাগ কাহাকেও দিবে না—এই কথা মনে করিতে গিয়া ক্ষুধার কথা মনে পড়িয়াছে। লছমীর দুধ আছে।' ক্ষুধার জন্য ভয় কি? লছমীকে গুঁতা দিয়া উঠাইয়া সে মংলীকে দুধ

খাইতে ঠেলিয়া দিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই মংলীর মুখের দুই পাশ গড়াইয়া দুধ ঝরিয়া পড়িল। পানু এবার মংলীকে ঠেলিয়া দিয়া নিজেই লছমীর বাঁটে মুখ দিয়া শিশুর মত স্তন্যপান করিতে আরম্ভ করিল। দেহ জুড়াইয়া গেল। তারপর সে কি অগাধ ঘুম! সকালে যখন ঘুম ভাঙিল, তখন দেখিল এক অপরিচিত আবেষ্টনী, পরিচিত শুধু ময়ূরাক্ষী। কিন্তু এ কি চমৎকার দেশ! আহা-হা চোখ যেন জুড়াইয়া যায়। ময়ূরাক্ষী এখানে বিপুল বিস্তৃত। সম্মুখেই খানিকটা আগে—এই বিপুল বিস্তৃত ধূসর বালুচরের মধ্যে সবুজ একটা দ্বীপ। ময়ূরাক্ষী দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া দ্বীপটার দুই দিকে বহিয়া গিয়াছে। পানুর মন বলিয়া উঠিল—পাইয়াছি, এই তো জায়গা। দুই দিকে নদী, মধ্যে দ্বীপ। মানুষ নাই, জন নাই, মানুষ-জন যখন নাই, তখন দারোগা নাই, জমাদার নাই, নায়েব নাই, পেয়াদা নাই—আছে মাটি। সেখানে সে ঘর তুলিয়া বাস করিতে পারিবে; আছে ঘাস—যে ঘাস খাইয়া তাহার লছমী-মংলী পরিতৃপ্তিভরে রোমন্থন করিবে। হাঁড়ি ভরিয়া দুধ দিবে। আঃ, দেওতা, বাপা তাহার উপর দয়া করিয়াছে। হে বাপা, তোমাকে নমো—গড় করি তোমাকে। হঠাৎ লছমী চঞ্চল হইয়া ডাক দিয়া উঠিল—আঁ-আঁ-আঁ।

কিছু যেন দেখিয়াছে লছমী।

পরক্ষণেই সে-ও চঞ্চল হইয়া উঠিল—এ কি? মহিষ ডাকিতেছে কোথায়? দ্বীপটা আলোয় ঝলমল করিতেছে। সে উঠিয়া দাঁড়াইল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে নজরে পড়িল, দ্বীপটার উপরেই ঘাসবনের ও-পাশে এক পাল মহিষ চরিতেছে। সে লছমীকে লইয়া আগাইয়া চলিল। দ্বীপটার দিকেই চলিল।

দ্বীপে উঠিয়াই দেখিল এক পাল মহিষ। একটা মহিষের পিঠে চাপিয়া বসিয়া আছে একটা মেয়ে। এই লম্বা মেয়েটা! আর তেমনি কি আঁটসাঁট দেহ! মেয়েটার বাহন মহিষটা মুখ তুলিয়া উগ্রদৃষ্টিতে লছমীর দিকে চাহিয়া দেখিতেছে আর ডাকিতেছে—আঁ-আঁ-আঁ! পানু দেখিয়াই বুঝিল, ভঁইষাটা মর্দানা। সে বলিতেছে—কে? কে? কে?

হেলিয়া দুলিয়া সে আগাইয়া আসিতেছে। মাথাটা নীচু করিয়াছে, লড়াই করিতে চায়। পানু কিন্তু ব্যস্ত হইল না। কি হইবে সে জানে! মহিষটা আসিয়া লছমীকে যেই জেনানা বলিয়া চিনিবে, অমনি অন্য ডাক ডাকিতে শুরু করিবে। শেষ পর্যন্ত আসিয়া লছমীর মুখ শুঁকিবে।

মেয়েটা তাহার দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া আছে।

চোদ্দ

মেয়েটা কালা এবং বোবা।

বয়স চোদ্দ-পনরো, কিন্তু হৃষ্টপুষ্ট সবল সুস্থ দেহ। নাম যশোদা। নাম সে বলিতে পারে নাই, পানু শুনিয়াছিল মেয়েটির বাপের কাছে। হাঁ, বাপই। গ্রামের বর্ধিষ্ণু গোপেদের বাড়ির পোষ্য যশোদা। লোকে বলে, গোয়ালাটিরই নীচজাতীয়া প্রণয়িনীর গর্ভজাতা কন্যা। মা মরিয়া গিয়াছে, যশোদা খায়দায়—মহিষের সেবা করে। যশোদাই পানুর প্রথমা স্ত্রী।

যশোদা কালা-বোবা, কিন্তু ইঙ্গিতময়ী। ইঙ্গিতে এমন প্রখর মুখরতা পানু দেখে নাই। আজও দেখে নাই।

পানুর লছমী স্বজাতীয়-স্বজাতীয়াদের দেখিয়া মুখ তুলিয়া ডাক দিতেছিল। যশোদার মহিষের পালও ডাক দিতেছিল। সহসা ছুটিয়া আসিল একটা প্রকাণ্ড মহিষ। মুখ তুলিয়া ডাক দিতে দিতে সে আসিয়া লছমীর অদূরে দাঁড়াইল।

পানু লাঠি লইয়া দাঁড়াইয়া প্রস্তুত হইয়াই ছিল। মহিষটা আরও খানিকটা কাছে আসিতেই হাসিয়া লাঠিটা নামাইল। মরদ মহিষ। লছমী তাহার জেনানা। কোনও ভয় নাই। এমনি ভাব হইয়া যাইবে।

ওদিক হইতে যশোদাও ব্যাপারটা দেখিয়াছিল। সেও শঙ্কিত হইয়া তাহার বাহন মহিষটার উপর হইতে লাফ দিয়া ছুটিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। হাতের লাঠিটা উদ্যত। সেও ব্যাপারটা দেখিয়া লাঠিটা নামাইয়া ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল। কিন্তু পর-মুহূর্তেই গম্ভীর হইয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া স্তিমিত বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া চকিতে এমনভাবে জিজ্ঞাসা-চিহ্নের মত ঘাড়টি নাড়িল যে, এক মুহূর্তে তাহার বক্তব্য স্বরে অর্থে স্পষ্ট হইয়া উঠিল—কে তুমি ?

পানু বলিল—আমি পানু।

আবার সে ঘাড় নাড়িল, তেমন চকিত জিজ্ঞাসা-চিহ্নের ভঙ্গিতে ফুটাইয়া তুলিল—কে—কে ? ভ্রূ আরও কুঞ্চিত হইয়া উঠিল।

—পানু ; এখানকার আদমী নই আমি।

মেয়েটি এবার কানে হাত দিল—তারপর 'না'র ভঙ্গিতে হাত নাড়িল। পানু মুহূর্তে বুঝিল, মেয়েটি কালা। কিন্তু কথা বলে না কেন ?

মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে মুখে হাত দিয়া হাত নাড়িল—না। এবার পানু ঠিক বুঝিল না। মেয়েটি এবার 'আঁউ—আঁউ' করিয়া শুধু রব করিয়া উঠিল। বার বার হাত নাড়িল, সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নাড়িয়াও বুঝাইল—না না। চোখের দৃষ্টি তাহার হইয়া উঠিল সকরুণ। পানুর বুঝিতে আর কষ্ট হইল না, বিলম্বও হইল না। বুঝিল, মেয়েটি বোবা—কালা। তাহারও দৃষ্টি সকরুণ হইয়া উঠিল।

সে চীৎকার করিয়া বলিল—সে পানু। সে বিদেশী।

হাতখানি সুদীর্ঘ প্রসারণে প্রসারিত করিয়া বুঝাইতে চাহিল—বহুদূরে তাহার বাড়ি।

যশোদা একটা গাছতলায় বসিয়া হাসিমুখে হাতের ইসারা করিয়া তাহাকে ডাকিল—এস, এইখানে এস।

পাশের জায়গাটুকু হাত দিয়া পরিষ্কার করিয়া হাতের তালু দিয়া মৃদু আঘাত করিয়া সস্নেহ দৃষ্টিতে চাহিয়া ঘাড় নাড়িল—বস—এইখানে বস। পানু বসিল।

পানু উচ্চকণ্ঠে বলিল—গাঁও কত দূর ?

যশোদা এমনভাবে চাহিল যে, পানু মুহূর্তে বুঝিল—সে শুনিতে পায় নাই। সে আরও উচ্চকণ্ঠে বলিল—গাঁও ? গাঁও ? তারপর নিজের পেটে হাত দিয়া দেখাইয়া বলিল—ভুখ ! ক্ষিধে ! ক্ষিধে ! আহার্যের সন্ধানে সে গ্রামে যাইবে।

যশোদা উঠিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল।

পানু বিস্মিত হইল, শঙ্কিতও হইল।—বোবা কালা মেয়েটা পলাইল কেন ? তাহার কথার কোন কদর্থ করে নাই তো ?

যশোদা অল্পক্ষণ পরেই ফিরিল। হাতে তাহার গামছায় বাঁধা একটা পোঁটলা। পোঁটলাটা খুলিয়া পানুর সম্মুখে মেলিয়া ধরিয়া বার বার সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল।—খাও—খাও—তুমি খাও।

যশোদার মরদ মহিষটা তখন পানুর লছমীর গলার নীচেটা চাটিতেছে।

পানু ওই গ্রামেই বাসা বাঁধিল।

গোয়ালা প্রথমটা সন্দিগ্ধ চোখে দেখিয়াছিল। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই তাহার সে ভাব পাল্টাইয়া গেল। আরও কয়েকদিন পর সে পানুকে বলিল—যশোদাকে তুমি বিয়ে করবে?

পানু এতটা প্রত্যাশা করে নাই। সে আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল।—হাঁ। হাঁ। হাঁ।

পানুর জাতি-পরিচয় গোপ মহাশয় আগেই লইয়াছিল। সে যশোদাকে তিলক-কণ্ঠি পরাইয়া বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করিয়া পানুর সঙ্গে বিবাহ দিয়া দিল।

পানু সেদিন বুঝিতে পারে নাই, কিন্তু কয়েকদিন পরেই বুঝিয়াছিল—ঘোষ ভয়ঙ্কর ব্যক্তি!

সেদিন কিন্তু পানু ঘোষের প্রতি শ্রদ্ধায় ভক্তিতে প্রায় বিগলিত হইয়া গিয়াছিল। মাস-খানেকের পরিচয়ে ঘোষ যখন তাহার হাতে যশোদাকে তুলিয়া দিল, নিজের গোয়াল-বাড়িতে একখানা ঘর দিল, তখন তাহার মনে হইল—ঘোষ তাহাকে যাহা দিল, ইহাকেই তো অর্ধেক রাজত্ব সমেত রাজকন্যা বলে। পানু বিগলিতচিত্ত হইয়া রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

ভোরে উঠিয়া পানু ঘোষের মহিষের পাল লইয়া চরে চরাইতে যায়, পালের সঙ্গে যায় লছমী। যশোদা গোয়াল সাফ করে; গোয়াল সাফ করিয়া আহার্য লইয়া চরে যায়, সেই সঙ্গে লইয়া যায় বাছুরগুলিকে—লছমীর বেটি মংলীও যায়। ঘোষের লোক যায় বালতি হাতে। দুধ দুহিয়া লইয়া আসে। পানুও লছমীর দুধ দুহিয়া লয়। ঘোষই লছমীর দুধ কিনিয়া লয়—তিন পয়সা সের। পয়সা নগদ দেয় না, দেয় সেই দামের চাল দুই আনা সের। যশোদা বাড়ি আসিয়া রান্না করে, পানু প্রচুর অন্ন পেট ভরিয়া খায়; রাত্রে যশোদাকে লইয়া তাহার প্রমত্ত নিশিযাপন। গ্রীষ্মের রাত্রে ঘর হইতে যশোদাকে লইয়া সে ময়ূরাক্ষীর বালির উপর গিয়া শয্যা রচনা করে। জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রে বালুচরের উপর দুইজনে ছুটিয়া বেড়ায়—হাসে, নাচে, পানু গান গায়—যশোদাও গায়। তাহার গান শুধু ভাষাহীন সুর, শুধু উল্লাসের একটি একটানা প্রকাশ, শুধু চীৎকার! চীৎকার পানুর গানের সঙ্গে গান করিতে চায়; গ্রীষ্মের ময়ূরাক্ষীর এক হাঁটু জলে কখনও লাফাইয়া পড়ে—এ পানুর পক্ষে রাজত্ব নয় তো কি? তাহার কল্পনার ঘর পাইয়াছে, বউ পাইয়াছে—যে বউ রুকণীর মত অনেকটা উচ্ছলা বর্বরা—আবার যে পল্লীর মেয়েগুলির মত বেশ পরিপাটি করিয়া কাপড় পরে, নিত্য স্নানে যে পরিচ্ছন্ন, পায়ে যে আলতা পরে, মাথার চুলগুলি যে তাহার দিদির মত করিয়া বাঁধিতে জানে, চমৎকার সুস্বাদু ব্যঞ্জন রাঁধে, রুকণীর মত উচ্ছলা হইয়াও সে লোকের সম্মুখে লজ্জায় নম্র হইয়া ঘোমটা দেয়, একান্ত-ভাবে আনুগত্য স্বীকার করে। পেট ভরিয়া অন্নের সংস্থান হইয়াছে। ঘোষেদের সংসারের মধ্যে আত্মীয়তার সন্ধান পাইয়াছে। সে আর কি চাহিবে? সত্য, সেদিন তাহার আর কোন কাম্য ছিল না।

বার বার সে বৃক্ষদেবতাকে প্রণাম জানাইয়া বলিত—হে বাপা, হে দেওতা হাজার বার তোমাকে গড় করি। যাহা চাহিয়াছিলাম, তাহাই তুমি আমাকে দিয়াছ। যদি তাহার সেদিনের সুখের ঘরে আঘাত না পড়িত, তাহার মনের বিশ্বাসে, বুকের ভালবাসায় ঘোষবাবা আগুন না দিত, তবে আর কোন কিছুই সে চাহিত না।

সে কয়টা দিন ছিল সুখের দিন। পুরানো স্মৃতিকে ঝালাইয়া তখন সে পুরানো দেবদেবী-গুলিকে নূতন করিয়া চিনিয়াছে। তাহাদের ভক্তি করিত—প্রণাম করিত। দুর্গা-কালী-শিব-কৃষ্ণ-রাধা-কার্তিক সব আবার মনে পড়িয়াছে তখন।

প্রাণপণে সে চেষ্টা করিত ঘোষেদের সংসারে মানুষগুলির সকল আদেশ পালন করিয়া তাহাদের মনোরঞ্জন করিতে, তাহাদের দানের প্রতিদান দিতে, তাহাদিগকে আরও গভীরভাবে আপনার করিয়া পাইতে। ঘোষকে সে বলিত—ঘোষবাবা। তখন মনে হইত, ঘোষবাবার মত ভাল লোক তাহার জীবনে সে দেখে নাই।

হঠাৎ তাহার নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে, গভীর আশ্বাসে আঘাত দিল যশোদা। সে একদিন ঘোষের বাড়ি হইতে চাল আনিয়া অত্যন্ত অসন্তোষ জানাইয়া আঁউ-আঁউ করিতে আরম্ভ করিল। পানু কিছু ঠাওর করিতে পারিল না। সে মুখে বলিল এবং ঘাড় নাড়িয়া ইঙ্গিত জানাইল—কি? কি?

যশোদা এবার দুধের মাপের সেরটা আনিয়া চালটা মাপিয়া দেখাইয়া নিল—দুই সেরে চাল অনেকটা কম।

পানু সবিস্ময়ে যশোদার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

যশোদা আবার উঠিয়া একটা হাঁড়ির ভিতর হইতে ছয়টা পয়সা আনিয়া পানুর সম্মুখে রাখিল এবং পয়সাটার পাশেই এক সের চাল মাপিয়া ঢালিয়া দিল। তারপর আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিল—গ্রামের ভিতরের দিকে। তারপর সে এক সের দুধ মাপিয়া তাহার পাশে রাখিল পাঁচটা পয়সা। আবার আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিল—নদীর ওপারের দিকে।

পানু ব্যাপারটার আভাস পাইল। কিন্তু বিশ্বাস করিল না, ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিল—কে বললে?

যশোদা আঁউ-আঁউ করিয়া আঙুল দেখাইল—গ্রামের দিকে।

পানু সবই বুঝিয়াছে। গ্রামের কেহ যশোদাকে বলিয়াছে, চালের সের ছয় পয়সা। দুধের সের পাঁচ পয়সা। কিন্তু সে বিশ্বাস করিতে পারিল না। বলিল, ইঙ্গিতে বুঝাইল—না না। ঘোষবাবা তেমন লোক নয়। আর সে লোককে আদমী বলে না।

যশোদা এবার তাহার সর্বাঙ্গ দোলাইয়া পানুর মুখের কাছে দুই হাত নাড়িয়া দিল। তাহার সে ভঙ্গিতে ফুটিয়া উঠিল অদ্ভুত এক ঝঙ্কারময়ী রূপ। পানু মুগ্ধ হইয়া না হাসিয়া পারিল না। যশোদা এবার তাহার হাত ধরিয়া টানিতে আরম্ভ করিল। পানুকে উঠিতে হইল।

গাঁয়ের ও-পাড়ায় সদ্‌গোপদের বাড়ি।

সদ্‌গোপ-কর্তা তাহাকে বলিল—চালের সের ছ পয়সা কাঁচি মাপে অবিশ্যি। তা কাঁচি মাপেই তো চাল দেয় ঘোষ।

সদগোপ-কর্তা কাঁচি এবং পাকি—অর্থাৎ ষাট ও আশি তোলার ওজনের মাপের পার্থক্য পানুকে মাপিয়া দেখাইয়া দিল। তারপর বলিল—দুধ ওপারের বাজারে কাঁচি পাঁচ পয়সা, পাকি ছ পয়সা সের। নিজে গিয়ে দেখে এস, বিশ্বাস না হয়।

তারপর সে বলিল—তোমরা যে দুজনায় খাটছ, কি দেয় তোমাদিগে? দেয় কিছু? দুটো লোক রাখতে হলে মাইনে কত লাগত জান? ঘোষবাবা, ঘোষবাবা! ঘোষবাবা তোমার বেশ!

পানু হাঁ করিয়া সদগোপ-কর্তার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। দেহখানা আঁকাইয়া-বাঁকাইয়া যশোদার অঙ্গভঙ্গি করার আর বিরাম ছিল না। চোখের দৃষ্টিতে, ভ্রূর কুঞ্চনে, কপালের রেখায় পানুকে সে অজস্র তিরস্কার করিয়া চলিয়াছিল। অর্থাৎ—দেখ দেখ, কথায়

যে বিশ্বাস করিতেছিলে না! তুমি বোকা। তুমি বোকা। তোমার চেয়ে আমার বুদ্ধি আছে।

পানুর ক্রোধ জাগিয়া উঠিল। ঘোষবাবার উপর, না সদ্‌গোপ-কর্তার উপর, না যশোদার উপর সে ঠাওর করিতে পারিল না। ক্রোধে সে চীৎকার করিয়া উঠিল। তারপর সম্মুখে তাহার সহজলভ্যা ঝঙ্কারময়ী যশোদাকে ধরিয়া দুম-দাম শব্দে প্রহার আরম্ভ করিয়া দিল। বোবা যশোদার পশুর মত আর্তনাদে স্থানটা বিরক্তিজনকভাবে করুণ হইয়া উঠিল। সদ্‌গোপ-কর্তা হাঁ হাঁ করিয়া আগাইয়া আসিল। পানু হঠাৎ যশোদাকে ছাড়িয়া দিয়া হনহন করিয়া চলিয়া গেল। গেল সে নদীর ও-পারের বাজারে। সব সে যাচাই করিয়া লইবে।

বাজারে দুধের দর সত্যই পাঁচ পয়সা। চালের দরও ছয় পয়সা। সদগোপ-কর্তা মিথ্যা বলে নাই।

পানু ফিরিবার পথে নদীর ধারে আসিয়া একটা গাছতলায় বসিল। মন কিছুতেই গ্রামে ফিরিতে চাহিতেছিল না। ঘোষবাবা! তাহার ঘোষবাবা তাহাকে এমনিভাবে ঠকাইয়াছে?

সেদিন রাত্রে যশোদার সে কি অভিমান! ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়াছিল।

পরের দিনই আবার তাহার জীবনের দুর্ভোগ ঘনাইয়া আসিল।

সকালেই সে ঘোষবাবাকে বলিয়া দিল—লছমীর দুধ সে বেচিবে না। চাল সে তাহার কাছে কিনিবে না। বিনা বেতনে মহিষ চরাইবে না, যশোদাও গোয়াল পরিষ্কার করিবে না। সাফ কথা।

বলিয়াই পানু চলিয়া আসিতেছিল।

ঘোষবাবা ডাকিল—এই, শোন। অদ্ভুত সে কণ্ঠস্বর!

কণ্ঠস্বর শুনিয়া পানু চমকিয়া উঠিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সে বিস্ময়ের উপর স্তম্ভিত হইয়া গেল। ঘোষবাবার এ কি চেহারা!

বাংলা দেশের গোপ-ঘোষেরা এ দেশের শক্তিমানদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্প্রদায়। দুধ-ঘিয়ের প্রাচুর্যে পুষ্ট দেহ, মহিষ লইয়া প্রান্তরে প্রান্তরে ফিরিয়া মুক্ত আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ, তাহার উপর স্মরণাতীত কাল হইতে তাহারা শক্তিচর্চা করিয়া আসিতেছে। ঘোষবাবা তো একালে এ অঞ্চলে পালোয়ান বলিয়াই খ্যাত ছিল। সেই ঘোষবাবা ক্রোধে ফুলিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া দাঁতে দাঁতে ঘষিয়া বলিল—খুন করে ফেলব।

পানুও ভয় পাইবার মানুষ নয়; সে বলিল—বেইমান, তু বেইমান!

ঘোষ বলিল—বেটা, বেরিয়ে যা আমার বাড়ি থেকে।

পানু বলিল—আভি যায়েগা হাম। বহুদিন পরে হিন্দী কথা বলিয়া ফেলিল সে।

পানু হনহন করিয়া আসিয়া যশোদাকে চীৎকার করিয়া বলিল—চল, এখান থেকে চল। থাকব না এখানে। নিয়ে আয় লছমীকে মংলীকে।

পিছন হইতে খপ করিয়া তাহার ঘাড়ে ধরিল ঘোষ। বলিল—একা রে বেটা, একা। মোষ সমস্ত আমার। তোর মোষ বললে কে? আর যশোদাও যাবে না। ও যাবে কোথা?

বিস্ময়কর কঠিন শক্তিশালী মুষ্টি। পানুর মত জোয়ানও সে মুষ্টির কবল হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে পারিল না। ঘোষবাবা তাহাকে অনায়াসে রদ্দা মারিয়া আছাড় দিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিল। তারপর তাহার পিঠের উপর বসিয়া নিষ্ঠুর নির্মম প্রহারে তাহাকে জর্জরিত করিয়া দিল। সে প্রহার বিচিত্র। সাধারণ লোক এমন প্রহার জানে না—পালোয়ানী প্রহার। পানু

যে পানু—সেও জর্জর কাতর দেহে পড়িয়া রহিল। আশ্চর্যের কথা, যশোদা একটা কথাও বলিল না।

ঘোষবাবা ইহাতেই নিরস্ত হইল না। প্রকাণ্ড লাঠিখানা ধরিয়া পানুকে বলিল—ওঠ বেটা, ওঠ! ওঠ, নইলে খুন করে ফেলব।

পানুকে উঠিতে হইল।

ঘোষ বলিল—চল।

কথা না শুনিয়া পানুর উপায় ছিল না। পানু চলিল। ময়ূরাক্ষী পার করিয়া ঘোষ লাঠি দিয়া মুক্ত পৃথিবীর দিকে নির্দেশ দিয়া বলিল—চলে যা। যদি গাঁয়ে ঢুকিস, তবে তোকে খুন করে ফেলব। ঘোষের চোখে খুন খেলা করিতেছিল।

পালোয়ানী প্রহারে চোয়াল ছাড়িয়া যায়, হাতের গ্রন্থি শিথিল হইয়া যায়—সেই প্রহার হানিয়াছিল ঘোষ। পানু টলিতে টলিতে খানিকটা গিয়া শুইয়া পড়িল। ঘোষ হাসিতে হাসিতে ফিরিল। দুনিয়ায় পানু এমন পরাজয় কোন লোকের কাছে স্বীকার করে নাই। সে ময়ূরাক্ষীর অপর পারে আসিয়া বালুচরের উপর শুইয়া পড়িল। সে অদ্ভুত অবস্থা!

রাত্রি ঘনাইয়া আসিয়াছে। মনের মধ্যে তাহার গভীর আক্রোশ। মর্মান্তিক দুঃখ। প্রহারের প্রতিশোধ লইবার শক্তি নাই। নাড়িবার শক্তি নাই, তবু চেতনা আছে। তাহার লছমী, তাহার মংলীকে কাড়িয়া লইয়াছে। যশোদা,—সর্বাপেক্ষা আক্রোশ তাহার যশোদার উপর। রুকণী হইলে ঘোষের পিছন হইতে কোন একটা অস্ত্রাঘাতে তাহাকে খুন করিয়া ফেলিত। যশোদা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল শুধু। একটা ক্ষীণতম চীৎকারও করিল না।

সেদিন তাহার মনে হইয়াছিল আর এক দিনের কথা। যেদিন থানার জমাদার তাহাকে মারিয়াছিল। কিন্তু প্রহার-জর্জরিত দেহেও সে সেদিন বিশ মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছিল মনের আবেগে। আজ কয়েকবার উঠিবার চেষ্টা করিয়াও পারিল না।

রাত্রি গভীর হইয়া আসিতেছে। ক্ষুধায় পেট খাক হইয়া গেল, তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে। আঃ, তাহার লছমী মা যদি এ সময় থাকিত তবে সে শিশুর মত তাহার স্তন্যপান করিত। আশেপাশে সরীসৃপ চলাফেরা করিতেছে গুল্মগুলার মধ্যে। আক্রমণ করিলে আজ পানুর আত্মরক্ষা করিবারও শক্তি নাই। সে আজ মরিবে। আকাশভরা তারার দিকে অর্ধনিমীলিত আচ্ছন্ন দৃষ্টি মেলিয়া সে পড়িয়া রহিল। ক্রমে মনে হইল, এইবার বুঝি চেতনা তাহার তলাইয়া যাইবে। মনে হইতেছে, সে যেন কিসের মধ্যে ডুবিয়া যাইতেছে।

হঠাৎ কিসে তাহাকে যেন নাড়া দিল। শুধু দেহে নয়—মনেও নাড়া অনুভব করিল। দেহের নাড়ার সঙ্গে কানের মধ্যে একটা দূরশ্রুত আঁউ-আঁউ শব্দ আসিয়া প্রবেশ করিল। দূরে কোথাও যশোদা চীৎকার করিতেছে। সে চোখ মেলিয়া চাহিল; দেখিল, তাহার মুখের উপর যশোদার মুখ—আঁউ-আঁউ করিয়া ডাকিতেছে। সে এবার ক্ষীণ কণ্ঠে সাড়া দিয়া হাঁ করিল। ইঙ্গিতে যশোদাকে বুঝাইল—জল! জল!

যশোদা তাহার মুখে ঢালিয়া দিল দুধ।

বার দুই ঢোঁকের পরই সে চিনিল—এ তাহার লছমীর দুধ। স্বাদ যে তাহার চেনা।

কিছুক্ষণ পর সে সুস্থ হইয়া উঠিবার চেষ্টা করিল। যশোদা তাহাকে ধরিয়া বসাইয়া দিল। তারপর পানুর গলা ধরিয়া তাহার সে কি কান্না! পানু তাহার গায়ে বার বার হাত বুলাইয়া দিল। কিছুক্ষণ পর যশোদা নিজেই চোখ মুছিয়া আঁউ-আঁউ করিয়া দূরে দিগন্তের দিকে আঙুল দেখাইল। উঠিয়া গিয়া তাড়াইয়া আনিল লছমী ও মংলীকে। মংলীর পিঠে বস্তাবন্দী

রাজ্যের জিনিস। পানুকে ধরিয়া সে উঠাইয়া দিল লছমীর পিঠে। পানু বুঝিল, গভীর রাত্রে যশোদা লছমী, মংলী ও ঘরের জিনিসপত্র লইয়া চলিয়া আসিয়াছে। চলিতে চলিতে হঠাৎ যশোদা খিলখিল করিয়া হাসিয়া সারা হইয়া গেল। গ্রামের দিকে—ঘোষের ঘর লক্ষ্য করিয়া বার বার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইল, একবার ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া খানিকটা নাচিয়া লইল। পানু চলিতেছিল লছমীর পিঠে চড়িয়া। তাহার দেহ প্রহারজর্জর, শুধু মনের মধ্যে একটা গভীর আক্রোশ। ঘোষবাবার প্রহারের শোধ সে লইতে পারিল না।

শোধ সে লইয়াছিল।

মাসখানেক পরে একদা রাত্রে দশ মাইল পথ হাঁটিয়া আসিয়া সে ঘোষবাবার ধানের মরাইয়ে আগুন ধরাইয়া দিয়াছিল। সে ও যশোদা দুইজনেই আসিয়াছিল একসঙ্গে।

উঃ, সে কি আগুন! সে কি চীৎকার! ধানগুলা ফুটিয়া খই হইয়া গিয়াছিল। ঘরে আগুন দিয়া আসিয়া নদীর মাঝখানের চরে দাঁড়াইয়া পানু ও যশোদা সে দৃশ্য দেখিয়াছিল। যশোদা নাচিয়াছিল উন্মত্ত আনন্দে। তখন প্রখর গ্রীষ্ম। যশোদাই প্রেরণা যোগাইয়াছিল।

আগুন নিবিয়া আসিতেই যশোদাকে সঙ্গে লইয়া অন্ধকারের মধ্যে সে মিশিয়া গিয়াছিল।

পনেরো

যশোদার সেদিনের নাচন আজও পানুর মনে আছে।

পানুও নাচিয়াছিল। যশোদাকে কাঁধে তুলিয়া লইয়া নাচিয়াছিল। সেদিন তাহার মনে হইয়াছিল, যশোদা তাহাকে যত ভালবাসে এত ভালবাসা কোন মেয়ে কোন মরদকে বাসে নাই, যাহার জন্য তাহার বাপ—ওই ঘোষের ঘরের আগুন দেখিয়া এমন করিয়া নাচিল। এ নাচ রুকণী নাচিতে পারিত! দুনিয়ায় আর কোন মেয়ে এ নাচ নাচিতে পারে বলিয়া পানু আজও বিশ্বাস করে না।

ঘোষ যে যশোদার বাপ—এ কথা ও-অঞ্চলে কাহারও না-জানা ছিল না। ঘোষও কথাটা লুকাইত না; সে নিজেই পানুকে বলিয়াছিল—আমার বেটী ও। ওর মা ছিল আমার আশনাইয়ের মানুষ। তুইও বোষ্টম, ওর মাকেও আমি বোষ্টম করে দিয়েছিলাম। তুই আমার জামাই।

পানু তাহাকে ঘোষবাবা বলিত সেই অধিকারে। ঘোষ কোনদিন আপত্তি করে নাই। যশোদাকেও সে যথেষ্ট স্নেহ করিত। যশোদা বলিয়া কোনদিন ডাকিত না; বলিত—যশো-বেটী। ঘোষবাবা যশো-বেটী বলিয়া হাঁক মারিলে যশোদা ছুটিয়া আসিত অত্যন্ত আদরের পোষা কুকুরের মত। দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া আসিয়া দাঁড়াইত। সেই যশোদা রাত্রে লছমী এবং মংলীকে লইয়া ঘোষবাবার বাড়ি হইতে পলাইয়া আসিল, তাহাতেও পানু তত আশ্চর্য হয় নাই। কিন্তু ঘোষবাবার ঘরে সে যখন প্রতিহিংসায় আগুন লাগাইয়া দিল এবং সেই আগুন দেখিয়া যশোদা যখন উন্মত্ত আনন্দে নাচিল, তখন পানু আশ্চর্য হইয়া গেল।

আজ কিন্তু পানু আর আশ্চর্য হয় না। যশোদা তাহাকে ভালবাসিত, কিন্তু সেদিন যশোদা তাহাকে ভালবাসার জন্য এমন করিয়া নাচে নাই। যশোদা জানিত, পানু তাহার,—পানুর

টাকা-কড়ি, পানুর রোজগার, পানুর লছমী-মংলীও তাহার। তাই পানুকে যখন ঘোষবাবা নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিল, তখন যশোদা রাত্রে লছমী মংলীকে লইয়া পলাইয়া আসিয়াছিল তাহার কাছে। যশোদা বোবা কালা হইলেও বেশ বুঝিত যে, পানু না থাকিলে লছমী-মংলীর উপরেও তাহার কোন অধিকার থাকিবে না। পানুর ঘরে তাহার যে অধিকার, ঘোষবাবার ঘরে তাহার এক আধলা অধিকারও যশোদার নাই—এ কথা যশোদা বুঝিতে পারিয়াছিল। তাই তাহার আক্রোশ। সেই আক্রোশেই সে সেদিন নাচিয়াছিল। দুনিয়া—তামাম দুনিয়াতেই ওই এক ব্যাপার। নিজের ছাড়া কেহই কাহারও নয়। যশোদাও ঘোষবাবার মত তাহাকে চুষিয়া খাইতে চাহিয়াছিল।

প্রায় বৎসর খানেক পর যশোদা নিজেই তাহাকে কথাটা বুঝাইয়া দিয়াছিল।

সময়টা তখন বর্ষা। পানু তখন যশোদাকে লইয়া ঘোষবাবার গাঁ হইতে একদম বিশ ক্রোশ তফাতে আসিয়া বাসা বাঁধিয়াছিল। একখানা ঘর, এক টুকরা বারান্দা, পাশে একটা গোয়াল। লছমীর তখন নূতন বাচ্চা হইবার সময়। মংলী বেশ বড় হইয়াছে—মাথায় শিঙ দুইটা গোলালো কালো পাথরের নুড়ির মত বাহির হইয়াছে। লছমীর দুধ নাই। উপার্জনের পথ নাই, তাই পানু ভাবিয়া চিন্তিয়া রোজগারের জন্য একটা বেগুনী-ফুলুরি-বাতাসা-মুড়কির দোকান করিল।

দীনু তাহাকে ভিয়ান শিখাইতে চেষ্টা করিয়াছিল। শিখিয়াছিলও সে সহজে। এদিকে তাহার বাল্যকালের স্মৃতি ও শিক্ষা সাহায্য করিয়াছিল। নাকু দত্তের দোকানের ও-পাশে ছিল মাধব ময়রার বাড়ি। বাল্যকালে সে মাধবের বাড়ি গিয়া বসিয়া থাকিত। ভিয়ান অর্থাৎ মিষ্টান্ন তৈয়ারী দেখিতে বড় ভাল লাগিত তাহার। কড়ায় চিনির পাক টগবগ করিয়া ফুটিত—সেই রস গোল হাতায় তুলিয়া কাঠি দিয়া ফেটাইলে ঘন সাদা হইয়া উঠিত; আর মাধব কাঠির কৌশলে কাটিয়া কাটিয়া খেজুরের চ্যাটাইয়ের উপর বাতাসা ফেলিত—মোমবাতির টোপার মত। সে মাধবকে সাহায্য করিত। হা-ঘরের দল হইতে পলাইয়া আসিয়া, দিদি চারুর বাড়িতে দীনু তাহাকে এই বাতাসা-কদমা তৈয়ারী শিখাইয়াছিল হাতে-কলমে। সে ওই দোকানই পাতিয়া বসিল।

ময়ূরাক্ষীর কূল ছাড়িয়া এবার সে আসিয়াছিল কোপাই নদীর ধারে। পারঘাটার উপরে ঘর বাঁধিয়াছিল। পাশে একটা সাঁওতালের বস্তী। সম্মুখে নদী। নদীর ধারে এক হাঁটু উঁচু সবুজ ঘাস। প্রথম কয়েক দিন একটা গাছতলায় থাকিয়া জায়গাটা ভাল লাগিলে খোঁজ-খবর লইয়া সে এবার সর্বাগ্রে জমিদারকে দশটা টাকা দিয়া ঘর করিবার অনুমতি যোগাড় করিল, তবে আরম্ভ করিল ঘর। বেশ জায়গা, সাঁওতালরাও ভাল লোক। সে মাটি কোপাইল, যশোদা মাথায় হাঁড়ি করিয়া জল আনিল। কাদা হইলে দুইজনে তাহারা কাদার উপর নাচিত। সে দেওয়াল দিত, যশোদা মাটি তুলিয়া দিত। কত কথাই যে মনে পড়িতেছে! কত খুঁটিনাটি! যশোদা কি পরিশ্রমই না করিত! ঘর-দুয়ার হইতে গোয়াল পরিষ্কার, লছমী-মংলীর সেবা, কাঠ-কুটা সংগ্রহ, পানুর ভিয়ানের সময় তাহাকে সাহায্য করিয়া ফিরিত সে চরকির মত। ইহার উপর যশোদার ছিল ছোট একখানি ক্ষেত। সাঁওতালদের বাড়ি হইতে শাক-সব্জীর বীজ সংগ্রহ করিয়া সেই ক্ষেতে ফসল ফলাইত। বাড়ির পাশেই ছোট্ট এক টুকরা জমি। এই কাজটা পানুর প্রথম প্রথম ভাল লাগিত না, কিন্তু যখন ফসলে শীষ দেখা দিল, লতাগুলি ফুলে ফুলে ভরিয়া উঠিল, তখন সে-ও মাতিয়া গেল যশোদার সঙ্গে। ক্রমে পানুর দেহখানা অসুরের মত শক্তিশালী হইয়া উঠিল। এই সময় সে যদি ঘোষবাবার সঙ্গে লড়িত, তবে কে হারিত সে কথা বলা শক্ত।

মধ্যে মধ্যে সে ইচ্ছা তাহার হইত। যাইবে নাকি আর একদিন? কিন্তু কাজের মধ্যে অবসর মিলিত না। কত কাজ!

সামনে বর্ষা পাইয়া পানু মাটি কোপাইয়া গোবর আবর্জনা মিশাইয়া ক্ষেতখানাকে দ্বিগুণ বাড়াইয়া ফেলিল। যশোদা তাহাতে শাকের বীজ ছড়াইল, কুমড়া-লাউয়ের বীজ পুঁতিল। কিন্তু তাহাতেও পানুর তৃপ্তি হইল না। সাঁওতালদের বাড়ীর পাশে বিস্তীর্ণ ভাঙা জমিতে ভুট্টার গাছ বাহির হইয়াছে। তাহার সাধ হইল, এমনি বিস্তীর্ণ জমিতে ফসল লাগাইয়া পৃথিবীর খাঁখাঁ করা বুক সবুজ করিয়া দিবে। তাহাতে ফুটিবে ফুল, তাহাতে ধরিবে ফল। চিন্তা করিয়াও পানুর নাচিতে ইচ্ছা করে। তাহার লাঙ্গল গরু নাই। নিজেই কোদাল কোপাইয়া অনেকটা জমিতে ভুট্টার বীজ ছড়াইয়া দিল। হঠাৎ আসিল সেই দিন, যে দিনের ঘটনা হইতে যশোদার অন্তরের সত্য পানুর চোখে ধরা পড়িল।

সে দিন বর্ষা নামিয়াছিল। বেলা প্রায় তিন প্রহরের সময় জল নামিল। আকাশের বুকের মেঘ যেন মাটির বুকে নামিয়া আসিতে চাহিতেছে। মেঘের রঙ সন্তানসম্ভবা কালো মেয়ের মুখের মত। কালো রঙ ফ্যাকাশে হইলে যেমন হয় তেমনি। চারিপাশ বৃষ্টির ধারায় ঝাপসা হইয়া আসিতেছে। ক্ষেত ঢাকিয়াছে, গ্রাম ঢাকিয়াছে, নদীর ধারের জঙ্গল ঢাকিয়াছে, নদীর ঢালু পথ, নদীর বুক—সব কে যেন একখানা চাদর আড়াল দিয়া ঢাকিয়া দিয়াছে। ঝাপসা। সব ঝাপসা।

পানু বাতাসা কাটা শেষ করিয়া বসিয়া সব দেখিতেছিল। যশোদা জলে ভিজিয়া বেড়াইতেছে। হঠাৎ আঁউ-আঁউ করিয়া চেঁচাইয়া উঠিল যশোদা। কি হইল? ছুটিয়া গেল পানু। দেখিল, জলের নালা বাহিয়া নদী হইতে একটা মাছ উঠিয়া আসিয়াছে। যশোদা সেটাকে কিছুতেই ধরিতে পারিতেছে না। হা-ঘরের কাছে পানু সাপ ধরা শিখিয়াছিল। খপ করিয়া সে মাছটার মাথা চাপিয়া ধরিল। হাততালি দিয়া নাচিতে আরম্ভ করিল যশোদা। আবার সে চেঁচাইয়া উঠিল—আঁউ-আঁউ! তাহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া পানু দেখিল, তাহার পিছনে আরও একটা মাছ। সেটাকে ধরিতে গিয়া সে আবিষ্কার করিল, সারিবন্দী মাছ উঠিয়া আসিতেছে। তাহার একটা নেশা ধরিয়া গেল। যশোদাকে ইসারা করিয়া চীৎকার করিয়া বলিল—ঘর-দুয়ার রহিয়াছে, তুই থাক। আমি মাছ ধরিয়া আনি। লছমী মংলীকে বাঁধিতে হইবে, খড় দিতে হইবে।

যশোদা আঁউ-আঁউ করিয়া উঠিল।

যশোদার ওই এক দোষ। কথা সে সব সময় বুঝিতে পারে না। তাহার মন যে দিকে ছুটিয়া চলে, তাহার উল্টা কথা হইলে সে কথা তাহার মাথায় কিছুতেই ঢুকিবে না। যশোদার হাত ধরিয়া সে তাহাকে দাওয়ার উপর বসাইয়া দিল; ইশারা করিয়া বুঝাইয়া দিল—লছমী মংলীকে ঘরে বাঁধিতে বলিল। তারপর সে বাহির হইল মাছের সন্ধানে। বাপ রে বাপ! কত মাছ! কত! সারি সারি চলিয়াছে উজানে! যেন উহারা ঠিক বুঝিতে পারে, এইবার বর্ষা নামিয়াছে, পুকুর খাল বিল ভরিয়া উঠিয়াছে—নদীর উজানে নালা বাহিয়া তাহারা সেখানে বেড়াইতে চলে। আবার আশ্বিন মাসে বৃষ্টি নামিলেই মাছগুলা স্রোতের টানের মুখে পুকুর খাল বিল হইতে বাহির হইয়া ছুটিবে। ঠিক বুঝিয়াছে, বর্ষা ফুরাইয়া আসিতেছে। ক্রমে এইবার খাল বিল পুকুরের সঙ্গে নদী নালার যোগ কাটিয়া যাইবে, পুকুর খাল বিল মরিয়া আসিবে; তখন স্রোতের টানের মুখ নদীতে পড়িয়া যাইবে; ছোট নদী হইতে বড় নদীতে,

বড় নদী হইতে সমুদ্রে। পানু মাছ ধরিয়া হাতে বালতিটা প্রায় ভরিয়া ফেলিল। ওদিকে সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। আর কিছু দেখা যায় না। সে বাড়ি ফিরিল। বাড়ি অন্ধকার। আলো জ্বালা হয় নাই।

সে চীৎকার করিয়া ডাকিল—যশো—যশো!

হঠাৎ নজরে পড়িল—গোয়াল-ঘরে আলোর আভাস। গোয়ালের ঝাঁপ ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, লছমী শাবক প্রসব করিতেছে। আলো হাতে যশোদা দাঁড়াইয়া আছে। অদ্ভুত দৃষ্টি তাহার চোখে। কিন্তু সেদিকে সে খেয়াল করিল না।

লছমীর বাচ্চা হইতেছে—ইহাতেই পানু খুশি হইল। এবার লছমী যে রকম মোটাসোটা হইয়াছে, তাহাতে সে এবার দুধ ঢালিয়া দিবে। ভাবিতে ভাবিতে অন্ধকারেই আসিয়া সে বালতিটা রাখিয়া ঘর খুলিয়া ঢুকিল কাপড় গামছার জন্য। সামনে পড়িয়া আছে বাতাসা-কাটা খেজুরের চ্যাটাইটা। চ্যাটাইটায় পা না দিয়া উপায় নাই। সে চ্যাটাইটার উপর পা দিতে দ্বিধা করিল না। চ্যাটাইয়ে কাদা লাগিবে, সেই কাদা বাতাসায় লাগিবে। তা লাগুক, লোকের পেটে তাহার পায়ের ধুলা যাইবে। চ্যাটাইয়ের উপর পা দিয়া সে দড়ির আলনার দিকে হাত বাড়াইল। সঙ্গে সঙ্গে সে অনুভব করিল—একটা ঠাণ্ডা মসৃণ গোল দড়ি এক মুহূর্তে তাহার পায়ে জড়াইয়া গেল। হিমশীতল তাহার স্পর্শ! গাঢ় অন্ধকার। চোখে কিছু দেখিবার উপায় নাই। কিন্তু বুঝিতে তাহার কষ্ট হইল না যে, সে সাপের মাথায় পা দিয়াছে, সাপটা লেজ দিয়া তাহার পায়ে পাক দিয়া জড়াইয়া ধরিয়াছে। সে একবিন্দুও চঞ্চল হইল না। বাঁচিয়া সে গিয়াছে; মাথাটাই পায়ের তলায় চাপা পড়িয়াছে, নহিলে এতক্ষণ কাঁটার মত দাঁত বসিয়া যাইত কখন। কিন্তু সাপের লেজের পাকও বড় কম সাংঘাতিক নয়। মুহূর্তে মুহূর্তে কষিয়া ধরিতেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই অসাড় করিয়া ফেলিবে। সে জানে। হা-ঘরেদের মধ্যে থাকিয়া সাপ সম্পর্কে অনেক কিছু শিখিয়াছে। সাপ ধরিতেও জানে। কিন্তু অন্ধকারে সাপ ধরা যায় না। পায়ের চাপ শিথিল হইবার সঙ্গে সঙ্গে শয়তান মরণ-কামড় বসাইয়া শোধ লইবে। সে চীৎকার করিয়া ডাকিল—যশো!

আবার ডাকিল—যশো! তাহার ডাক বর্ষারাত্রির নদীকূলে প্রতিধ্বনিত হইয়া ফিরিয়া আসিল। কিন্তু যশোদার কোন সাড়া আসিল না। কালা বোবা যশোদা শুনিতে পায় নাই।

এদিকে সাপটা পাক কষিতেছে। উপায়ান্তর না দেখিয়া সেও দুরন্ত চাপে পা দিয়া দলিতে আরম্ভ করিল পায়ের তলায় চাপা-পড়া খেজুরের চ্যাটাইয়ের অংশটাকে। উহারই নীচে আছে সাপটার মাথা। সেটাকে পিষিয়া ফেলিবে সে।

পায়ের শিরাগুলা টনটন করিতেছে। প্রাণপণে আবারও চীৎকার করিয়া ডাকিল—যশো—যশো! পানু শুনিল, তাহার ডাক ডাকাতের হাঁকের মত বর্ষণসিক্ত নদীর বাঁকে-বাঁকে প্রতিধ্বনিত হইয়া ফিরিতেছে। কিন্তু তবুও যশোদার কোন সাড়া নাই। বোবা কালা যশোদা বিহ্বল হইয়া দেখিতেছে লছমীর সন্তান-প্রসব।

দাঁতে দাঁতে ঘষিয়া নিষ্ঠুর আক্রোশে সে পায়ের চাপ মারিল—পিষিল—দলিয়া দিল—কঠিন দলনে দলিয়া দিল। হঠাৎ পাশের দেওয়ালে হাতে ঠেকিল একটা লোহার বড় গজাল। গজালটাকেই টানিয়া তুলিয়া সেটার তীক্ষ্ণ প্রান্তভাগ দিয়া আন্দাজ করিয়া সাপটার বেড়গুলাকে কাটিতে আরম্ভ করিল। কাটিয়াও ফেলিল। পায়ের বেড় কাটিয়া সে লাফ দিয়া সরিয়া আসিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। তারপর সে গেল গোয়াল-ঘরে। আলো হাতে লইয়া যশোদা তখনও দাঁড়াইয়া আছে। লছমী একটা শাবক প্রসব করিয়াছে। পানুকে দেখাইয়া যশোদা

আঁউ-আঁউ করিয়া উঠিল। লছমীর বাচ্চাটাকে দেখাইল—আর সে হাত দিল নিজের গর্ভের উপর। কিন্তু সেদিকে আকৃষ্ট হইবার মত মনের অবস্থা তখন পানুর ছিল না। সে তাহার হাত হইতে আলোটা ছিনাইয়া লইয়া ঘরে আসিয়া দেখিল, সাপটার মাথার দিকটা তখনও নড়িতেছে। হাত দেড়েক লম্বা একটা গোখুরা। সে শিহরিয়া উঠিল।

যশোদা তখন নিজের আনন্দে মত্ত। গর্ভে তাহার সন্তান।

পানুও নিজের অবস্থা উপলব্ধি করিয়া চিন্তিত হইল। বার বার তাহার মনে হইল—ওই কালা মেয়েটার কানে না শোনার জন্য আজ যদি সে মরিয়া যাইত! আবার কোনদিন যদি এমন ঘটে!

ভাবিতে ভাবিতে সে স্থির করিল, কানওয়ালা আর একটা মানুষের তাহার প্রয়োজন আছে। কিন্তু কোথায় পাইবে? হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল একটা মেয়ের কথা। কঙ্কালসার একটা মেয়ে, বয়স বেশী না হইলেও যশোর চেয়ে বেশী। মেয়েটা ভিক্ষা করিয়া খায়; কিন্তু ভিক্ষুকের ঘরের মেয়ে নয়, গৃহস্থ ঘরের মেয়ে। এই পথে মধ্যে মধ্যে নদী পার হইয়া ভিক্ষায় আসে, এপারের বাবুদের ওই গ্রামে। কঙ্কালসার মেয়েটার চোখ দুইটা বড় বড়, আর চুল আছে এক বোঝা। বেশ লাগে পানুর। কথাবার্তাও মেয়েটার ভাল। মধ্যে মধ্যে জল চাহিয়া খায়। প্রথম দিন পানু তাহাকে রূঢ় ভাষায় বলিয়াছিল—বাতাসা-পাটালি চাইবার ফন্দী বার করেছিস ভাল। জল কি কেউ শুধু দেয়, অ্যাঁ?

মেয়েটা অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়াছিল, তারপর বলিয়াছিল—না। শুধু জল।

—শুধু জল? ওই তো সামনেই নদী, ওখানে গিয়ে খা না।

মেয়েটা চলিয়া যাইতেছিল। পানুই কিন্তু আবার ডাকিয়া তাহাকে একখানা বাতাসা সমেত জল দিয়াছিল।—নে খা। নইলে নজরে আমার সব খারাপ হবে। যে ড্যাবড্যাবে চোখ।

ওই মেয়েটাকে সহজে পাওয়া যাইবে। নিশ্চয় পাওয়া যাইবে। পানুরও মেয়েটাকে ভাল লাগে।

পানুর অবস্থা সচ্ছল, সুতরাং একটার স্থলে দুইটা তিনটা বিবাহে অবশ্যই অধিকার আছে। মেয়েটা কিছুকাল পূর্বে কোন একজনের সঙ্গে দেশান্তরী হইয়া চলিয়া গিয়াছিল। কিছুদিন আগে রুগ্ন দেহ লইয়া গ্রামে ফিরিয়াছে। আত্মীয়স্বজনে ঘরে লয় নাই। ভিক্ষা করিয়াই মেয়েটা খায়। কিন্তু পানুর ওসবে কোন আপত্তি নাই। মানুষ—মানুষ। বাস্। পানু তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া সরাসরি বলিল—আমাকে বিয়ে করিস তো তোকে খেতে পরতে দোব।

মেয়েটা অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল পানুর মুখের দিকে। পাপ প্রস্তাব অনেকে করে, কিন্তু এমন ভাবে 'বিবাহ করবি'? এ প্রশ্ন কেহ করিতে পারে বলিয়া তাহার ধারণা ছিল না। পানু অসহিষ্ণু হইয়া প্রশ্ন করিল—কি বলছিস? করবি আমাকে বিয়ে? আমি বিয়ে করব আবার।

মেয়েটা এবার বলিল—কেন? তোমার সে বউ?

—সেও থাকবে। তুইও থাকবি। দরকার হলে আরও একটা বিয়ে করব। তোকে বিয়ে করব, খেতে দোব, পরতে দোব, শুধু কানে কথা শুনবি, মুখে কথা বলবি, কাজকর্ম করবি

সেই জন্যে। নইলে ভাগ। তুই তো ভাগাড়ের মড়ি!

মেয়েটা খানিকটা ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল—বেশ। কিন্তু তাড়িয়ে দিলে আমি যাব না। আজন্ম খেতে পরতে দিতে হবে। ভদ্রলোকের কাছে বল তুমি সেই কথা।

পানু বলিল—আলবৎ। চল, কার কাছে যেতে হবে।

ভদ্রলোকের কাছে বলিয়া পানু তাহাকে লইয়া ফিরিবার পথে একটা দেবালয়ে গিয়া মালা বদল করিয়া বিবাহ করিয়া ঘরে আনিল। মেয়েটা সলজ্জভাবে বলিয়াছিল—আজই?

পানু বলিয়াছিল—আজই ছেড়ে এখুনি। চল।

মালা পরিয়া মেয়েটাকে লইয়া ঘরে ফিরিতেই যশোদা আগাইয়া আসিল। আঁউ-আঁউ করিয়া প্রশ্ন করিল—কে? ও কে?

পানু তাহাকে ব্যাপারটা বুঝাইতে চেষ্টা করিল।

যশোদা যেন পাথরের পুতুল হইয়া গেল। সে সমস্ত দিন কিছু খাইল না। পানু তাহাকে কত ডাকিল, সাড়া দিল না। চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

রাত্রে পানুর হঠাৎ শ্বাস যেন রুদ্ধ হইয়া আসিল। ধোঁয়ার গন্ধে ভিতরটা জ্বলিয়া গেল। পাশে নূতন বউটা গোঙাইতেছে। পানু কতকগুলা বনফুল বিছানায় বিছাইয়া ফুলশয্যা করিয়াছিল। ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল সে। ঘরের মধ্যে নিশ্বাস লওয়া যায় না। খানিকটা দূরে শুইয়া আছে যশোদা। তাহার সাড়া নাই। পানু বিছানা খুঁজিয়া, দেখিতে চাহিল যশোদাকে। হাত বাড়াইয়া খুঁজিল, যশোদা নাই। মুহূর্তে সে সব বুঝিয়া লইল। কোনমতে আসিয়া দরজা খুলিতে চেষ্টা করিয়া দেখিল, এবার দরজার ফাঁক দিয়া চোখে পড়িল উপরে লাল আগুনের ছটা। ঘরে আগুন লাগিয়াছে—লাগিয়াছে নয়, যশোদা আগুন দিয়া পলাইয়াছে। ধোঁয়ায় শ্বাসনলী ফাটিয়া যাইবে। প্রাণপণ শক্তি প্রয়োগে সে দরজাটা টানিল। সে টানে পলকা কাঠের দরজার জোড়াটা ছাড়িয়া গেল। পানু এবার হিড়হিড় করিয়া নূতন বউটাকে টানিয়া আনিয়া বাহিরে ফেলিল। যশোদাকে সে খুঁজিতে চেষ্টা করিল না। সে বেশ বুঝিয়াছে, ঘরের মধ্যে খড়ের ধোঁয়া এবং ধোঁয়ার উপরে লাল আগুনের ছটা দেখিয়াই সে বুঝিয়াছে—ঘোষবাবার ঘরে আগুন দিয়া সে যেমন আক্রোশ মিটাইয়াছিল, যশোদা তেমনি তাহার ঘরে আগুন দিয়া আক্রোশ মিটাইয়া পলাইয়া গিয়াছে। ঘরের বাহির হইতে শিকল দেওয়াটাই তাহার বড় প্রমাণ। তাহার ভাগ্য যে, বারান্দার প্রান্তে আগুন দিয়াছে যশোদা, ঘরের ভিতর আগুন দেয় নাই। বুদ্ধি হয় নাই শয়তানীর। ঘরটা গুমিয়া গুমিয়া পুড়িতেছে। আরও ভাগ্য যে সময়টা বর্ষাকাল, বর্ষণসিক্ত চালের খড় দাউদাউ করিয়া জ্বলে নাই। যশোদা পলাইয়াছে। সে ছুটিয়া গেল গোয়াল-ঘরের দিকে। না, লছমী মংলী আছে। তাহাদের লইয়া যায় নাই। শীতল স্নিগ্ধ বাতাসে বসিয়া সে এতক্ষণে হাঁপাইতে লাগিল। নূতন বউটা এখনও মড়ার মত পড়িয়া আছে। উঃ, সেদিনের কথা আজও পানুর মনে আছে।

সে ডাকিল—আরে, এ! এ রাজিয়া!

বউটা পাশ ফিরিল কোনমতে।

* * *

তিন দিন পরে যশোদার সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল।

একটা মেলায়—রথের মেলায়, তাহাকে পাওয়া গিয়াছিল। এক মৃত ভ্রূণ প্রসব করিয়া যশোদা মরিয়া পড়িয়া ছিল রক্তাক্ত কলেবরে।

থানার কন্‌স্টেব্‌ল আসিয়াছিল তাহার কাছে।

তাহার মাথা গরম হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু কন্‌স্টেব্‌ল বলিল—লাসটা তাহার দেখা দরকার।

সে গিয়াছিল।—হ্যাঁ, যশোদা; আমার পরিবারই বটে। তিন দিন আগে আমার ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে পালিয়ে এসেছিল। হতভাগী যশোদা! আপনার আক্রোশের বিষে মরিয়া গেল। না, মানুষে তাহাকে মারিয়াছিল। কালা বোবা হাবা মেয়ে একটা। মানুষেরা দয়া করিল না, লালসার অত্যাচারে তাহাকে মারিয়া ফেলিল।

পানু সেই ভ্রূণটাকে পরম বিস্ময়ের সঙ্গে দুই হাতে তুলিয়া দেখিয়া নামাইয়া দিয়া চলিয়া আসিয়াছিল।

দুনিয়াভর মানুষের এক ব্যাপার—এক খেলা চলিতেছে। সব নিজে, সব নিজে। নিজের জন্যই মানুষ খেলা খেলিতেছে। যশোদা তাহার সঙ্গে নিজের স্বার্থে শয়তানী-খেলা খেলিল। মানুষ তাহাকে লইয়া নিজেদের শয়তানী-খেলা খেলিল।

ষোল

ফিরিবার সময় সমস্ত পথটা সে ঐ কথাই ভাবিয়াছিল। সেদিনও তাহার জীবনের আগাগোড়া কাহিনী মনে মনে উত্তপ্ত কড়াইয়ের ফুটন্ত গুড়ের মত আলোড়িত হইয়াছিল—নীচের জিনিস উথলিয়া ফুলিয়া উপরে ফাঁপিয়া উঠিয়াছিল।

দুনিয়ার সব ফাঁকি, সব মেকী। ঝুট—ঝুট—সব ঝুট। মিথ্যা—বাজে। ভালবাসা মমতা দয়া মায়া বিলকুল ঝুট। ধর্ম পুণ্য—মিথ্যা বাজে। ওগুলা সব আবার ওই ভেল্কির খেলা। ও সবগুলা এক-একটা ভেল্কি। ওই ভেল্কি লাগাইয়া মানুষ আপন আপন কাজ হাঁসিল করিয়া লয়।

যশোদার ভেল্কি আজ সে দেখিল। ওঃ, কি মিঠা মিহি ভেল্কি! কেয়াবাৎ ভেল্কি! যশোদার জীবনের আগাগোড়াই কি এমনি ধারার ভেল্কি? সে যে কোনদিন ভাবিতে পারে নাই পানু। আঃ, যশোদার ভেল্কিটা যদি না ভাঙিয়া যাইত! আহা-হা রে! যশোয়া—যশোদিয়া—যশিয়া—যশোমতিয়া—যশি—যশো—কত নামেই সে যে তাহাকে ডাকিত।

আজও যশোদাকে মনে পড়িলে পানুর চোখে জল আসে।

বাড়ি ফিরিবার পথে ওই কথা ভাবিতে ভাবিতে সে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া গিয়াছিল। এমন উদ্‌ভ্রান্ত যে, তাহার পথ পর্যন্ত ভুল হইয়া গিয়াছিল। কোপাই নদীর ঘাটে আসিয়া তাহার সে খেয়াল হইল। নদী কোপাই-ই বটে। কিন্তু এ ঘাটটা তো তাহার বাড়ির পথের ঘাট নয়। কই, ওপারে উঁচু ডাঙার উপর তাহার দোকানখানা কই? দোকানের পিছনে সাঁওতালদের পাড়াটা কই? ওঃ, এ সে চিৎরার ঘাটে আসিয়া পড়িয়াছে। চিৎরার ঘাটেই নদী পার হইয়া অনেকটা ঘুরিয়া তবে সে আপনার বাড়ির এলাকায় আসিয়া পৌঁছিল। দূর হইতে তাহার বাড়িটা দেখা যাইতেছিল। বাড়ির একটা পাশের দিক—যে দিকটায় যশোদা করিয়াছিল সব্জীক্ষেত। সব্জীক্ষেতের সবুজ গাছগুলি দূর হইতেই নজরে পড়িতেছিল। যশো এই ক্ষেতের পত্তন করিয়াছিল। যশো! না, সে শয়তানী।—শুধু যশো কেন, সব—সব—শয়তান আর শয়তানী।

হনহন করিয়া পানু আসিয়া ক্ষেতের পাশে কিছুক্ষণ দাঁড়াইল; তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে বাড়ির সামনের দিকে আসিল। আঃ, এই দেখ আর এক শয়তানী!

দোসরা বউটা পিছন ফিরিয়া বসিয়া খাইতেছে। খুব জমাইয়া খাওয়াটা আরম্ভ করিয়াছে। পানু আসিয়াছে—সে খেয়াল পর্যন্ত নাই। পানু গিয়া পিছনে দাঁড়াইল। ও-হোঃ! এক বাটি দুধ, আট-দশখানা বাতাসা, খানিকটা ময়দা-গোলা—ওরে বাপ রে!

পানু দাওয়ার উপর উঠিয়া দাঁড়াইল।

বউটা চমকিয়া উঠিল—মুখখানা কেমন ফ্যাকাসে হইয়া গেল। পানু বলিল—লে, খেয়ে লে। খেয়ে লে।

বউটার তবু হাত নড়ে না।

পানু আবার বলিল—খা খা। লে খা। বলিয়া সে ঘরের ভিতর ঢুকিল। তৃষ্ণায় গলা শুকাইয়া গিয়াছে। ঢকঢক করিয়া এক গ্লাস জল খাইয়া সে বাহিরে আসিল, দেখিল, বউটা এখনও তেমনিভাবে বসিয়া আছে।

—আরে—। পানু ধমক দিল।—লে—লে—খেয়ে লে। খা বলছি, খা।

বউটা ভয়ে এবার দুধের বাটিটা মুখে তুলিয়া ধরিল। কিন্তু থরথর করিয়া তাহার হাত কাঁপিতেছে। পানু হাসিয়া আবার বলিল—খা খা। খাওয়া শেষ করিয়া বাটিটা মাটিতে নামাইবা মাত্র পানু উঠিয়া গিয়া তাহার চুলের মুঠি ধরিল।—আয়, এইবার আয়।

মেয়েটা চীৎকার করিয়া উঠিল।

পানু অন্য হাতে তাহার গলা টিপিয়া ধরিয়া বলিল—ক্যাঁক করে টিপে মেরে দেব যদি চিললাবি।

মেয়েটা চুপ হইয়া গেল। আতঙ্কে বিস্ফারিত বড় বড় চোখ দুইটা হইতে জলের ধারা গড়াইয়া পড়া কিন্তু বন্ধ হইল না।

ভেল্কি! এও ভেল্কি!

বহুৎ মিঠা আর মিহি ভেল্কি কিন্তু। মেয়েটা রোগা হইলেও দেখিতে ভাল। এও এক ভেল্কি! পানু মেয়েটার চুল ছাড়িয়া দিল।—যাও।

মেয়েটা ভয়ে এমন অভিভূত হইয়া গিয়াছিল যে, পানু চুলের মুঠি ছাড়িয়া দেওয়া সত্ত্বেও নড়িতে পারিল না।

পানু আবার বলিল—যাও!

মেয়েটা এবার সকাতরে বলিল—আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছ?

পানু হাসিতে আরম্ভ করিল।

মেয়েটা তাহার পা দুইটা জড়াইয়া ধরিল।—তোমার পায়ে পড়ি।

পানু কপালে ঠেলা দিয়া তাহার মুখখানাকে চোখের সামনে তুলিয়া ধরিল। মেয়েটার চোখ দিয়া জলের ধারার বিরাম নাই। মেয়েটা বলিল—আর আমি চুরি করে খাব না।

পানুর রাগ বাড়িয়া গেল। তাহার খেয়াল হইয়া গেল—'চুরনী' মেয়েটা চুরি করিয়া খাইয়াছে। সে এবার দুমদাম শব্দে গোটা কয়েক কিল তাহার পিঠে বসাইয়া দিয়া ছাড়িয়া দিল। বহু কষ্টে মেয়েটা সে আঘাত সামলাইল। মেয়েটা তবু তাহার পা ছাড়িয়া দেয় নাই।.. কোন রকমে সামলাইয়া লইয়া মেয়েটা বলিল—আমাকে তাড়িয়ে দিয়ো না, না খেয়ে আমি মরে যাব। আর—আর মেরো না এত জোরে। মরে যাব।

ওই এক ভেল্কি! সকলের বড় ভেল্কি! পেট! ওই পেটই সব চেয়ে বড় ভেল্কি!

পানু মেয়েটাকে আর কিছু বলিল না। কথাটা মেয়েটা মিথ্যা বলে নাই। যে রকম হাড়-পাঁজরা বাহির হইয়া আছে, তাহাতে ওর মরিয়া যাওয়া কিছু আশ্চর্য নয়। মার খাইলেও মরিয়া যাইবে, তাড়াইয়া দিলেও না খাইয়া মরিয়া যাইবে।

আরও আশ্চর্যের কথা, পানু পরদিন হইতে নিজেই মেয়েটার জন্য দুধের বরাদ্দ করিয়া দিল। মেয়েটার মুখখানা দেখিয়া কেমন মায়া হয়। ডবডবে চোখ দুইটাতে ভেল্কি আছে।

ওঃ, সে যে কি ভেল্কি, রাজিয়ার চোখের যে কী ভিল্কি—সে ভাবিয়া পানুর আজও চমক লাগে। মেয়েটার ডাকনাম রাজি। রাজবালা বা রাজলক্ষ্মী কি রাজরাণী কি রাজুবালা—সে পানু জিজ্ঞাসা করে নাই। প্রথম দিনই তাহাকে সে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—কি নাম তোর?

সে বলিয়াছিল—রাজু।

পানু বলিয়াছিল—রাজু? রাজু?

—হ্যাঁ।

প্রথম প্রথম সে তাহাকে 'রাজি' বলিয়াই ডাকিত। রাজির দেহ দুর্বল—সে বেশী খাটিতে পারিত না, এবং সেজন্য তাহার ভয় ছিল অত্যন্ত। কিন্তু তবু রাজির একটা বড় গুণ ছিল। রাজি বড় বাহার জানে। ঘর-দুয়ারগুলিকে সে এমনভাবে সাজাইয়া গুছাইয়া ঝকঝকে করিয়া তুলিল, চারিদিকে এমন একটা বাহার তৈয়ারী করিয়া তুলিল যে, পানুর সেটা ভাল লাগিল। পূজার সময় ঘর নিকাইল রাজি, দেওয়ালের পাশে আলপনা আঁকিল। ঘরের দাওয়ার পাশে কতকগুলা গাঁদা দোপাটির চারা লাগাইল। কার্তিকের প্রথমে তাহাতে ফুল ধরিল।

দাওয়ার উপর এমন বাহার করিয়া দোকানটা সাজাইয়া দিল রাজি! ইটের থাক দিয়া তক্তা পাতিয়া সিঁড়ি বানাইয়া তাহার উপর থাকে থাকে সে বাতাসা-কদমা-মুড়ি-মুড়কির দোকান সাজাইয়া দিল। পানুর সেটা ভারি ভাল লাগিল। সে আদর করিয়া বলিল—বহুৎ আচ্ছা রে রাজি!

রাজি তাহার দিকে ডবডবে চোখ দুইটি তুলিয়া হাসিল।

আশ্চর্যের কথা, পানু আজ রাজির চোখে যে ভেল্কি দেখিল, সে ভেল্কি কখনও দেখে নাই। শুধু রাজির চোখেই নয়, রাজির মুখেও ওই ভেল্কির ছটা খেলিতেছে। মুখখানা বেশ পুরন্ত হইয়া উঠিয়াছে। রাজির রঙ ফরসা। ফরসা রঙে রাজির গালে লালচে আভা। অনাবৃত হাত দুইখানা দেখিয়া সে মুগ্ধ হইয়া গেল—নরম সুডৌল হইয়া উঠিয়াছে হাত দুইখানা। পানু আগাইয়া গিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল। রাজি তাহার মুখের দিকে চাহিল, চাহিয়াই কিন্তু সে আজ নির্ভয়ে আপনার হাত টানিয়া লইয়া কার্যান্তরে চলিয়া গেল।

পানু সেইদিন ডাকিয়াছিল—রাজিয়া!

রাজিয়া উত্তর দেয় নাই। ভেল্কিদারনীরা ঠিক জানিতে পারে—ভেল্কি লাগিয়াছে কি না! ইহার পর হইতে রাজিয়া দূরে দূরে থাকিতে আরম্ভ করিল। আশ্চর্য ভেল্কি! পানুর জোর-জবরদস্তি কোথায় যেন উড়িয়া গেল! দূর হইতে রাজিয়া ডবডবে চোখের ভেল্কি-মাখা দৃষ্টি তুলিয়া পানুর দিকে চায়। সন্ধ্যা হইতে আলাদা ঘরে কপাট বন্ধ করিয়া শোয়। পানু ডাকিলে সাড়াও দেয় না। পানু কিন্তু প্রাণপণে ভেল্কি হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু একদিন ভেল্কি পানুর রক্তে আগুন ধরাইয়া দিল।

পানু কোন কাজে গাঁয়ে গিয়াছিল। ফিরিল যখন, তখন অনেক বেলা হইয়াছে। বাহিরে

দাওয়ার উপর রাজি ছিল না। দরজাতেও তালা ঝুলিতেছিল। কোথায় গেল রাজি? দাওয়ার উপর বসিয়া আছে, এমন সময় রাজি স্নান করিয়া ফিরিল। ভিজা কাপড়ের স্বচ্ছতা রাজির নূতন পরিপুষ্ট দেহখানি অকুণ্ঠিতভাবে পরিস্ফুট করিয়া দিয়াছে। ভিজা কাপড়ে রাজিকে পানু এক-দিনও দেখে নাই। পানু জল খাইয়া লছমী মংলী এবং নূতন বাছুরটাকে লইয়া যাইত নদীর ধারে, সেই সময়টি ছিল রাজুর স্নানের নির্দিষ্ট সময়।

পানুর রক্তের আগুন চোখে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সে সেই দৃষ্টি লইয়া রাজির সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। রাজি সভয়ে শিহরিয়া উঠিল, কিন্তু আর বিদ্রোহ করিতে সাহস করিল না।

সে আমলে অর্থাৎ পানুকে যখন তাহার ভেল্কিতে সে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল ও পাগল করিয়া রাখিয়াছিল—তখন সে প্রায় প্রতিদিনই কিছু না কিছু আদায় করিয়া লইত। পানু তাহার কাছে আসিলেই সে হেলিয়া দুলিয়া বলিত—আজ কিন্তু আমার একটি জিনিস চাই।

রাজিয়ার অদ্ভুত যাদু! পানু কিছুতেই তখন সচেতন হইতে পারিত না। রাজিয়াও তাহার দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত কখনও ধরা দিত না। তখন এ কথাগুলি মনে হইত না। এখন মনে হয়। আজ বেশী করিয়া মনে হইতেছে। ভেল্কিদারনী রাজিয়ার ক্ষমতাকে সে তারিফ করে। তাহার দাবি পূরণ না করিয়া পানু শক্তিপ্রয়োগে রাজিয়াকে কাছে টানিবার চেষ্টা করিলে রাজিয়া ধরা দিত মড়ার মত। ওই চোখে সে এমন করিয়া চাহিত যে, পানু তৎ-ক্ষণাৎ হার মানিত। হাসিয়া আদর করিয়া দাবির অধিক দিয়া তবে নিজে সে খুশি হইত। দাবির চেয়ে বেশী দেওয়ার একটা তৃপ্তি আছে।

রাজিয়াব বুদ্ধিরও সে তারিফ করে।

যশোদা তাহাকে ক্ষেতের নেশা ধরাইয়াছিল। রাজিয়া তাহাকে চাষের লাভের পথ বাতলাইয়া দিল।

সে তাহাকে বলিল—ভুট্টা লাগিয়ে কি হবে? ধান চাষ কর।

—ধান চাষ? পানুর মস্তিষ্কে কল্পনা আছে, কিন্তু প্রদীপের সলিতার মত তাহার প্রান্তে অগ্নিশিখা সংযোগে জ্বালাইয়া দিতে হয়। মুহূর্তে পানুর দৃষ্টি গিয়া পড়িল গ্রীষ্মের চষা-খোঁড়া তকতকে ধানক্ষেত্রের উপর। সুবিস্তীর্ণ ধান্যক্ষেত্র। বর্ষার সময়ের ছবি তাহার মনে জাগিয়া উঠিল—সবুজ কাঁচা ধানে ভরা ক্ষেত, তারপর বর্ষার শেষে ধানের গাছে শীষ জাগিয়া উঠে। সদ্য বাহির হওয়া শীষের মধুর গন্ধের স্মৃতি তাহার মনে পড়িল। তারপর পাকা ধানের ক্ষেত। সোনার বরণ ধান। ধান মাড়াই হয়। মরাইয়ে উঠে। খামার আলো করিয়া থাকে। ঘোষ-বাবার ক্ষেত-খামারের কথা মনে পড়িল। সেই চাষী যে তাহাকে ঘোষবাবার বিরুদ্ধে পরামর্শ দিয়াছিল, তাহার খামারের কথা মনে পড়িল। পানু লাফাইয়া উঠিল—হ্যাঁ, সে ধান চাষই করিবে।

হাসিয়া রাজিয়া বলিল—জমি কেনো, তারপর গরু কেনো—হাল কর। তুমি চাষ করবে, আমি তোমার দোকান করব।

ধানের জমি কিনিবার জন্য পানু ক্ষেপিয়া উঠিল। জমি মিলিল। দুই শো টাকা দিয়া নদীর ধারে পাঁচ বিঘা জমি কিনিল সে এক চাষীর কাছে।

পাঁচ বিঘা জমির জন্য এক জোড়া হেলে বলদ কেনা যায় না। পানুর বুদ্ধিতে কিনিতে কোন বাধা ছিল না। রাজিই ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিল—মুখে মুখে হিসাব দেখাইয়া দিল। অগত্যা জমিটা চাষের ব্যবস্থা হইল হাল কিনিয়া। অর্থাৎ ভাড়া লইয়া চাষী তাহার জমি চষিয়া দিয়া

গেল, পানু নিজে এবং সঙ্গে সঙ্গে জনমজুর লইয়া জমিটা আবাদ করিয়া ফেলিল। পানু চাষের পদ্ধতি খুঁটিনাটি ভাল জানিত না। রাজি জানিত, সে-ই সব বলিয়া দিত। তাহার উপর পানু পরিশ্রম করিল অসুরের মত।

রাজিয়া মাঠেই তাহার জন্য খাবার লইয়া আসিত। বসিয়া বসিয়া ভুলচুক দেখাইয়া দিত, মজুরদের ফাঁকি ধরাইয়া দিত। পানু খাইত, সে বলিয়া যাইত।

প্রকাণ্ড বড় বাটিতে রাশীকৃত মুড়ি, লছমীর দুধ, বাতাসার গুঁড়া। পানু পেট ভরিয়া খাইত। আবার সন্ধ্যা পর্যন্ত পরিশ্রম করিয়া ছোট চুপড়ি ভরিয়া মাছ ধরিয়া বাড়ি ফিরিত। রাজিয়া আদর করিয়া তাহার গায়ের কাদা ধুইয়া তেল মাখাইয়া দিত। স্নান করিয়া ফিরিলে থালার উপর ঢালিয়া দিত গরম ভাত মাছ তরকারি ডাল।

চাষ শেষ হইলেও পানুর জমির নেশা গেল না। জমির ধারে গিয়া বসিয়া থাকিত। প্রতিদিন লক্ষ্য করিত, গাছগুলি কেমন বড় হইতেছে। প্রথম প্রথম সে বিঘত মাপিয়া দেখিত। চাষীদের কাছে জানিয়া আসিত চাষের জন্য কখন কি করিতে হইবে। ডাক-সংক্রান্তির অর্থাৎ আশ্বিনের সংক্রান্তির দিন চাষী মাঠের আলে দাঁড়াইয়া ধানকে ডাকে—ধান ফুলাও—ধান ফুলাও। অর্থাৎ শস্যপূর্ণ ধান্যশীর্ষ বাহির হও। পানু সেদিন ডাক দিয়া গলা ফাটাইয়া ফেলিল।

ধানের শীষ বাহির হইল—ধান পাকিল। পানু পাকা ধান কাটিয়া ঘরে আনিল। ধান মাড়িয়া ঘরের দাওয়ায় রাখিয়া তাহার সামনে বসিয়া রহিল—খেলনার রাশির সম্মুখে রুগ্ন শিশুর মত। খেলিবার সাধ্য নাই, কিন্তু প্রাপ্তিতে তাহার প্রাণ ভরিয়া গিয়াছে। রাজিয়ার হাসিঠাট্টার বিরাম ছিল না। সে কিন্তু তাহার ভালই লাগিল। শুধু ভাল লাগিলই নয়। তাহার নেশা ধরিয়া গেল। হঠাৎ সে রাজিয়াকে দুই হাতে ছোট শিশুর মত তুলিয়া লইয়া উপরের দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া অনায়াসে লুফিয়া লইল।

ভয়ে রাজিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—না—না—ওগো, না। কিন্তু বর্বর পানু তখন আনন্দে অধীর হইয়া উঠিয়াছে। সে আবার তাহাকে ছুঁড়িয়া দিয়া লুফিয়া লইল। রাজিয়ার চুল খুলিয়া গেল। মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। সে হাঁপাইতেছিল। কিন্তু তবু পানু থামিল না। সেই শীতের উপভোগ্য দ্বিপ্রহরে জনহীন নদীতীরের বাড়ির অঙ্গনে সে তাহাকে লইয়া লোফালুফি করিয়া সত্য সত্যই খেলা সুরু করিয়া দিল। রাজিয়ার আর প্রতিবাদের কি অনুনয়েরও সাধ্য ছিল না। তাহারও যেন চেতনা হারাইয়া যাইতেছে।

হঠাৎ পানু তাহাকে মাটির উপর বসাইয়া দিল, বলিল—বস। রাজুর বসিবার শক্তি ছিল না। সে মাটির ধূলার উপরেই শুইয়া পড়িল। পানু লাফ দিয়া দাওয়ায় উঠিয়া ঘর হইতে একটা হেঁসো অস্ত্র লইয়া ফিরিয়া বলিল—তুই এতনা মিটা রাজিয়া!—আজ হাম তোকে ফাড়ব; কেটে দেখব—তোর ভিতর কি আছে! কিসে তুই এতনা মিঠা!

রাজুর সমস্ত শরীর যেন বিবশ অসাড় হইয়া গেল। পানুকে তো সে জানে। বন্য বর্বর একটা মানুষ,—দয়া নাই, মায়া নাই, নিষ্ঠুর। তাহার উপর এই দুপুরবেলা জনহীন নদীতীরে ঘর। পানুর বর্বর খেয়ালে, উন্মত্ত ইচ্ছায়, পরিত্রাণের কোন উপায় নাই। সে শুধু বড় বড় চোখ দুইটি মেলিয়া অসহায় সভয় দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। পানুর হাতে হেঁসো। চোখে উন্মত্ত দৃষ্টি। হঠাৎ পানু হাতের হেঁসোখানা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। আবার রাজুকে দুই হাতে উঠাইয়া লইয়া পরম সমাদরে দাওয়ার উপর তক্তাপোশে শোয়াইয়া দিয়া বলিল—তুই বহুৎ বোকা রে রাজিয়া! বহুৎ বোকা!

চতুর রাজিয়া হারিয়া গিয়াছে তাহার কাছে। সত্য সত্যই হারিয়া গিয়াছে। হার মানিয়া

লইয়াই রাজিয়া এতক্ষণে বলিল—একটু জল। পান্থ দোকানের সব চেয়ে বড় মিষ্টিটা তাহার হাতে দিয়া বলিল—খা। তারপর দিল এক ঘটি জল। রাজিয়ার বুদ্ধিতেই তাহার সব।

রাজিয়া সুস্থ হইয়া হাসিয়া বলিল—বাবা! আর তোমাকে আমি বুদ্ধি দেব না। এই আদর? মরে যাব আমি আদরে! নইলে, আরও বুদ্ধি দিতাম।

পান্থ বলিল—বাতাও, কি বুদ্ধি বল?

—না। শেষে আদর করে খুন করবে আমাকে? খুন হতে আমি পারব না।

—না বললেও খুন করব আমি। বাতলাও বুদ্ধি—বাতলাও।

হাসিয়া রাজিয়া বলিল—সে জানি আমি।

—তব্ বাতলাও।

—এবারের সব ধান বেচে টাকা জমা কর। তারপর আরও জমি কেনো। একখানা হালের জমি হলে ঠিক হবে। গরুগাড়ি হাল লাঙ্গল—

—বাস—বাস। ঠিক হ্যায়।

তাহাই করিবে সে।

কিন্তু সব কল্পনা লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল। বর্বর পান্থ দুনিয়ার হালচাল জানে না। রাজিয়ার বুদ্ধিও বৈষয়িক বুদ্ধিতে পাকা নয়।

মাস দুয়েক পরে।

পান্থ বাতাসা কাটিতেছিল, রাজিয়া তাহাকে সাহায্য করিতেছিল। হঠাৎ কাছেই কোথাও ঢোল বাজিয়া উঠিল।

দুইজনেই ফিরিয়া চাহিল।

সামনেই রাস্তার ওপারে নদীর তীরভূমিতে জমির উপর কতকগুলা লোক ঢোল বাজাইতেছে, একটা লাল পতাকা উড়িতেছে।

রাজু বলিল—ওগো!

পান্থ ছুটিয়া গেল।

রাজু হাঁকিয়া বলিল—আদালতের লোককে যেন মেরো না। শুনছ? মাথা খাবে, মরা মুখ দেখবে আমার।

জমি পান্থরই বটে। লোকগুলির মধ্যে আদালতের লোকও রহিয়াছে।

আদালতের কর্মচারী-পেয়াদা আসিয়া তাহার জমির বুকে একটা লাল পতাকা পুঁতিয়া দিল। পান্থ অবাক হইয়া গেল।

যাহার কাছে সে জমি কিনিয়াছিল, ঋণ করিয়াছিল সেই লোকটা। তাহারই ঋণের দায়ে মহাজন নালিশ করিয়া জমি নীলাম করিয়া লইয়াছে। ভকমা-আঁটা লালপাগড়ী পরা সরকারী পেয়াদা। পান্থ তাহাকে কিছু বলিল না।

সে গেল বিক্রেতা চাষীর কাছে।

—আমার টাকা ফিরে দে।

চাষী হাসিল।

পান্থ গর্জন করিয়া উঠিল—আমার টাকা দে!

—আদালত। আদালত আছে, সেখানে যা।

পান্থ লোকটাকে দুই হাতে আলগোছে তুলিয়া মাটির উপর আছাড় মারিয়া ফেলিয়া বলিল

—ফেল টাকা!

লোকটার চীৎকারে পাড়ার লোক আসিয়া জমিল। সকলে মিলিয়া ধরিয়া পানুকে বেশ ঘাকতক দিয়া খেদাইয়া দিল। পানু বাড়ি ফিরিল শিশুর মত চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে। প্রহারের বেদনায় নয়। সে আর কত ঠকিবে? সমস্ত পৃথিবীর উপর তাহার মর্মান্তিক অভিযোগ। দারোগা—জমাদার—কন্‌স্টেব্‌ল—গুরুঠাকুর—চারুদিদি—ঘোষবাবা—যশোদা—এই চাষীটা—সবার বঞ্চনার বিরুদ্ধে ঊর্ধ্বমুখে অভিযোগ জানাইয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া প্রান্তরটা ভরাইয়া দিল।

রাজিয়া তাহাকে বুদ্ধি দিল—মহাজনের কাছে যাও। টাকাটা দিয়ে জমি ফিরে নাও।

—না—না—না। বাঁধ তল্পী-তল্পা, বাঁধ। এ মুলুকেই আমি থাকব না।

রাজি অবাক হইয়া গেল।—তৈরী ঘর দোর?

পানু বলিল—ফের ঘর গড়ে লিব, চল। ই বেইমানের মুলুকে থাকব না—আমি থাকব না।

রাজি বলিল—এতগুলো টাকা—

—ভাগ। টাকা আমি করেছিলাম, আমিই ফের করব। চল হিঁয়াসে।

আঃ, দুনিয়া ছাড়িয়া যদি যাইবার জায়গা থাকিত!

সতেরো

কোপাই নদীর পারঘাটা হইতে উঠিয়া সে এখানে আসিয়াছে। অনেক দিন হইয়া গেল। বাড়ির পাশের পুকুর-পাড়ের গাছগুলির দিকে চাহিয়া দেখ—হিসাব কর, কতদিন হইল! এটা একখানি ছোট গ্রাম। পাশেই মাইল দুইয়ের মধ্যে একখানি বর্ধিষ্ণু গ্রাম আছে,—প্রায় ছোট-খাটো শহর। সেটা একটা মস্ত সুবিধা। জেলাটার সদর হইতে একটা পাকা সড়ক ওই বড় গ্রামের ভিতর হইয়া পানুর বাড়ির পাশ দিয়া জেলা পার হইয়া আরও কতকগুলা জেলার ভিতর দিয়া চলিয়া গিয়া মিশিয়াছে বাদশাহী সড়কের সঙ্গে। সেই সড়ক হইতে আরও একটা পাকা রাস্তা বাহির হইয়া ছোট গ্রামখানির ভিতর দিয়া অন্য দিকে গিয়াছে। এই চৌরাস্তাটার পাশে একটা প্রকাণ্ড মজা দীঘি। স্থানটা জনশূন্য, এখানে আশেপাশে কোন বসতি নাই। খানিকটা গিয়া তবে গ্রাম পাওয়া যায়। চৌরাস্তার মোড় হইতে প্রায় সিকি মাইল দূরে। চৌরাস্তার ধারে একটা বট গাছের ছায়ায় অনেকগুলি পথিক এবং মালবাহী গাড়ি বিশ্রাম করিতেছিল। পানুও তাহার দলবল লইয়া সেইখানে বিশ্রামের জন্য বসিয়া গেল। জায়গাটা বড় মনে ধরিল। রাজিয়া বলিল—দাঁড়াও না, দেখি পরখ করে।

রাজিয়ার বহুৎ বুদ্ধি। মাথা তাহার ভারি সাফ। বৈকালে পানু দেখিল, রাজিয়া সেই গাছতলাতেই ব্যবসা ফাঁদিয়া ফেলিয়াছে। রান্নার জন্য যে উনানটা পানু পাতিয়াছিল, সেইটাকেই আকারে বেশ খানিকটা বড় করিয়া লইয়া তাহাতে কাদা লেপিয়া বেগুনী ফুলুরি তৈয়ারী করিয়া ফেলিল। বাঁধা দোকান, পাতা সংসার তুলিয়া লইয়া আসিয়াছে। সবই ছিল তাহাদের সঙ্গে—বেগুন, কুমড়া, তেল, বেসম, লঙ্কা, নুন, পেঁয়াজ, এমন কি হিং পর্যন্ত। সব চেয়ে বাহাদুরি রাজুর এই যে, কিসের মধ্যে কি ছিল সে যেন তাহার মুখস্থ;—একটুখানি খুঁজিয়াই হিংয়ের পুরিয়াটা বাহির করিয়া ফেলিল। কয়েক ঝাঁক বেগুনী কড়া হইতে নামাইতেই দোকান

তাহার জমিয়া উঠিল। সন্ধ্যার দিকে আরও অনেক গাড়ি আসিয়া জমিয়াছিল—তাহারা সব রাজিয়ার দোকান ঘিরিয়া বসিল। সন্ধ্যা নাগাদ টাকা চারেকের বেগুনী ফুলুরি বেচিয়া সেদিনের মত দোকান সামলাইয়া রাজিয়া বলিল—হাঁ, এইখানেই দোকান কর। পরখের ফল ভাল।

পরের দিন রাজিয়াই গ্রামের ভিতর গিয়া একখানা ঘর ভাড়া করিল—সংসার পাতিল। অপরাহ্ণে আবার সাজসরঞ্জাম লইয়া গাছতলায় গিয়া বসিল। সেদিনও সে চার টাকার উপর বেগুনী ফুলুরি বেচিয়া বাড়ি ফিরিল। পরদিন সকাল হইতে বর্ধিষ্ণু গ্রামখানায় গিয়া লছমীর দুধ বেচিয়া আসিল। দুধের নিত্য যোগান দিবার ঘর পর্যন্ত ঠিক করিয়া আসিল। সে-ই খোঁজ করিল, ওই মজা দীঘিটার মালিক কে? এবং পানুকে সে-ই সঙ্গে লইয়া মালিকের কাছে গিয়া দীঘিটার পাড়ে কয়েক বিঘা জায়গা বন্দোবস্ত করিয়া লইল। মালিক এখানকার বড়বাবুরা। মস্ত ধনী। রাজিয়া খোদ বাবুর সঙ্গেই দরদস্তুর ঠিক করিল।

তাহার পরদিন হইতে লছমী, মংলী, নূতন বাচ্চাটা মজা দীঘির ঘাস খাইয়া ফিরিত, রাজিয়া গাছতলায় দোকান করিত, পানু মাটি কোপাইয়া কাদা করিয়া ঘর তুলিত। প্রথমে একখানি ছোট ঘর। তারপর বারান্দা। তারপর আবার ঘর। সেই ছোট ঘরখানি হইতে আজ তাহার টিনে-ছাওয়া মাটির কোঠা হইল। ক্রমে গোটা দীঘিটাই সে কিনিল। মজা দীঘি ভাঙিয়া পাঁচ বিঘা উৎকৃষ্ট ধানের জমি হইল, দীঘিটার এক পাড়ে তরকারি বাগান, অন্য তিনটা পাড়ে ফলের বাগান গড়িয়া উঠিল। এমনি সময় আবার পানু ঠকিল। চাৎকার করিয়া সে আকাশ ফাটাইয়া দিয়াছিল সেদিন। হঠাৎ রাজিয়া পলাইয়া গেল। সব হল রাজিয়ার পরামর্শে, অথচ রাজিয়া পলাইল!

তাহাকে ভুলাইয়া, ঘর-দোর সাজাইয়া দিয়া রাজিয়া ভাগিল।

ঘর হইবার পর দোকান পাতিয়াই রাজিয়া বলিল—বাকী জমিটা বেড়া দিয়ে সেখানকার মত তরকারির ক্ষেত কর।

পানু উৎসাহিত হইয়া উঠিল। সে এই চায়। ভীমের মত শক্তিশালী দেহ তাহার, বসিয়া বসিয়া দোকান করিয়া ভাল থাকে না; সে বেড়া বাঁধিতে আরম্ভ করিল। রাজু অবসর সময়ে দড়ি যোগাইয়া দিল। পানু মাটি কোপাইতে আরম্ভ করিলে সে-ই বারণ করিল। বলিল—জল পড়ুক, তারপর দুখানা লাঙল ভাড়া করে চাষ দিয়ে নাও। তারপর আবার জল হলে তখন বরং কোপাবে।

সে-ই তাহাকে আবর্জনা পচাইয়া সার তৈয়ারী করিতে শিখাইল।

তীরের ক্ষেতে গাছ গজাইয়া উঠিবার পর একদিন সে-ই বলিল—এবারে বরং আর একটা বন্দোবস্ত করে নাও। এখানকার মাটি ভাল।

তারপর একদিন বলিল—গোটা পুকুরটাই বন্দোবস্ত করে নিতে হবে, বুঝলে? মজা পুকুরের তলাতে ধানের জমি হবে খুব ভাল।

একদিন বলিল—পুকুরের ভেতরে জমি, পাড়ের ওপর বাগান, আম-কাঁঠালের গাছ পুঁততে হবে। সে গল্প করিত—ক্ষেতের ধান আসিবে, তখন খামারের প্রয়োজন হইবে। বাড়ির সামনে পাকা সড়কের ওপাশে পতিত ডাঙাটার কতখানি বন্দোবস্ত করিয়া লইতে হইবে। ওখানে হইবে খামার। আম-কাঁঠালের বাগানে ফল হইবে। পুকুরটার তলায় ঠিক মাঝখানে খানিকটা জল রাখিবে, ওখানে মাছ পাওয়া যাইবে।

রাজিয়া বলিল—পেটের বাছা, বাড়ির গাছা, পুকুরের মাছা—এই তো ভর্তি সংসার।

পানু মুগ্ধ হইয়া গেল। প্রচণ্ড বিক্রমে সে সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া কাজ আরম্ভ করিল। উদয়াস্ত পরিশ্রম। একটা মানুষ যে এত পরিশ্রম করিতে পারে, সে না দেখিলে বিশ্বাস হইবে না। রাজুরও মনে হইত, মানুষ নয়—একটা দৈত্য, পৃথিবীর বুকে কোদাল চালাইয়া চলিয়াছেই—চলিয়াছেই। কিন্তু রাজিয়ার কাছে সে প্রায় পোষমানা পাখীর মত হইয়া পড়িল। রাজিয়া যাহা বলিল, পানু তাহাই শুনিল। শুধু তো রাজিয়ার বুদ্ধিই ভাল নয়—রাজিয়া যে দেখিতেও ভারি 'খুবসুরত' হইয়া উঠিয়াছে। রুকণীর চেহারায় একটা নেশা ছিল, যশোদার চেহারায় নেশা ছিল না। যশোদা ছিল অদ্ভুত জোয়ানী, কিন্তু রাজিয়ার মধ্যে সে সবই আছে। রুকণীর চোখ দুইটা ছিল ছোট—চাহনি ছিল তীরের ফলার মত সরু ধারালো, দেহখানা ছিল ছিপছিপে। সে খিলখিল করিয়া হাসিত, চলিত যেন নাচিয়া নাচিয়া, দেখিয়া নেশা না ধরিয়া পারিত না। যশোদার দেহখানা ছিল ভরাট। যশোদা চলিতে তাহার সর্বাঙ্গ যেন দোল খাইত। রাজিয়ার চোখ দুইটা বড়, তাহার চাহনি যেন আয়নার মত; সূর্যের ছটা পড়িলে আয়না যেমন ঝকঝক করিয়া উঠে, পানুর চোখ রাজিয়ার বড় বড় চোখ দুইটার উপর পড়িলে সে চোখও তেমনি ঝকঝক করিয়া উঠিত। রাজিয়ার দেহ ভরিয়া উঠিয়াছে যশোদার মতই, কিন্তু রাজিয়া অনেক—অনেক সুন্দর। সে যখন চলে, তখন তাহার সর্বাঙ্গ দোল খায়। সে খিলখিল করিয়া হাসে না, মুখ টিপিয়া হাসে; সে কণ্ঠস্বর দিয়া ডাকে না, ইসারায় ডাকে। রাজিয়াকে বুঝিতে পারে না। বুঝিতে গেলে প্রাণ তাহার হাঁপাইয়া উঠে। কিন্তু বুঝিবার চেষ্টা না করিয়াও থাকা যায় না। রাজিয়া যেন রহস্য, সে বোধ হয় শয়তানী। রাজিয়া যে শয়তানী—সে তথ্যটা হঠাৎ সে অস্বীকার করিয়া ফেলিল।

মজিয়া-যাওয়া পুকুরটার পাড়ে তখন কলা-বাগান জমিয়া উঠিয়াছে। রাজিয়ারই নির্দেশমত পুকুরটার গর্ভের চারিদিকে ধানের জমি করিয়া মাঝখানে ছোট একটা পুকুর কাটা হইয়াছিল। সেই পচা মাটি পাড়ের উপর ফেলিয়া তাহাতে কলাগাছ লাগাইয়াছিল পানু। প্রত্যেক কলা-ঝাড়ের মধ্যে লাগাইয়াছিল এক-একটি ফলের গাছ। তিন-চার বৎসরে কলাগাছের গোড়া পচিয়া আসিলে কলাগাছ তুলিয়া দিবে—চারাগাছগুলি শিশুবৃক্ষে পরিণত হইবে। পানু কলা-গাছের গোড়ায় ওই গাছের পরিচর্যা করিতেছিল। রাজিয়া ঘাটে বাসন মাজিতেছিল। পানুর অস্তিত্ব রাজিয়া বুঝিতে পারে নাই। হঠাৎ পানু রাজিয়ার উচ্চকণ্ঠের খিলখিল হাসিতে চমকিয়া উঠিল। তাহার কর্মরত হাত আপনি স্তব্ধ হইয়া গেল। ইচ্ছা হইল, চীৎকার করিয়া উঠে। কিন্তু কি মনে হইল, চীৎকার না করিয়া কলাগাছের পাতার আড়াল রাখিয়া নীরবে সন্তর্পণে উঁকি মারিয়া দেখিল।

রাগে তাহার সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল।

ভাদু বাউড়িনীর সঙ্গে রাজু কথা বলিয়া এমন হাসি হাসিতেছে! ভাদু বাউড়িনী এ গ্রামের প্রসিদ্ধ দূতী। মেয়েটার পেশা বহুবিচিত্র। তরুণীদের কাছে দৌত্য লইয়া আসে। ছাগল পোষে, ছাগল বিক্রী করে; গরু আছে, দুধ বিক্রী করে, বাছুর বিক্রী করে; হাঁস আছে, ডিম বিক্রী করে। হাট হইতে তরি-তরকারি কিনিয়া গ্রামের মধ্যে বিক্রী করিয়া বেড়ায়। সেই ভাদুর সঙ্গে রাজিয়ার এমন সখিত্ব! এমন হাসি!

ভাদু তাহার হাতে কি যেন দিতেছিল। কি? একটা একটা করিয়া দিতেছে যেন।

পয়সা, টাকা?

পানু আর আত্মগোপন করিতে পারিল না। সে চীৎকার দিয়া বাহির হইয়া আসিল।

ভাদু সভয়ে চীৎকার করিয়া ছুটিল। হুঁচোট খাইয়া পড়িয়া গেল, আবার উঠিল—আবার

ছুটিল—ও মা গো—! ও গো—মা—গো!—সে যেন আর্তনাদ, আতঙ্কিত আর্তনাদ!

রাজু বিহ্বল হইয়া গিয়াছিল। হাতে পয়সা লইয়া সে দাঁড়াইয়াই রহিল। পানু আসিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া দাঁতে দাঁত ঘষিয়া বলিল—হারামজাদী!

হাত হইতে পয়সাগুলি কাড়িয়া লইয়া পানু বলিল—কিসের পয়সা? তুম—তুম—

পানু প্রশ্ন করিল—ভাদুর দৌত্য স্বীকার করিয়া দেহবিক্রয়ের মূল্য লইতে এতদিনে আরম্ভ করিয়াছিস?—হাতখানা ঘুরাইয়া পাক দিয়া বলিল—বল, হারামজাদী বল।

রাজিয়া এতক্ষণে বলিল—ছাড়। হাত ভেঙে যাবে।

—যাক।

—নিজের হাত পুড়িয়ে ভাত রাঁধতে হবে।

—আগে বল। কতদিন এ বজ্জাতি আরম্ভ করেছিস! দেহ বেচে—

বাধা দিয়া রাজিয়া বলিল—মরণ আমার! তুমি ভাত দেবে বলে যখন আমাকে ঘরে নিয়েছিলে, তখন আমার মরণ দশা। তাও তুমি মালাচন্দন করেছিলে, তবে এসেছিলাম তোমার ঘরে। এখন—। রাজু হাসিল, হাসিয়া বলিল—আজ আমার এই এমন রূপ—আজ কি এই সাড়ে সাত আনা পয়সা আমার দাম? ছি! ছাড়। না হয় মেরেই ফেল আমাকে।

—তবে পয়সা কিসের? ভাদু তোকে পয়সা কেন দেয়, কিসের দেয়?

—আমি বাবুদের গাঁয়ে যাই দুধ বেচতে তাই পয়সা দিয়ে গেল কটা জিনিস আনতে।

—না। মিছে কথা।

রাজিয়া তাহার মুখের দিকে নীরবে চাহিয়া রহিল।

পানু বলিল—বল।

রাজিয়া তবু কোন উত্তর দিল না।

এইবার পানু তাহার চুলের মুঠি ধরিল। রাজু বলিল—কি বলব? বললাম তো?

—মিছে কথা!

—তবে কি বলব বল? তুমি যা বলছ তাই বললেও মারবে। আমি যা বলছি তাও বিশ্বাস করবে না আর সেই জন্যে মারবে। তা হলে তুমি মার। কিন্তু বাড়ির ভেতরে চল। সেখানে যেমন খুশি যন্ত্রণা দিয়ো। বাইরে দশের সামনে নয়।

—তাই আয়। হিড়হিড় করিয়া পানু তাহাকে ঘরের মধ্যে টানিয়া লইয়া গিয়াছিল। সে স্পষ্ট বুঝিতে পারিল, রাজিয়া মিথ্যা বলিতেছে। নিষ্ঠুর পানু কঠিন আক্রোশে জেদে একটা সাঁড়াশী দিয়া রাজিয়ার দেহের মাংস ধরিয়া পাক দিয়া যন্ত্রণা দিল। কিন্তু অদ্ভুত রাজিয়া চীৎকার করিল না, চোখ দিয়া অনর্গল ধারে জল গড়াইল, আর সে ডবডবে চোখ দুইটা মেলিয়া নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

রাজিয়া শয়তানী তখন পানুর সংসার হইতে চুরি সুরু করিয়াছে। চুরির সঞ্চয় হইতে সে করে সুদে কারবার। ভাদুর মারফত টাকা ধার দেয়। ভাদু সুদ আদায় করিয়া আনিয়া দেয়। পয়সাটা সুদের পয়সা। রাজিয়া শয়তানী।

শয়তানী রাজিয়া।

কিছুদিন পর রাজিয়া একদিন তাহাকে বলিল—একটা কাজ কর তুমি।

—কি?

—আর একটা বিয়ে কর।

—বিয়ে? পানু আশ্চর্য হইয়া গেল।

—হ্যাঁ। একা আমি আর পারছি না।

পানু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

রাজিয়া তাহাকে হিসাব দিল—একা কি আমি অত কাজ পারি? সকাল থেকে ঘরের কাজ, তারপর দুধ যোগান দিতে যেতে হয় শহরে, তারপর রান্নাবান্না ভিয়েন দোকান লছমী-মংলীর সেবা, তোমার সেবা।

রাজিয়া সে একটা ফিরিস্তি দিয়া গেল। বড় কাজ হইতে একেবারে তুচ্ছ খুঁটিনাটির কাজ পর্যন্ত।

পানুর অবশ্য নূতন বিবাহে আপত্তি নাই; কিন্তু ভয় করে সে রাজিয়াকে যশোর মত সে যদি পালায়? সে বলিল—একটা ঝি রাখ।

—উঁহু। ঝিয়ে তোমার দুধ দিতে গেলে চুরি করবে।

—হুঁ।

—তারপর ভিয়েন রান্নাবান্না তোমার ঝিয়ে করবে নাকি?

পানু তবু বলিল—না না। দুধ দিতে আমি যাব।

রাজিয়া তবু মানিল না, পরদিন একটা মেয়েকে আনিয়া দেখাইল। বেশ ডাগর মেয়ে। সদ্য যুবতী। বলিল—শুধু কাজকর্মই নয় গো, এত সব ঘরদোর জমি-জেরাত করলে, ছেলে না হলে ভোগ করবে কে? আমার তো হল না। হবেও না।

এবার পানুর নেশা ধরিল। মেয়েটার যৌবনের নেশা—সন্তানের নেশা। বলিল—তব ঠিক হ্যায়।

দিন কয়েকের মধ্যেই রাজিয়া উদ্যোগ আয়োজন করিয়া পানুর মালা-চন্দনের ব্যবস্থা করিল। পানু রাজিয়ার প্রতি কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হইয়া গেল। তাহার বার বার মনে পড়িল—সে যেদিন রাজিয়াকে লইয়া আসে সেদিন যশোদা পলাইয়া গিয়াছিল। আর রাজিয়া নিজে তাহার আবার বিবাহ দিল। সে বার বার রাজিয়াকে বলিল—ও তোর সেবা করবে।

রাজিয়া হাসিল। যত্ন করিয়া বিছানা করিয়া দুইজনকে শুইতে দিল। কিন্তু পরদিন পানু সকালে উঠিয়া দেখিল—রাজিয়া নাই।

সে একেবারে পাগল হইয়া গেল। রাজিয়া পলাইয়াছে ওই নূতন বউটার ভাইয়ের সঙ্গে। নূতন বউটার ভাই যাত্রার দলে নাচ-গানের মাস্টার। লোকটা চমৎকার বাঁশীও বাজায়। ওই গানেই সে রাজিয়ার চোখে রঙ ধরাইয়াছিল। লোকটার সংসারে আছে অন্ধ বাপ, আর এই বোনটি। বাল্যকালে বোনটার একবার বিবাহ হইয়াছিল, বিধবা হইয়া সে বাপ-ভাইয়ের পোষ্য হইয়াই ছিল। রাজিয়ার সঙ্গে বউটার ভাইয়ের প্রীতি গাঢ় হইয়া উঠিলে সে রাজিয়াকে বিবাহের প্রস্তাব জানায়। রাজিয়া বলিয়াছিল—তুমি একবার বিকেলে আমাদের ওদিকে যেয়ো।

সে তাহাকে ভীষণমূর্তি পানুকে দেখাইয়াছিল। পরদিন বলিয়াছিল—দেখছ তো? তোমাকেও মেরে ফেলবে, আমাকেও মেরে ফেলবে। ফাঁসিকে ও ভয় করে না।

লোকটি তখন দেশত্যাগের প্রস্তাব জানাইয়া ছিল।

রাজিয়া দুই দিন ভাবিয়াছিল—যেতে পারি। তোমার বুনের সঙ্গে যদি ওর পত্র (চলিত বৈষ্ণব প্রথায় হয় বিবাহ) করে দাও। ও আমাকে অসময়ে খেতে দিয়েছে, বাঁচিয়েছে। আমাকে ভালও বাসে। ওর ঘর ভেঙে দিয়ে আমি যেতে পারব না।

যাত্রার দলের ড্যান্সিং মাস্টারের কোন আপত্তি হয় নাই। বোনটার একটা গতিরও প্রয়োজন ছিল। সে নরুনের বদলে পানুর নাক লইয়া ভাগিল। রাজিয়া রাত্রে তাহারই সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে। যাইবার সময় রাজিয়া পানুর একটা সূচ পর্যন্ত লইয়া যায় নাই। নিজের চুরি করা সঞ্চয় যেগুলি ছিল, সেইগুলিই লইয়া গিয়াছে। নিয়মিত সে চুরি করিত, এমন কৌশলে চুরি যে সে ধরিবার শক্তি পানুর ছিল না।

পানু খোঁজ করিয়া সব জানিয়া সমস্ত দিনটা নিষ্ঠুর নির্যাতনে নির্যাতিত করিল নূতন বউ-টাকে। বউটাই সব সংবাদ দিল। বলিল—রাজু বাঁশী শুনিবার জন্য তাহাদের বাড়ির পাশে পাশে ঘুরিত। তারপর আসিল ঘরে, আলাপ করিল। বাঁশী শুনিয়া রাজু কাঁদিত। সেই সুযোগে নতুন বউটার ভাই রাজুকে বশ করিয়াছে। আরও বলিল—রাজুর অনেক টাকা আছে। অনেক টাকা। বউ বলিয়া কহিয়া অনুনয় করিয়া কাঁদিল। কিন্তু পানুর তাহাতেও তৃপ্তি হইল না। শ্বশুরের বাড়ি গিয়া অন্ধ বৃদ্ধকেও ঘাকতক দিয়া আসিল। অবশেষে রাত্রে নূতন বউটাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিয়া ঘরে খিল দিল। ঘরে খিল দিয়া সে চীৎকার করিল, যে চীৎকার শুনিয়া রুকণী বুধন পর্যন্ত বিস্মিত হইয়া ভাবিত—এ কি? কি চায় পানু?

সকালে উঠিয়া দেখিল, বউটা দুয়ারের গোড়ায় পড়িয়া আছে পোষা কুকুরের মত। পানু দরজা খুলিতেই সে ঘরে ঢুকিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল। পানু বাধা দিল না। থাক, কাজকর্ম করুক। তা ছাড়া প্রহার করিতেও তো একটা লোক চাই।

বউটা আজও আছে। বয়স হইয়াছে প্রায় ত্রিশ। গোটাকয়েক ছেলেমেয়েও হইয়াছে। কাজকর্ম করে, মার খায়। পানু আরও একটা বিবাহ করিয়াছিল, সেই বিবাহের পর বাপের বাড়ি গিয়া আর আসে নাই। রাজিয়াই বরং আবার ফিরিয়া আসিয়াছে।

দীর্ঘ দুই বৎসর পর আবার রাজিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল। সে নিজে অবশ্য ফেরে নাই—পানু গিয়াছিল সদরে একটা ডাকাতির মকদ্দমার সাক্ষী দিতে। ডাকাতির চেষ্টা হইয়াছিল তাহারই ঘরে। সাক্ষী দিতে গিয়া হঠাৎ শহরের পথে রাজিয়ার সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। একটা বাড়ি হইতে বাহির হইয়া রাজিয়া পথের উপর ছাই ফেলিতেছিল। পানু থমকিয়া দাঁড়াইল। রাজিয়া ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেল। মুহূর্তে সে ছুটিয়া বাড়ির ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। পানু কিন্তু পানু—সেও ছুটিয়া বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। লাফ দিয়া পিছন হইতে রাজিয়ার চুলের মুঠি ধরিয়া মাটিতে পাড়িয়া ফেলিল। রাজিয়া চীৎকার করিল না, শুধু সভয়ে তাহার ডবডবে চোখের সেই দৃষ্টি মেলিয়া পানুর দিকে চাহিয়া রহিল।

পানু হিংস্র গর্জন করিয়া যে প্রশ্ন রাজিয়াকে করিল, তাহাতে রাজিয়া অবাক হইয়া গেল। পানু প্রশ্ন করিল—এ কি? সাদা থানকাপড় কেনে তোর? হাত শুধু কেনে? সিঁথের সিঁদুর কই?

রাজিয়া চুপ করিয়া রহিল।

—সে হারামজাদা মর গেয়া?

রাজিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল—হ্যাঁ।

—সে মরেছে মরেছে, সে তোকে বিয়ে করে নাই। বিধবা সেজেছিস কেনে তুই? আমি বেঁচে রয়েছি—কেন বিধবা সেজেছিস তুই?

বলিয়াই সে তাহাকে দুর্দান্ত প্রহার আরম্ভ করিল। রাজিয়া চীৎকার করে নাই, কিন্তু পানুর

কিল-চড়ের শব্দেই বাড়ির লোক জমিয়া গেল। সকলে হাঁ-হাঁ করিয়া পানুকে ধরিয়া ফেলিল। পানু গর্জন করিতেছিল—আমার পরিবার। পালিয়ে এসেছে। হারামজাদী আবার বিধবা সেজেছে! খুন করে ফেলব হারামজাদীকে।

রাজিয়া হাঁপাইতেছে।

বাড়ির লোকেরা বলিল—পুলিসে দাও হারামজাদাকে।

রাজিয়া এবার ঘুরিয়া দাঁড়াইল।—না। লোকে সবিস্ময়ে বলিল—না?

রাজিয়া বলিল—না, ওই আমার সোয়ামী। ও যা বলছে—সব সত্যি। ছেড়ে দেন আপনারা। চলে যান আপনারা।

পানুকে তাহারা ছাড়িয়া দিল। পানু কিন্তু রাজিয়াকে ছাড়িল না। বলিল—চল, ঘর চল।

রাজিয়া প্রশ্ন করিল—ঘর? ঘর নিয়ে যাবে আমাকে?

—হাঁ, হাঁ। ঘর চল? আগাড়ি চল বাজারমে।

বাজারে কাপড়ের দোকানে আসিয়া উঠিল। লালপেড়ে শাড়ি এক জোড়া—শহরেই বাহারে লালপাড় শাড়ি কিনিয়া, চুড়ি কিনিয়া, সিঁদুর কিনিয়া রাজিয়াকে বউ সাজাইয়া বাড়ি ফিরাইয়া আনিল। বাড়ি আসিয়া আবার একদফা দিল দুর্দান্ত প্রহার। রাজিয়া এবারও কাঁদিল না, অত্যন্ত কষ্টের মধ্যেও হাসিয়া বলিল—এইবার ছাড়। আর মারলে মরে যাব।

পানু ছাড়িয়া দিয়াও মধ্যে মধ্যে প্রহারোদ্যত হইতেছিল। রাজিয়া বলিল—আবার দুদিন পরে মেরো। গায়ের বেদনাটা মরুক।

পরদিন সকাল হইতে পানুর ঘরে রাজিয়াই আবার গৃহিণী হইয়া বসিয়াছে। পানু কিন্তু তাহাকে রোজ প্রহার দিতে ভুলে না।

পানু জীবনে কাহাকেও আর বিশ্বাস করে না। কাহারও এতটুকু ঔদ্ধত্য সহ্য করে না। মায়া নাই, দয়া নাই। মানুষ তাহাকে ঠকাইয়াছে—সে সুযোগ পাইলেই মানুষের উপর অত্যাচার করিয়া শোধ লয়। তাহার বুদ্ধি মোটা—সে লোককে ঠকাইতে পারে না, সে লোককে গায়ের জোরে ঠেকাইয়া রাখে, ঠেঙায়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপর তাহার প্রচণ্ড রাগ।

সেই তাহার হঠাৎ আজ এ কি হইল? অনেক জীব তো সে হত্যা করিয়াছে। হেঁসোর আঘাতে কুকুরের পা কাটিয়া দিয়াছে, গুলতিতে করিয়া কাক মারিয়াছে অসংখ্য। সেবার তাহার বাড়িতে ডাকাত পড়িয়াছিল। পানু তাহার লম্বা হেঁসোখানা হাতে করিয়া বাহির হইয়া তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া একটা লোককে ঘায়েল করিয়াছিল। ডাকাতেরা সঙ্গীকে ফেলিয়াই পলাইয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিল। পানু তখন আহত লোকটার বুকের উপর বসিয়া একটা হাতের আঙুল ওই হেঁসো দিয়া কাটিয়াছিল। কাটিয়াছিল আর হাসিয়াছিল। কিন্তু আজ তাহার এ কি হইল? একটা অস্থিচর্মসার রেঁয়া-ওঠা কদর্য চেহারার বাছুরকে লাঠি মারিয়া তাহার কি হইল?

অস্থিচর্মসার গো-শাবক। বড় লালসাতেই সে পানুর গাছটির দিকে মুখ বাড়াইয়াছিল। আঃ, মায়ের দুধ পেট পুরিয়া খাইতে পায় না, হতভাগ্যের হাড়-পাঁজরাগুলি সব বাহির হইয়া পড়িয়াছে! গায়ের রেঁয়াগুলি পর্যন্ত উঠিয়া গিয়াছে। ওই বিরল রোমগুলির উপরেই অসহায় মায়ের সস্নেহ লেহন-চিহ্ন চিকন হইয়া ফুটিয়া রহিয়াছে। বেচারার মায়ের দুধের শেষ ফোঁটাটি পর্যন্ত গৃহস্থে টানিয়া বাহির করিয়া লয়। ক্ষুধার জ্বালায় বড় লালসায় সে গাছটায় মুখ দিয়াছিল। মুখের পাশ বাহিয়া সবুজ রস-মিশ্রিত লাল গড়াইয়া পড়িতেছে।

সামান্য স্নেহে পানু তাহার গায়ে হাত বুলাইয়াছিল। তাহাতেই সে কৃতজ্ঞতাভরে পানুর

হাত চাটিতেছে।

পানুর চোখে বার বার জল আসিতেছে।

বাছুরটাকে যে বঞ্চনা মানুষ করিতেছে তাহাতে সে হয়তো বাঁচিবেই না। সে-ই হয়তো শেষ আঘাত দিল। পানু এতকাল ধরিয়া যে বঞ্চনা পাইয়াছে, ওই বাছুরটার বঞ্চনার তুলনায় সব যেন তুচ্ছ হইয়া যাইতেছে।

আঠারো

মনের মধ্যে প্রায় সমস্ত জীবনের স্মৃতির ছবিই অত্যন্ত দ্রুতবেগে ভাসিয়া গেল। সে-সবের সঙ্গে এই বাছুরটাকে মারার সম্বন্ধ বিশেষ নাই। তাহারই হাতে লাঠির ঘা খাইয়াও বাছুরটা যখন তাহারই সামান্য আদরে, ঈষৎ স্নেহের স্পর্শে পরম আনুগত্য প্রকাশ করিয়া পানু যে হাতে মারিয়াছিল সেই হাতই চাটিয়াছিল, তখনই মনে পড়িয়াছিল তাহার বাপের কথা। নিষ্ঠুর প্রহার করিয়া জমাদার যখন দুইটা মিষ্ট কথা বলিয়াছিল তখন তাহার বাপ জমাদারের পা দুইটা চাপিয়া ধরিয়াছিল। রসিকতায় হাসিয়াছিল। জমাদারের এবং বাপের কথা হইতে মনে পড়িয়া গিয়াছিল তাহার নিজের পিঠের দাগের কথা। পিঠে হাত দিয়াই নিজের জীবনের কথা মনে পড়িয়াছিল। হয়তো আগাগোড়া স্মরণ করিয়া দুনিয়ার 'ভেল্কির কথা' সম্বন্ধে তাহার ধারণাটাকেই শক্ত এবং বড় করিয়া দেখিতে চাহিতেছিল। স্বার্থপর দুনিয়ায় সকলেই ব্যস্ত আপন স্বার্থ লইয়া। জোর-জবরদস্তি—চোখের জল—মিষ্ট কথা—হাসি—সেবা—যত্ন—সব ভেল্কি, সব ভেল্কি। জমাদার, দারোগা, রুকণী, চারুদিদি, গুরুঠাকুর, জমিদারের গোমস্তা, চাপরাসী, ঘোষবাবা, জমিবিক্রেতা চাষী, মহাজন, যশোদিয়া, রাজিয়া, নতুন বউটা—সব ভেল্কিদার-ভেল্কিদারনীর দল। সে নিজেও ভেল্কিদার। তাহার ভেল্কি, গায়ের জোর—লাঠি। ওই ভেল্কির জোরে সে দুনিয়ার ভেল্কি ঠেকাইয়া রাখিয়াছে। বাছুরটাও আসিয়াছিল আপনার পেট ভরাইতে—চুপি চুপি। সে তাহাকে ঠ্যাঙাইয়াছে—একখানা পা ভাঙিয়া দিয়াছে। বেশ করিয়াছে। এখন বাছুরটার ড্যাবাড্যাবা চোখে জল টলমল করিতেছে—এও ভেল্কি। হাত চাটিতেছে—এও ভেল্কি। হয়তো তার মনের মধ্যে আপন হইতে সমস্ত স্মৃতিটা ভাসিয়া ওঠার মূল কারণ তাহাই। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, তবুও সে সান্ত্বনা পাইতেছে না। চোখের ভিতর জ্বালা করিতেছে। একটা উত্তপ্ত দাহে যেন ভরিয়া উঠিয়াছে। হঠাৎ মনে হইল, চোখের কোণ দুইটা হইতে দুইটা পোকা নামিয়া আসিতেছে এবং পোকা দুইটার সর্বাঙ্গে চোখের উত্তপ্ত দাহ। চোখ দিয়া তাহার জল পড়িতেছে। পানু চোখের জল মুছিয়া ফেলিল। কিন্তু আবার জল আসিতেছে।

মনে হইল, এই বাছুরটার জীবনের সঙ্গে তাহার জীবনের মিল আছে। না, বাছুরটা তাহার চেয়েও হতভাগ্য। সে তো তাহার গায়ের জোরে অনেক বঞ্চনা ঠেকাইয়াছে। বাছুরটার গায়ের জোরও নাই। প্রথম যখন সে পলাইয়া গিয়াছিল, তখনও তাহার ভাগ্যগুণে বুধন এবং বুধনের স্ত্রীকে সে পাইয়াছিল। বাছুরটা তাও পায় নাই। সে তো জানে, তাহার নিজের ঘরেই গরু-মহিষ আছে। লছমী-মংলী, তাহাদের সন্তান-সন্ততি আছে; কেমন করিয়া জবরদস্তি ভেল্কিতে মানুষ গরু-মহিষ দোহন করিয়া লয়—সে তো পানু জানে। সে চীৎকার করিয়া উঠিল সেই বিচিত্র চীৎকার। যে চীৎকারের অর্থ সে জানে না, চীৎকার আপনি বাহির হয়। ওঃ—ওঃ—ওঃ!

সন্ধ্যা হইতে বাছুরটাকে বাঁধিয়া রাখে, দূরে বাঁধা থাকে তাহার মা। সমস্ত রাত্রি চলিয়া যায়—তৃষ্ণায় বাছুরটার বুক শুকাইয়া যায়, ক্ষুধায় পাকস্থলী মোচড়াইয়া ওঠে, সে চীৎকার করে—হাম্বা-হাম্বা। মা—মা বলিয়া ডাকে। দূরে আবদ্ধ মা প্রাণপণ শক্তিতে টানিয়া ছিঁড়িতে চায় গলার দড়ি; কিন্তু মানুষের ভেল্কির পাক লাগানো দড়ি ছেঁড়ে না—নিরুপায় হতাশায় মা-ও চীৎকার করে। আশ্চর্যের কথা, পানু পূর্ব হইতে জানে যে, যে-বাছুরটা ডাকে ঠিক তাহারই মা উত্তরে সাড়া দেয়। যে মা ডাকে ঠিক তাহারই বাচ্চাটা ক্ষুধায় তৃষ্ণায় নিষ্ঠুর ক্লান্তির মধ্যেও ক্ষীণকণ্ঠে সাড়া জানায়। মায়ের স্তন-ক্ষীরভার স্তন-ভাণ্ডের কানায় কানায় ভরিয়া উঠে, স্নায়ু—শিরা—পেশী, এমন কি কোমল ত্বক পর্যন্ত অসহ্য বেদনায় টনটন করিয়া উঠে; প্রাণের ব্যাকুল অধীরতার সঙ্গে দৈহিক যন্ত্রণাও সমানে বাড়িয়া চলে—সে চীৎকার করে সমস্ত রাত্রি ধরিয়া। চীৎকারও পানুর মনে পড়িল। সকালে পাত্র হাতে গৃহস্থ আসিয়া বাছুরটাকে ছাড়িয়া দেয়। বাছুরটা আকুল আগ্রহে ছুটিয়া যায়, অধীর আনন্দে তাহার ছোট্ট লেজখানি দোলায় সে, তাহার মা ফোঁস-ফোঁস শব্দ করিয়া তাহার দেহের আঘ্রাণ লয়, জিভ দিয়া সন্তানের অঙ্গ লেহন করে, ঈষৎ কুঁজা হইয়া সন্তানের মুখে তুলিয়া দেয় তাহার স্তনভাণ্ডের বৃন্তদেশ। পানু শুনিয়াছে, তখন মায়ের পাকস্থলীর মধ্যে একটা আলোড়নের শব্দ উঠিতে থাকে—মনে হয়, তাহার দেহের অভ্যন্তরে সমুদ্রমন্থন আরম্ভ হইয়াছে; দেহের রোমকূপে-কূপে শিহরণ জাগে—রোমগুলি খাড়া হইয়া উঠে, ত্বকখানি মাঝে মাঝে কাঁপে। ওদিকে বাছুরটার জিহ্বার স্পর্শে, আকর্ষণের ধারায় নামিয়া আসে দুধের উচ্ছ্বসিত ফেনায়িত ধারা। বাছুরটার মুখের চারিপাশে সমুদ্রের ফেনার মত ফেনা জমিয়া উঠে, বক্ষ বাহিয়া গড়াইয়া পড়ে দুধ। অমনি গৃহস্থ টানিয়া লয় বাছুরটাকে। তারপর মায়ের স্নেহোচ্ছ্বসিত অবসন্ন মন এবং দেহের এই অবস্থার সুযোগ লইয়া নিঃশেষে দোহন করিয়া লয় হতভাগ্যের জীবনীসুধা।

ওই মায়ের স্তনবৃন্ত টানিলে যেমন ধারায় দুধ গড়াইয়া পড়ে, তেমনি ভাবেই পানুর চোখের জলের ধারাও অকস্মাৎ প্রবল হইয়া উঠিল। আবারও একবার চীৎকার করিয়া উঠিল সে। ঠিক এই মুহূর্তে বাড়ির ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল রাজিয়া। স্তম্ভিত বিস্ময়ে সে দাঁড়াইয়া গেল।

পানু কাঁদিতেছে! সে কান্না চোখের জলে বুক ভাসিয়া যাওয়া কান্না! আর তাহার সামনে পড়িয়া আছে একটা কঙ্কালসার বাছুর, মুখে খানিকটা সবুজ লালা, চোখের কোণে জল।

রাজু বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গিয়াছিল। পানু একবার মুখ তুলিয়া রাজুকে দেখিল, তারপর আবার বাছুরটার দিকে মুখ ফিরাইয়া তেমনি ভাবেই বসিয়া রহিল, চোখের জল মুছিবার চেষ্টা করিল না, কান্নার জন্য কোন লজ্জাও বোধ করিল না।

রাজুর আজ পানুকে দেখিয়া অত্যন্ত ভয় লাগিল। পানু যেমন রাজুকে বুঝিতে গিয়া হাঁপাইয়া উঠে, রাজুও আজ তেমনি হাঁপাইয়া উঠিল। পানুর এমন রূপ সে কখনও দেখে নাই। সভয়ে সসঙ্কোচে পানুর পাশে বসিয়া সে-মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিল—কি হল?

পানু কোন কথা বলিল না।

রাজু আবার বলিল—হ্যাঁ গো?

পানু এবার রুদ্ধশ্বাস ব্যক্তির মত সমস্ত মুখটা মেলিয়া একটা নিশ্বাস লইল। কিছু একটা বলিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু কোন কথা বাহির হইল না। বাহির হইল—উচ্ছ্বাস-জড়িত এক টুকরা শব্দ!

রাজু সপ্রশ্ন ভঙ্গিতে পানুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তবুও পানু কিছু বলিতে পারিল না —শুধু বার বার ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—না—না—না।

হয়তো এ 'না'-এর অর্থ—আমি বলিতে পারিতেছি না। আমায় জিজ্ঞাসা করিও না রাজু। অথবা—আমার আর কিছু বলিবার নাই ; দুনিয়ায় আমার কথা ফুরাইয়া গিয়াছে। হয়তো বা—গোটা দুনিয়াটাই আমার কাছে 'না' হইয়া গিয়াছে। তাহার ভীষণ কঠিন মুখখানার পেশীগুলি আগের আক্ষেপে থরথর করিয়া কাঁপিতেছে।

রাজু এবার বাছুরটার দিকে চাহিয়া দেখিল। বাছুরটা পড়িয়া আছে—পানুর হাত চাটিতেছে। মধ্যে মধ্যে ঘাড় তুলিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু পারিতেছে না। একটা ফোঁস করিয়া গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া আবার শুইয়া পড়িতেছে। রাজু বাছুরটাকে নাড়িয়া দেখিয়া শিহরিয়া বলিয়া উঠিল—এঃ, পা-খানা একেবারে ভেঙে গিয়েছে!

পানু এবার বলিয়া উঠিল—আমি ওকে মেরে ফেললাম রে রাজি, আমি বাছুরটাকে মেরে ফেললাম।

পানুর নতুন বউটা ব্যাপারটা জানিত। সে কয়েক বারই ইহার মধ্যে উঁকি মারিয়া ব্যাপারটা দেখিয়া গিয়াছে, কিন্তু কিছু বলিতে ভরসা পায় নাই। সে রাজুবালার কণ্ঠস্বর শুনিয়া বাড়ির ভিতর হইতে আসিয়া আড়ালে দাঁড়াইয়া ছিল। রাজুকে পানু কিছু বলিল না দেখিয়া সাহস পাইয়া সে এবার বাহির হইয়া আসিল, বলিল—মা গো! গো-হত্যে করলে তুমি!

রাজু আবার বার বার ঘাড় নাড়িল, যাহার অর্থ, না—না—না।

মেয়েটা বলিল—নাও, এখন গরুর দড়ি হাতে করে ব্যা-ব্যা করে দেশে দেশে ভিখ করে বেড়াও।

গো-বধের প্রায়শ্চিত্ত তাই-ই বটে। একটা নির্দিষ্ট কাল গৃহত্যাগ করিয়া ভিক্ষা করিয়া খাইতে হয়, মৌনী থাকিতে হয়, একমাত্র শব্দ—গরুর শব্দানুকরণ করিয়া 'ব্যা-ব্যা' বা 'হাম্বা' শব্দ ছাড়া অন্য কোন শব্দ উচ্চারণ করিতে পায় না। হাতে থাকে একগাছি গরুর দড়ি, সেই দড়ি দেখাইয়া এবং গরুর শব্দ করিয়া দেশে স্বীকার করিয়া ফিরিতে হয়—আমি মহাপাপ করিয়াছি, আমি গো-বধ করিয়াছি।

পানু তাহার কথা শুনিয়া ঘৃণায় ক্রোধে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল, কিন্তু কিছু বলিল না।

রাজু বলিল—তুই থাম বাপু। মরবে কেন? এক কড়া আগুন কর। সেঁক দিতে হবে। হাড়-জোড়ার পাতা নিয়ে আসছি আমি, বেটে গরম করে লাগিয়ে দি। মরবে কেনে?

পানু রাজুর হাত ধরিয়া ব্যগ্রতাভরে বলিল—বাঁচবে? রাজু, বাঁচবে?

রাজু হাসিতে গেল, কিন্তু হাসি আসিল না।

উনিশ

রাজিয়া শয়তানী, সে পানুকে ছাড়িয়া একবার পলাইয়া গিয়াছিল। এখনও এই পরিণত বয়সে সে সাজিয়া-গুজিয়া দুধ বেচিতে যায়, দেরি করিয়া ফেরে। পানু সব বুঝিতে পারে, মধ্যে মধ্যে নির্যাতনও করে ; রাজিয়া সে নির্যাতন সহ্য করে। রাজিয়া চোর, চুরি করিয়া সঞ্চয় করে। কিন্তু রাজিয়া তবু অদ্ভুত! বড় ভাল। অনেক গুণ তাহার। বাহবা রাজি, বাহবা! পানুর

মুখে এতক্ষণে অল্প হাসি দেখা দিল।

হাড়-জোড়া গাছের পাতা আনিয়া মোলায়েম করিয়া রাজু পিষিয়া ফেলিল। তারপর গরম করিয়া ভাঙা জায়গায়টায় প্রলেপ দিয়া কাপড়ের ফালি দিয়া বাঁধিয়া দিল। তাহার উপর দুইটা শক্ত বাঁখারি পায়ের মাপ করিয়া কাটিয়া দড়ি দিয়া শক্ত করিয়া পায়ের সঙ্গে বাঁধিবার উদ্যোগ করিল।

পানু প্রশ্ন করিল—ও কি হবে?

রাজু এতক্ষণে হাসিয়া বলিল—দেখ না।

পানু চটিয়া উঠিল, রাজুর চুলের মুঠা ধরিয়া টান দিয়া বলিল—না। লাগবে ওর। বাঁখারির চাপ পড়বে না?

পানু চুলের মুঠি ধরিয়া আছে, তবু রাজুর মুখে হাসি, বলিল—ছাড় ছাড়। বলছি।

—কি?

—হাত ভেঙে গেলে ডাক্তারখানায় ভাঙা হাতে কাঠের ফালি বেঁধে দেয় না? দেখ নি?

পানু এবার রাজুর চুলের মুঠা ছাড়িয়া দিল।

রাজু বলিল—কাঠ বেঁধে না দিলে ভাঙা হাড় কেবলই নড়বে যে, জোড় লাগবে কেন?

—ঠিক। পানু এবার স্বীকার করিয়া ঘাড় নাড়িল—ঠিক।

রাজু বলিল—আমি ঠিক শক্ত করে বাঁধতে পারছি না, তুমি বাঁধ দেখি।

পানু দড়ি হাতে লইয়া টান দিল—বাছুরটা সঙ্গে সঙ্গে কাতরাইয়া অন্য পা তিনখানা ছুঁড়িতে আরম্ভ করিল। রাজু বলিল—হাঁ-হাঁ, এত জোরে নয়। করলে কি? ও কি তোমার রাজিয়া যে সাঁড়াশী দিয়ে চামড়া টানলেও সহ্য করবে? আস্তে আস্তে বাঁধ।

পানুর হাতের টানে ব্যাণ্ডেজের কাপড় কাটিয়া হাড়-জোড়ার রস বাহির হইয়া পড়িয়াছে। পানু বোকার মতই রাজুর দিকে চাহিয়া রহিল।

রাজু বলিল—আর একটু আস্তে।

পানু আবার দড়ি ধরিয়া টানিল; কিন্তু এবার দড়িতে আদৌ টান পড়িল না, দড়ির সঙ্গে পানুর হাত থরথর করিয়া কাঁপিতেছে।

রাজু তাহার হাত হইতে দড়ি টানিয়া লইল; কিন্তু হাসিল না।

হাসিল অপর বউটা, বলিল—বুড়ো মিনসে!

রাজু তাহাকে ধমক দিয়া বলিল—যা ফ্যাক-ফ্যাক করে হাসতে হবে না। আগুনে কাঠ দিয়ে এসেছিস—আগুন হল কিনা দেখ।

—আনছি। আনছি। তোমার ডাক্তারী বিদ্যেটা দেখি।

পানু উঠিয়া দাঁড়াইল। বউটা ভয়ে এবার বিবর্ণ হইয়া গেল। এতক্ষণ ধরিয়া পানুর এই বিহ্বল ভাবটা দেখিয়া তাহার সাহস হইয়াছিল, তাই সে এমনভাবে রসিকতা করিয়া কথা বলিতে পারিয়াছিল। পানু যে এমন অকস্মাৎ উঠিয়া দাঁড়াইবে, সে কল্পনা করিতে পারে নাই। সরিয়া যাইবারও পথ নাই—সামনে পানু, পিছনে দেওয়াল, পাশে বাছুরটা; অন্য পাশে একখানা তক্তাপোশ। সে আতঙ্কে দেওয়ালে লাগিয়া গিয়া সভয়ে দুই হাত তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পানু কিন্তু তাহাকে কিছু বলিল না, সে পাশ কাটাইয়া তক্তাপোশটার উপরে উঠিয়া সেটার উপর দিয়াই বাড়ির ভিতরে চলিয়া গেল।

নতুন বউটা অবাক হইয়া কিছুক্ষণ পানুর গমনপথের দিকে চাহিয়া থাকিয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়া বলিল—দিদি, মিনসে এইবার মরবে।

রাজু চোখ তুলিয়া একবার তাহার দিকে চাহিল, তারপর বলিল—চুপ কর। ওই সব কি বলে ?

বউটা ফিসফিস করিয়া বলিল—কিন্তু কি হল বল দেখি ?

—মানুষটার মনে বড় লেগেছে রে !

—মনে লেগেছে ! মন !

সে আরও কিছু বলিত, কিন্তু ওদিকে সবল পদক্ষেপ-ধ্বনি ধ্বনিত হইয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে বউটা চুপ করিয়া রাজুর পাশে বসিয়া বাছুরের গায়ে হাত বুলাইতে আরম্ভ করিয়া দিল। একটা প্রকাণ্ড কড়াই পরিপূর্ণ করিয়া আগুন আনিয়া পানু নামাইয়া দিল।

নূতন বউটা এবারও আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না, বলিল—ও মা গো ! এ যে ভিয়েনের কড়াই। ভিয়েনের কড়াই সত্যই বড় যত্নের জিনিস।

আগুনের আঁচে থাকিয়া পানু উত্তপ্ত হইয়াছিল—সে এবার বউটার ঘাড়ে ধরিয়া টানিয়া বলিল—আরে হারামজাদী ! তোর হাড় ভেঙে দোব আজ।

বাধা দিল রাজু।—ছাড়—ছাড়। একটার হাড় ভেঙেছে, সেইটার ব্যবস্থা আগে হোক। তারপর ওটার হবে। ও তো পালাচ্ছে না।

পানু বউটাকে ছাড়িয়া দিল।

রাজু বলিল—যা লো সেজ, ন্যাকড়া নিয়ে আয় দেখি। ছেঁড়া চট আছে ভিয়েনের, তাই নিয়ে আয় বরং।

পানু হাউ-মাউ করিয়া বলিল—তামাসা ! তামাসা ! সব তাতেই তামাসা !

রাজু কিছু বলিতে গেল ; কিন্তু পানুর মুখের দিকে চাহিয়া পারিল না। সে অবাক হইয়া গেল। পানুর চোখ দিয়া জল পড়িতেছে। হাউমাউ করিয়া বলা নয়—কান্নার আবেগে কথাগুলি এমন শুনাইতেছে। সে আর কিছু বলিল না, সন্ধ্যা পর্যন্ত অবিরাম সেঁক দিয়া বাছুরটাকে বেশ খানিকটা তাজা করিয়া তুলিল। তখন জানোয়ারটা বার বার উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিতেছিল। রাজু বলিল—বাঁধা পা-খানা এইভাবে আগে রেখে বসিয়ে দাও দেখি।

রাজিয়ার নির্দেশমত পানু বাছুরটাকে বসাইয়া দিল। বাছুরটা বেশ বসিল। পানু খুশি হইয়া বলিল—বাহবা রাজিয়া ! বলিয়া সে সস্নেহে বাছুরটার মুখে হাত বুলাইয়া দিল। বাছুরটা এবার ফোঁস করিয়া মাথা নাড়িয়া পানুর হাতে একটা ঢুঁ মারিল। পানু এবার হা-হা শব্দে হাসিয়া উঠিল। বাহবা রাজিয়া ! বাহবা রে !

* * * *

এদিকে পানু কিন্তু বাছুরটার পায়ে লাঠি মারিয়া বাঘকে খোঁচা মারিয়া বসিয়াছে, কারণ বাছুরটা বাঘের পোষা বাছুর। এ অঞ্চলের সর্বাপেক্ষা প্রতাপশালী জমিদারের সুরভিনন্দিনী। প্রথম দুই দিন বাছুরটার কোন খোঁজই হয় নাই। পাল হইতে ছটকাইয়া বাছুরটা অন্য একটা পালের সঙ্গে এদিকে আসিয়া পড়িয়া ঘুরিতে ঘুরিতে পানুর লাঠির সীমানায় হাজির হইয়াছিল। সেদিন রাখালটা কোন কথা কাহাকেও বলে নাই। পরের দিন সকালে দুধ দুহিবার সময় ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী হাজির হইয়া দেখিল, একটা গাই কম দোহন করা হইতেছে। একেই দুগ্ধবতী গাভী এ বাড়িতে আসিলেই দুধ ক্রমশ কমাইতে সুরু করে ; তাহার উপর নিজেকে কিছু লইতে হয়, সেটা জল মিশাইয়া পূরণ করিয়া দেওয়া হয়। গাইগুলির দুধ কমিয়া যায় এবং দুধ জলো হয়—এজন্য মধ্যে মধ্যে তাহাকে প্রভুসকাশে তিরস্কৃত হইতে হয়। তাই একটা গাই কম দোহনের কারণ জানিয়া সে মূর্তিমান কর্তব্যপরায়ণের মত প্রভুর সকাশে উপস্থিত হইয়া

করজোড়ে সমস্ত নিবেদন করিল। প্রভু রাখালের জরিমানা করিলেন এবং কয়েকজন লোককে সন্ধানে পাঠাইতে আদেশ দিলেন। পাগড়ী বাঁধিয়া লোক বাহির হইয়া গেল, সন্ধ্যায় ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, সন্ধান পাওয়া গেল না। তাহাদের তিনজনই অবশ্য গ্রামান্তরে গিয়াছিল। একজন গিয়াছিল দুই ক্রোশ দূরবর্তী এক গ্রামে প্রণয়িনীর বাড়ি। একজন গিয়াছিল বেহাই-বাড়ি, অপরজন গিয়াছিল—শ্যালিকালয়। সংবাদ শুনিয়া জমিদার নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন—বাছুরটি মরিয়াছে। গরুর জমা-খরচের খাতা আছে সেরেস্তায়, সেখানে খরচও লেখা হইল—লোকসান খাতে খরচ—হারাইয়া মরিয়া যায় বাছুর একটি। পুরোহিত বিধান দিলেন—অপঘাতে গোহত্যা হইয়াছে, প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন। খরচ লাগিবে। ফর্দ অর্ধেক কাটিয়া মঞ্জুর হইল। পুরোহিত বলিলেন—কেশ মুণ্ডন করিতে হইবে। প্রভু একটু ভাবিয়া বলিলেন—অনন্ত ঠাকুরকে ডাক।

অনন্ত ঠাকুর প্রভুর গৃহবিগ্রহের পূজক এবং পাচক—যুগ্মহস্ত।

সে আসিতেই প্রভু বলিলেন—একটা বাছুর মরেছে। প্রায়শ্চিত্তির করতে হবে। তুমিই করবে।

—যে আজ্ঞে।

—পুরুত মশায় বলছেন, মাথা কামাতে হবে।

অনন্তের মাথায় খাসা টেরি, টিকিটি পর্যন্ত দেখা যায় না। সে মাথা চুলকাইয়া বলিল—আজ্ঞে, চুলের মূল্য ধরে দিলেই—

পুরোহিত বলিলেন—পাঁচ সিকে।

প্রভু বলিলেন—মাথা কামিয়ে ফেল! সঙ্গে সঙ্গে একটি চকিত বিচিত্র দৃষ্টি হানিয়া আপন কাজে মন দিলেন।

আর কেহ কোন কথা বলিতে সাহস করিল না। অনন্ত, পুরোহিত দুজনেই চলিয়া আসিল। বাহিরে আসিয়া অনন্ত পুরোহিতের দিকে একটা তির্যক দৃষ্টি হানিয়া বলিল—পাঁচ সিকে? নয়? পাঁচ পয়সায় হত না? পাঁচটা পয়সাও তো পেতে।

পুরোহিত বলিলেন—বাঁদরামি করিস নে—থাম।

—থামব? আর এটা বুঝি বাঁদরামি হল? তুমিও কিছু পাবে না, আমিও না, বেজা নাপিতও না। মাঝখান থেকে—। সে সস্নেহে আপনার চুলগুলিতে হাত বুলাইয়া আক্ষেপ-ভরেই বলিল—বাবুর তো টাক, কামাতেও হত না। বললেই তো পারতে—মাথা তো আপনার মুড়নো হয়ে আছে।

তৃতীয় দিনের দিন।

পানু দোকান খুলিয়া বসিয়া ছিল। বেলা অপরাহ্নের দিকে গড়াইয়া আসিতেছে। দাওয়ার উপর বাছুরটা তেমনিভাবে বসিয়া আছে। মুখের কাছে একটা মাটির পাত্রে দুধ, একটা পাত্রে মাড়, সামনে কতকগুলি কচি ঘাস। সেই দিন হইতে পানু দিনে ঘুম ছাড়িয়াছে। সে বসিয়া বসিয়া ভাবে। ভাবনার কথা অন্য কিছু নয়, ভাবে আপনার বিগত কাহিনী—আর ভাবে বাছুরটার কথা। বাছুরটার দিকে চাহিয়া দেখে, মধ্যে মধ্যে প্রকট পঞ্জরাস্থিগুলির উপর হাত বুলায়, আঘাত পাওয়া স্থানটির উপর হাত বুলায়, সঙ্গে সঙ্গে তাহার বুকের ভিতরটা যেন কেমন করিয়া উঠে। মধ্যে মধ্যে চোখে জল আসে। মনে হয় কেমন করিয়া মানুষে তাহার মায়ের দুধ নিঃশেষে টানিয়া বাহির করিয়া লইয়া তাহার এই দশা করিয়াছে! অন্য সময়ে সে কাজকর্ম করে, সে সময় আশেপাশে থাকে রাজিয়া আর সেজবউটা। তাহাদের

কাছে পানুর এই ভাবটা গোপন নাই। মধ্যে মধ্যে অকারণে চীৎকার করিয়া উঠে। সেই বিচিত্র চীৎকার! আরও একটা বিচিত্র ব্যাপার, পরের দিন হইতেই পানু দুধ খাওয়া ছাড়িয়াছে।

নতুন বউটাই সেদিন দুধ দিতে আসিয়াছিল।

পানু বলিয়াছিল—উঁহু! নিয়ে যা।

—অ্যাঁ? বউটি কথা বুঝিতে পারে নাই।

—নিয়ে যা।

—নিয়ে যাব?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ। কতবার বলব?

—কেন? দুধ তো বেশ ঘন করে জাল দিয়েছি!

পানু হুঙ্কার ছাড়িয়া উঠিয়াছিল। দুধের বাটিটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতে গিয়া কি ভাবিয়া ফেলে নাই, হাতে করিয়া উঠিয়া আসিয়া ওই বাছুরটার মুখের কাছেই ধরিয়া দিয়াছিল।

রাজু পিছনে পিছনে আসিয়া বাটিটা উঠাইয়া লইয়া বলিয়াছিল—জাল দেওয়া দুধ ওকে দিতে হবে না, ও খাবেও না। ওকে কাঁচা দুধ দোব। এটা তুমি—

—না—না। রাজু! না। আমি আর দুধ খাব না। কখনও না। কখনও না।

তাহার সে দৃঢ় ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়া দেখিয়া রাজু আর কিছু না বলিয়াই ফিরিয়া আসিতেছিল।

পানু আবার ডাকিয়া বলিয়াছিল—রাজিয়া!

রাজু দাঁড়াইতেই বলিয়াছিল—মরবার সময়ও আমার মুখে যেন দুধ দিবি না।

রাজু বিচিত্র দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ছিল।

—আর শোন! কাল থেকে মুংলী-টুংলীকে আধা করে দুইবি। খবরদার! পুরা দুইবি না।

রাজু কোন কথা না বলিয়াই চলিয়া আসিয়াছিল। পরের দিন পানু ঠিক আসিয়া দুধ দুহিবার সময় হাজির হইয়াছিল। অর্ধেকের বেশী দুহিতে দেয় নাই। বলিয়া দিয়াছে—দুধের রোজ যাহারা লয়, তাহাদের কয়েকজনকে যেন জবাব দেওয়া হয়।

রাজু চুরি করিয়া দুধ খায়। দুধে জল মিশাইয়া দুধ বাড়াইয়া বিক্রয় করিয়া পয়সা করে। কিন্তু পানুর এ আদেশ লঙ্ঘন করিতে সাহস করে নাই।

পানুর মনের অবস্থার কথা তাহাদের কাছে গোপন নাই। কিন্তু তাহারাও মুখে কিছু বলিতে সাহস করিতেছে না। প্রথম প্রথম রাজিয়া সাহস করিয়াছিল; কিন্তু তাহারও সাহস ক্রমশ ফুরাইয়া যাইতেছে। পানুর ভিতর আর একজন নূতন কেহ উঁকি মারিতেছে। তাহার চেহারা কেমন এখনও তাহারা দেখিতে পায় নাই। তাই তাহাদের সাহসে কুলাইতেছে না। পানুরও যেন একটা উদ্বেগ অস্বস্তির সীমা নাই। মধ্যে মধ্যে অস্থির হইয়া উঠে। সব ছাড়িয়া দিয়া অন্ধকার রাত্রে পলাইয়া যাইতে ইচ্ছা হইতেছে সেই বেদেদের মধ্যে। সব যেন বিষ মনে হইতেছে।

সেদিন পানু উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল। তাহার ভিতরের নূতন জন অকপট ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়া বসিয়াছিল।

ঠিক এমনি সময়ে একটি অভিযানকারী দল—জমিদারের চার-পাঁচজন চাপরাসী সদর্পে আসিয়া হাজির হইল। তাহাদের পুরোভাগে মুণ্ডিতমস্তক অনন্ত পূজক। তাহার আর

দিগ্বিদিক্‌জ্ঞান নাই—হারামজাদা, শূয়ারকি বাচ্চা! আর তাহার হিন্দীতে কুলাইল না—মুণ্ডিত মস্তকে হাত বুলাইয়া বলিল—পাষণ্ড, গো-হত্যাকারী! সে তাহার হাত চাপিয়া ধরিল।

—গো-হত্যাকারী!

পানু চমকিয়া উঠিল। সে গো-হত্যাকারী শব্দটা তাহার কানে যেন বাজের মত ডাকিয়া উঠিল। সে প্রশ্ন করিতে গেল—বাছুরটা তোমার ঠাকুর? কিন্তু অনন্ত আবার চীৎকার করিয়া উঠিল।

কুড়ি

অনন্তের আস্ফালনটা মর্মান্তিক দুঃখ-সঞ্জাত। বেচারীর মাথায় একগুচ্ছ টিকি ব্যতীত অতি যত্নের কেশকলাপের সর্বচিহ্ন বিলুপ্তপ্রায়। আয়নায় মুখ দেখিয়া অনন্তের নিজেরই চোখ ফাটিয়া জল আসিয়াছিল। ঠাকুর-বাড়ির দুকড়ি নাম্নী যুবতী ঝি-টি যত রসিকা তত মুখরা,—ওস্তাদ কামারের হাতের পান দেওয়া ইস্পাতের অস্ত্রে গাছের কাণ্ড কাটিয়া যায় অথচ গাছ যেমন দাঁড়াইয়া থাকে তেমনিভাবে সে মানুষের মর্মচ্ছেদ করে, অথচ মানুষের বলিবার কথা থাকে না। দুকড়ি ঝি তাহাকে দশজনের সামনে যে অপ্রস্তুত করিয়াছে—সে কথা তাহার মনের মধ্যে অপারেশনের ক্ষতে টিঞ্চার আয়োডিনযুক্ত ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হইয়া কোন রকমে চাপা আছে। সে পানুকে পাইয়া দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্যের মত গালিগালাজ আরম্ভ করিল।

সঙ্গের চাপরাসীরা শঙ্কিত হইয়া উঠিল। তাহারা পানুকে জানে। তাহার দৈহিক শক্তি, চরিত্রের প্রচণ্ড রূঢ়তা এখানে কাহারও অজানা নয়। সে যদি হুঙ্কার ছাড়িয়া একগাছা লাঠি লইয়া দাঁড়ায়, তবে ভীষণ কাণ্ড হইয়া দাঁড়াইবে। অবশ্য তাহারা সংখ্যায় অধিক, এক্ষেত্রে পানুর পরাজয় অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু পানু মরিলেও ঘটোৎকচের মত মরিবে। একা মরিতে মরিতেও অন্তত দুইজনকে মারিয়া তবে সে মরিবে। সে দুইজন হইবার আশঙ্কা প্রত্যেকেরই আছে। তাহারা অনন্তকে ধমক দিয়া বলিল—এই ঠাকুর! এই!

অনন্ত বলিল—আমি মরব। ওরে ব্যাটারা, আমি মরব। বেটা গো-হত্যে করেছে, ব্রহ্ম-হত্যেও করুক। নে বেটা, আমাকেও খুন কর।

এতক্ষণে প্রশ্ন করিবার সময় ও সুযোগ পাইয়া পানু উঠিয়া ভাঙা গলায় সবিনয়ে বলিল—বাছুরটি তোমার ঠাকুর? সকলে আশ্চর্য লইয়া গেল।

রন্ধনকার্যে পারদর্শীরা রসায়ন-শাস্ত্র জানে না; কিন্তু একটা ভাত টিপিলেই হাঁড়ির খবরটা বুঝিতে পারে। চাপরাসীরা পানুর বিনয় দেখিয়া ঝট করিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল—চল।

পানুর হাতখানা শক্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু শক্তিপ্রয়োগ সে করিল না। বলিল—কোথা?

—কাছারি। বাবুর তলব আছে।

—বাবুর তলব? কাহে? বাবুর কি ধার ধারি আমি? বাবুর নামে পানু জ্বলিয়া উঠিল। সবাই সংসারে ভেল্কিদার, কিন্তু জমিদার বড় ভারি ভেল্কিদার। উহারা সব মাছকেই মাগুর মাছ কোটার পদ্ধতিতে কাটে। উহারা ফলের শাঁস খায় না, নিঙড়াইয়া রস বাহির করিয়া খায়। পায়ে হাঁটে না, লোকের ঘাড়ে চাপিয়া পাল্কি করিয়া যায়। হাতে মারে না, ভাতে মারে। হাতে মারিলে নিজে মারে না, অপরকে দিয়া মারায়। মারিবার আগে বাঁধে। সে টানিয়া হাতটা ছাড়াইয়া লইল।

চাপরাসীটা বলিল—জবরদস্তি করলে ভাল হবে না।

পানু হুঙ্কার দিয়া উঠিল।—বাবুর কাছে যাব কেন? কে ওই ঠাকুর?

পানু ভাবিয়াছিল, ঠাকুর বাবুর দরবারে নালিশ করিয়াছে। কিন্তু চাপরাসী বলিল—তুমি বাবুর বাছুর মেরেছ কেন?

পানু মুহূর্তে যেন নিবিয়া গেল। বলিল—বাবুর বাছুর?

—হাঁ হাঁ। চলো চলো। পানুর নিবিয়া-যাওয়াটা আলো নিবিলে অন্ধকার হইয়া যাওয়ার মতই পরিস্ফুট; সেই অন্ধকারের সুযোগে বৃক্ষ-আশ্রয়ী ভূতের মতই চাপরাসীর দল নাচিয়া গাছের তলায় পথিকের মত পানুকে ধরিয়া বলিল—চল।

পানু দ্বিরুক্তি করিল না। বলিল—চল।

অপরাধীর মত সে চাপরাসীদের সঙ্গে কাছারির দিকে অগ্রসর হইল। মাথা নীচু করিয়া চলিল, মুখে কোন কথা বলিল না। তাহার পাশে পাশেই অনন্ত চলিয়াছিল, সমানেই সে গালি-গালাজ করিতেছিল; পানু একবার তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিল না। তাহার মনের অপরাধ-বোধের কাছে এ সব অপমান এত তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে যে, তাহাতে তাহার কোন ক্ষোভ জাগিতেছে না।

বাবু বসিয়া ছিলেন হাঁটু ভাঙিয়া, কনুইয়ের উপর ভর দিয়া অনেকটা শিকারোদ্যত পশু-রাজের মত। ঐভাবে বসাই তাঁহার অভ্যাস। ঐ বসার ভঙ্গির সঙ্গে যে জানোয়ারের শিকার ধরার ভঙ্গির সাদৃশ্য আছে এটা অবশ্য তিনি কখনও ভাবিয়া দেখেন নাই। লোকেও ভাবিয়া দেখে না; ভাবে, ওটা একটা রাজকীয় কায়দা।

বাবু তাহার দিকে চাহিয়া একেবারেই বলিয়া দিলেন—পঞ্চাশ টাকা জরিমানা। বস ওই-খানে। দিয়ে উঠে যা।

পানু কোন প্রকার বিদ্রোহ করিল না। বসিল।

তাহার নীরবতায় বাবু অত্যন্ত চটিয়া গেলেন, তাঁহার আসনের নীচেই পড়িয়া ছিল তাঁহার চটি, সেই চটি তুলিয়া লইয়া তিনি ছুঁড়িয়া মারিলেন পানুর মুখে। হারামজাদা, গরু মার তুমি? গোহত্যাকারী!

কর্মচারীবৃন্দ শঙ্কিত হইয়া উঠিল। নায়েব আসিয়া বাবুর সামনে দাঁড়াইয়া বলিল—থাক। মুখে বলিল না, ইঙ্গিতে জানাইল। পানুকে পিছনে রাখিয়া তাহার সামনে দাঁড়াইয়া ইঙ্গিত করিল—পানু দেখিতে পাইল না।

বাবু তাহার ইঙ্গিত বুঝিলেন, ডাকিলেন—চাপরাসী!

চাপরাসী আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

বাবু বলিলেন—হিঁয়া খাড়া রহো।

চাপরাসীটা দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু যাহার জন্য এত শঙ্কা, এত সাবধানতা—সে যেমন মাথা হেঁট করিয়া আসিয়াছিল, মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া ছিল—তেমনি ভাবেই বসিয়া রহিল। জুতা খাইয়াও একবার মাথা তুলিল না।

অনেকক্ষণ পর বাবু আবার বলিলেন—গোহত্যা কর তুমি?

পানু এবার চোখ তুলিয়া চাহিল। সকলে সবিস্ময়ে দেখিল পানু কাঁদিতেছে।

পানুর ভয় দেখিয়া অনেকে আশ্বস্ত হইল—ওঃ, এইবার গোঁয়ারের শাসনকর্তা মিলিয়াছে।

বাবু নিজের দণ্ডবাক্য আবার উচ্চারণ করিলেন—পঞ্চাশ টাকা জরিমানা।

পানু এবার উঠিয়া দাঁড়াইল।

বাবু বলিলেন—বস।

—টাকা তো আমার সঙ্গে নাই বাবু। টাকা আনতে হবে তো। পানু সবিনয়েই বলিল।

বাবু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—আধ ঘণ্টা। আধ ঘণ্টার মধ্যে।

—তাই দোব।

পানু আধ ঘণ্টার মধ্যেই পঞ্চাশটি টাকা বাবুর সামনে নামাইয়া দিল। তারপর নীরবেই কাছারি হইতে বাহির হইয়া গেল। বাবু বলিলেন—টাকাটা জমা কর। বাজে খাতে আদায়—

অনন্ত বাহিরে প্রতীক্ষা করিয়া ছিল। তাহার কেশকলাপের মূল্য হিসাবে বাজে খাতে খরচের কত অঙ্ক নির্ধারিত হয় শুনিবার জন্য। সে শুনিল, জমাই হইল পঞ্চাশ টাকা। খরচের কোন উল্লেখই হইল না। সে আর একদফা অভিসম্পাত দিল পানুকে।—শালার অম্বলশূল হোক, কুষ্ঠ হোক, বজ্রাঘাত হোক মাথায়।

এ পর্যন্ত ভালয়-ভালয় কাটিয়াও কিন্তু শেষরক্ষা হইল না। আবার একটা হাঙ্গামা বাধিল। বৈকালে বাবুদের গরুর গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল পানুর বাড়ির সম্মুখে। সঙ্গে অনন্ত ঠাকুর ও রাখাল মাহিন্দার। পানু ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল—আবার কি?

—বাছুরটা নিতে এসেছি। দাও বাছুর। অনন্তের আক্রোশ যেন কিছুতেই মিটিতেছে না।

—বাছুর? পানু সাফ বলিয়া দিল—বাছুর আমি দোব না।

পানুর ও বেলার অপরাধীর মত আচরণ দেখিয়া এবারকার অভিযানটা নিতান্তই নিরীহ-গোছের ছিল। আদালতের পরোয়ানা লইয়া পিওন আসে, সে জানে, ওই শীলমোহরটাই তাহার বল। সেটা যেখানে অমান্য হইবার আশঙ্কা থাকে সেইখানেই আসে পুলিস। পুলিসের পর আসে ফৌজ। ফৌজ রাজ্য দখলের পর পুলিস শাসন করে—তারপর চলে পরোয়ানাতেই কাজ। ও-বেলায় ফৌজ এবং পুলিসের কাজ হইয়া গিয়াছে। তাই এ-বেলায় শুধু রাখালটা এবং একজন মাহিন্দার গাড়ি লইয়া বাছুরটাকে লইতে আসিয়াছিল।

রাখাল ছোঁড়াটা বলিল—ওই! বাছুর যে আমাদের।

পানুর সর্বাঙ্গ জ্বালা করিয়া উঠিল। সে বীভৎস ভঙ্গিতে হাত-পা নাড়িয়া দাঁত খিঁচাইয়া বলিল—ওরে শালার বেটা শালা, ছুঁচোর গোলাম চামচিকে, বাছুর তোমাদের? তার পর আঙুল দেখাইয়া বলিল—ভাল চাও তো বেরো। বেরো বলছি—বেরো।

রাখাল ও মাহিন্দারটা হতভম্ব হইয়া গেল।

পানু বলিল—খুন করে ফেলব। বেরো বলছি। বেরো।

তাহারা গাড়ি লইয়া পলাইয়া গেল। কিছুক্ষণ পর আবার আসিল অভিযান। অনন্ত ঠাকুর ও সাত-আটজন চাপরাসী—হাতে লাঠি। অনন্ত ঠাকুর চীৎকার করিতে গেল, কিন্তু চীৎকার করা হইল না।

পানু এবার একগাছা লাঠি হাতে দাঁড়াইয়াছে। নীরবে—কোন আস্ফালন সে করিতেছে না। কিন্তু চোখে তাহার এমন দৃষ্টি যে, তাহা দেখিয়া মানুষের মনে হয় অগ্নিগর্ভ একটা ঘরের দুইটা জানালা দিয়া আগুনের শিখা বাহির হইয়া আসিতেছে। অনন্ত বলিল—ওই দেখ! সে পিছাইয়া গেল। আগাইয়া আসিয়া একজন চাপরাসী বলিল—বাছুর দিস নাই কেনে?

পানু বলিল—বাছুর আমি কিনেছি।

—কিনেছিস ?

—হ্যাঁ। সকাল বেলায় করকরে পঞ্চাশ টাকা গুনে দিয়েছি।

—সে তো জরিমানা।

—জরিমানা-টরিমানা আমি বুঝি না। বাছুরটাকে আমি মেরেছি, খোঁড়া করে দিয়েছি, বাবু তার জন্যে পঞ্চাশ টাকা চাইলে, তাই দিলাম। বাছুর কেনে দোব আমি ? তোর কোন জিনিস ভেঙে দিলে—তার দাম দিতে আমি বাধ্য। কিন্তু তা হলে ভাঙা জিনিসটা তো আমার।

পানুর যুক্তির দাম ন্যায়শাস্ত্র দিবে কি না জানি না, কিন্তু চাপরাসীরা দিল। এই শ্রেণীর লোকের কাছে যুক্তিটার মূল্য আছে—তাহারা অন্তত বুঝিল।

পানু বলিল—এর জন্যে খুন হতে হয়, জান দিতে হয়, তাও দোব। আয়, কে আসবি বাছুর নিতে, চলে আয়।

অনন্ত বলিল—আমরাও খুন হব, তবু ফেরেঙ্গা নেহি। লাগাও।

রাজুবালা মুখ বাড়াইয়া বলিল—পুলিসে আমরা খবর দোব। জবরদস্তি করার আইন নাই। রাজুবালার কথাও চাপরাসীরা অবিশ্বাস করিল না। রাজু তাহা পারে। অনন্তের হুকুমে তাহারা খুন হইতেও পারে না, করিতেও পারে না। চাপরাসীরা ফিরিয়া গেল বাবুর নূতন হুকুমের জন্য। প্রয়োজন হইলে তাহারা পানুর মাথা ফাটাইয়া দিতে পারে কি না—পানু তাহাদের মাথা ফাটাইলে বাবু তাহার কি পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিবেন, বাবুর কাছেই সেটা জানা তাহাদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন।

চাপরাসীরা চলিয়া গেল ; পানু তখনও ফুঁসিতেছিল।

রাজুবালাকে এ অঞ্চলের লোকে পথেঘাটে দেখিলে ডাকিয়া কথা বলে, রসিকতা করে, মিষ্ট কথায় তাহার মনস্তুষ্টি করিতে চায় ; কিন্তু অন্তরালে বলে—সাংঘাতিক মেয়ে, সাততলা বুদ্ধি, না পারে এমন কাজ নাই। রাজুর সংসার-জ্ঞান সত্যই খুব টনটনে। আইন বে-আইনও সে বুঝে। রাজু চাপরাসীদের মুখে শাসাইল—আমরা তা হলে থানায় যাব। কিন্তু চাপরাসীরা চলিয়া গেলে পানুকে বলিল—একটা কথা বলব ?

—কি ? পানু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ভ্রূ কুঁচকাইল। কথার সুরটাই তাহার ভাল লাগিতেছে না।

রাজু বলিল—এইখানে এস, লাঠিটা রেখে বস। মাথাটা একটু ঠাণ্ডা কর, তারপর বলব।

পানু অত্যন্ত চটিয়া উঠিল—রাজিয়ার কথাগুলার প্রত্যেকটাতে যেন একটা করিয়া খোঁচা আছে, সে মাথা নাড়িয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—না—না—কোন কথা হাম নেহি শুনেগা।

রাজু চুপ করিয়া গেল। বৈকালবেলা গড়াইয়া চলিয়াছে, সে ঝাঁটাগাছটা তুলিয়া লইয়া বৈকালের কাজ সারিবার দিকে মন দিল। পানু কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া হনহন করিয়া আসিয়া দাওয়ায় উঠিয়া লাঠিগাছটা রাখিল—রাজুর হাতের ঝাঁটাগাছটা টানিয়া ফেলিয়া দিয়া তাহাকে টানিয়া বসাইয়া বলিল—কি বলছিস বল ?

রাজু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিল, তারপর বলিল—ওই পা-ভাঙা বাছুরটা নিয়ে কি হবে ? ও নিয়ে হাঙ্গামা করছ কেন ? ওদের বাছুর ওদের দিয়ে দেওয়াই তো ভাল।

পানু এ কথায় আবার চটিয়া উঠিল, বলিল—পা ভাঙা সারবে। আর বাছুর ওদের কি

করে হল ? বাছুর আমার।

—তোমার ? তোমার কি করে হল ?

—আমি পঞ্চাশ টাকা দিলাম যে।

—সে তো বাছুরটার পা ভেঙেছ বলে।

পানু বিব্রত হইয়া উঠিল, অনেক ভাবিয়া বলিল—বাছুরটার কত দাম ?

—সে আর কত হবে ? পাঁচ টাকা কি সাত টাকা—বড় জোর দশটা টাকা।

—তবে ? বাছুরটার দাম দশ টাকা, তা ওর একটা ঠ্যাঙের দাম পঞ্চাশ টাকা কি করে হয় ?

এবার রাজুকে নির্বাক হইতে হইল। পানু হঠাৎ তাহার একটা হাত টানিয়া ধরিয়া একটা কাচের চুড়ি দেখাইয়া বলিল—এটার কত দাম ?

—কেন ?

—বল, আগে বল। তারপর বলছি।

—চার আনা।

পানু উঠিয়া ঘরের ভিতর চলিয়া গেল, ফিরিয়া আসিয়া রাজুর হাতখানা আবার টানিয়া মাটিতে ঠুকিয়া দিল। চুড়িটা ভাঙিয়া গেল। পানু একটা টাকা রাজুকে দিয়া বলিল—এই নে। চার আনার জায়গায় এক টাকা দাম দিলাম। তারপর ভাঙা চুড়ির টুকরা কুড়াইয়া লইয়া বলিল—এগুলো এখন কার ?

রাজু এবার পানুর ন্যায়শাস্ত্রের প্রত্যক্ষ বিশ্লেষণের মর্ম বুঝিয়া হাসিয়া বলিল—মরণ আমার ! গরুটা যে জ্যান্ত জানোয়ার। ওটা কি কাচের চুড়ি ?

পানু অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—পাঁঠাও তো জানোয়ার, কিনে যে কাটি ! গরু কিনে মুসলমানে যে সে গরু কাটে !

রাজু এবার বলিল—বাবু তো তোমাকে বাছুর বেচে নাই।

—তবে পঞ্চাশ টাকা নিলে যে ?

—সে তো জরিমানা।

—জরিমানা ? জরিমানা কি ? জরিমানা কেনে দিব আমি ? কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে বার বার ঘাড় নাড়িয়া অস্বীকার করিয়া বলিল—জরিমানা আমি কেনে দিব ? উ আমি দিব না। ও-টাকা দিলাম আমি, বাছুর আমি দিব না। দিব না আমি। জান কবুল। উ দিব না আমি।

রাজু শঙ্কিত হইল। পানুর অভিনব ন্যায়ের তর্ক সে বুঝিয়াছে। কিন্তু ও অভিনব ন্যায়ের প্রচলন সংসারে আজও হয় নাই, সুতরাং ও যুক্তি জমিদার মানিবে কেন ? জমিদারেরও যে পানুর মত একটা নিজস্ব ন্যায়শাস্ত্র আছে। সে ন্যায়ের যুক্তি অস্বীকৃত হইলে তাহার মীমাংসার পথও জমিদারের নিজস্ব মীমাংসাশাস্ত্র। তাহার বিধি-বিধানের সঙ্গেও রাজুবালার পরিচয় আছে, কাজেই সে শঙ্কিত না হইয়া পারিল না।

ফিরিয়া আসিয়া পানু কিন্তু নির্বিকার। সে বাছুরটার পাশে বসিল। বাছুরটা এখন অনেকটা সুস্থ হইয়াছে। পা তাহার জোড়া লাগে নাই, কিন্তু তিন দিন সে পেট পুরিয়া খাইয়া অন্য দিকে সুস্থ হইয়াছে। তা ছাড়া এত সেবা সে কখনও পায় নাই। তাহার রোমবিরল গায়ের চামড়া হইতে 'এঁটুলি' তুলিয়া কেলা হইয়াছে ; গরম জলে সমস্ত দেহের ক্লেদ মুছাইয়া দেওয়া হইয়াছে ; বেশ সুস্থভাবে সে রোমন্থন করিতেছিল। পানু তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া

দিল। বাছুরটা ফোঁস-ফোঁস করিয়া পানুকে শুঁকিয়া দেখিতেছিল।

রাজু পাশে দাঁড়াইয়া বলিল—সব্বনাশী! সব্বনাশী কোথা থেকে এসে এক মুঠো টাকার গায়ে জল দিলে।

পানু বলিল—এইবার ওর গায়ে বেশ রোঁয়া গজাবে রাজি, না?

রাজি বলিল—হ্যাঁ, একেবারে এলোকেশী হবে। এই বড় বড় চুল।

পানু হঠাৎ বাছুরটার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—আচ্ছা বলেছিস রাজি; উ আমার সব্বনাশী—এলোকেশী!

রাজি বলিল—একটা গান শুনবে?

—গান? গীত?

—হ্যাঁ গো, এলোকেশী সব্বনাশীর গান? বলিয়াই সে সুর করিয়া মৃদুস্বরে গাহিল—

আমার কাশী যেতে মন কই সরে?
ও সব্বনাশী এলোকেশী আমার সঙ্গে সঙ্গে ফেরে!

পানু বলিল—ভাল গান রাজিয়া। ভাল গান।

একুশ

রাজু রোজই আশঙ্কা করে—আজ একটা কিছু ঘটিবে। সব্বনাশী এলোকেশী দায় এমন শীঘ্র শেষ হইয়া যাইবে এ তাহার মনে হয় না। কিন্তু দুই দিন তিন দিন হইয়া গেল—কিছুই ঘটিল না। রাজু একটু বিস্মিত হইল।

পানুর ওদিক দিয়া কোন চিন্তাই নাই। সে শুধু তাহার লাঠিগাছটা একেবারে হাতের পাশেই রাখিয়াছে এবং ধারালো 'হেঁসো' নামক অস্ত্রখানা তাহার বসিবার জায়গার সামনে চালের বাতায় আটকাইয়া রাখিয়াছে; সে শুধু বসিয়া বসিয়া ভাবে। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, চীৎকার করে। রাত্রি হইলে পলাইবার ইচ্ছা হয়। কিন্তু তাও পারে না।

তাহার 'সব্বনাশী এলোকেশী' এ কয়দিনে অনেকটা সারিয়া উঠিয়াছে। বাঁখারি-বাঁধা পা-খানা খোঁড়াইয়া টানিয়া চলিবার চেষ্টা করে। দুই-চারি পা চলিতেও পারে। বর্ষার ভাঙা জমির বুকের ঘাসের অঙ্কুরের মত তাহার রোঁয়া-উঠা চামড়ায় ছোট ছোট রোঁয়া গজাইতে সুরু করিয়াছে। তাহার গলার ডাকে বেশ জোর ধরিয়াছে, খাওয়ার সময় কোন রকমে পার হইলেই সে তারস্বরে চীৎকার সুরু করে। 'সব্বনাশী' চীৎকার আরম্ভ করিলেই রাজু এবং সেজ-বউ ব্যস্ত হইয়া উঠে, বিশেষ করিয়া সেজবউ। সব্বনাশীর সঙ্গে এখনি পানুও চীৎকার আরম্ভ করিবে ষাঁড়ের মত। রাজুর রক্ষা আছে, তাহার অনেকটা সময় বাহিরে কাটে, সেজবউয়ের যত জ্বালা!

দিন পনেরো পর।

দুপুরবেলায় খাওয়া-দাওয়া সারিয়া সেজবউ পুকুরঘাটে আঁচাইতে গিয়া পরম উপাদেয় কলহ-পালার সন্ধান পাইয়া সেইখানেই জমিয়া গেল। পুকুরটার ওই পারেই হাড়ীপাড়া। হাড়ীপাড়ায় ঝগড়া বাধিয়াছে। হাড়ীপাড়ার 'সুকো' হাড়িনী, আসল নাম সুখদা, নাচিয়া নাচিয়া গালিগালাজ করিতেছে। সুকো হাড়িনীর ঝগড়ার ওই বিশেষত্ব, সে সত্য সত্যই নাচে আর গাল দেয়—

'ওলো তুই বাপের মাথা খা লো। ওলো তুই ভাইয়ের মাথা খা লো। ওলো তুই ভাতারের মাথা খা লো। ওলো তুই গতরের মাথা খা লো। চোখের মাথা খাও, তুমি কানা হও, কানা হও; পা দুখানি ভেঙে যাক—খোঁড়া হও খোঁড়া হও, নাকে তোমার পিঙেস হোক, খোনা হও খোনা হও। গতরের মাথা খেয়ে ভিখ করে খা লো, ভুগে ভুগে মর লো! মর লো, মর লো—ওলো তুই মর লো।' বলিয়াই সে ঘুরপাক দিয়া নাচিয়া একটা পর্ব শেষ করে।

ছন্দে গাঁথা গানের মত গালাগালখানি সুখোর মুখস্থ। একটি শব্দের এদিক ওদিক হয় না। নাচের সঙ্গে তালে তালে গানের কলির মত এক-একটি পর্যায় শেষ হয়। অস্থায়ী অন্তরা প্রভৃতি বোধ করি বিশ্লেষণ করিলে পাওয়া যায়। সুকো গাল দিতে আরম্ভ করিলে লোকে দাঁড়াইয়া দেখে, মেয়েদের গা কেমন শিরশির করে। গালাগাল শুনিতে শুনিতে সেজবউয়ের গাও কেমন শিরশির করিতেছিল। সে প্রত্যাশা করিয়াছিল—বাপ-ভাই-স্বামী-গতর প্রভৃতির সহিত অভিসম্পাত শেষ করিয়াই এইবার সুকো অশ্লীল-পর্ব আরম্ভ করিবে। ওদিকের ঘাটে দাঁড়াইয়া ভাদু হাড়িনী মৃদু মৃদু হাসিতেছে।

ঠিক এই সময়েই বাড়ির ওদিক হইতে 'সব্বনাশী' রব তুলিল। বাড়ির খাওয়া-দাওয়ার পরই তাহাকে অবশিষ্ট ভাত ডাল তরকারি যাহা থাকে সেগুলি বেশ করিয়া চটকাইয়া খাওয়ানো হয়। পনেরো দিনেই সব্বনাশীর সময়গুলি এমন অভ্যাস হইয়া গিয়াছে যে, ইহারই মধ্যে আদরিণী আবদেরে খুকীর মত চীৎকার সুরু করিয়া দিয়াছে। পানু বারান্দার তক্তাপোশে শুইয়া ঘুমাইতেছে। ঘুম ভাঙিয়া গেলে আর রক্ষা থাকিবে না। ঘুম ভাঙার বিরক্তির ফলে তাহার এলোকেশীর প্রতি অবহেলার অপরাধটা এত বড় হইয়া উঠিবে যে, সেজবউয়ের উপর—ওই বাছুরটার উপর লাঠি চালানোর মত—লাঠি চালানোও আশ্চর্য নয়। সেজবউ বেচারা ছুটিতে আরম্ভ করিল। বাড়ি আসিয়াই হুড়মুড় করিয়া ভাত ডাল মিশাইয়া লইয়া সব্বনাশীর উদ্দেশ্যে চলিল। হতভাগী কিন্তু এতক্ষণে থামিয়াছে। পানুরও তর্জনগর্জন শোনা যায় না। সেজবউ আশ্বস্ত হইল। ভগবান সব্বনাশীকে সুমতি দিয়াছেন। সে চুপ করিয়াছে। পানুও জাগে নাই। কিন্তু বাড়ির বাহিরের দাওয়ার উপর আসিয়াই সে ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। সর্বনাশ হইয়াছে! সব্বনাশী খোঁড়া পা-খানা টানিয়া দাওয়ার ধারেই গাছগুলির কাছে হাজির হইয়াছে। শুধু তাই নয়, সেই হেনার গাছটি এই পনেরো দিনে আবার কতকগুলি পাতা মেলিয়াছিল, সেইগুলিই সে টানিয়া ছিঁড়িয়া খাইতে সুরু করিয়াছে। ভাগ্য ভাল যে, পানু এখনও জাগে নাই। সেজবউ ছুটিয়া গিয়া সব্বনাশীকে গলায় জড়াইয়া ধরিল; তাহাকে টানিয়া সরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিল, চাপা গলায় তাড়াও দিল—হেট! হেট! হেট! সব্বনাশী কিন্তু কিছুতেই আসিল না। সেজবউয়ের আকর্ষণের বিরুদ্ধে সে তাহার তিনখানা পায়েরই খুঁট দিয়া গাছটার উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। সব্বনাশীর এতখানি শক্তি এবং ওজন সেজবউ কল্পনা করিতে পারে নাই। অতর্কিতভাবে সব্বনাশীর ঝোঁক সামলাইতে না পারিয়া—নিজের কাপড় পায়ে বাধাইয়া সে-ই পড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ হো-হো হাসির শব্দে স্থানটা সচকিত হইয়া উঠিল। পানু হাসিতেছে। সেজবউ তাড়াতাড়ি উঠিয়া সব্বনাশীকে আবার ধরিল।

পানু বলিল—ছেড়ে দে।

সেজবউ অবাক হইয়া গেল। কিন্তু ছাড়িয়া দিতেও পারিল না।

—ছেড়ে দে।

—আবার যে হেনার গাছটা খেয়ে দিলে!

—দেখেছি। ছেড়ে দে, থাক।

সেজবউ ছাড়িয়া দিল।

পানু উঠিয়া ভাত-ডালের পাত্রটা লইয়া গিয়া এলোকেশীর মুখের কাছে ধরিল। বলিল—এই খা।

এলোকেশী ফোঁস শব্দ করিয়া মাথা নাড়িল অর্থাৎ না। মাছ-ভাতের চেয়ে হেনা গাছের পাতা কয়টা অনেক সুমিষ্ট। পানু এলোকেশীর মুখের দিকে চাহিয়া রসিকতা করিল—হুঁ। পাতাই মিষ্টি! গরু কিনা। তারপর সে নিজেই ডালটার পাতাগুলি নিঃশেষে ছিঁড়িয়া ওই মাছ-ভাতের সঙ্গে মিশাইয়া দিল। বলিল—নে, এইবার খা।

এলোকেশী এবার মাছ-ভাতের পাত্রে মুখ ডুবাইল।

ব্যাপারটা দেখিয়া পানুর তৃতীয় বউ সেজ বিস্ময়ে কেমন হইয়া গেল। ঠিক এই সময়ে ফিরিল রাজু; বাবুদের গ্রামে সে দুধ বিক্রয় করিতে গিয়াছিল। পানুর পিছনে সেজর সঙ্গে সামনা-সামনি দাঁড়াইয়া সেও অবাক হইয়া গেল। ব্যাপারটা কি? সেজবউয়ের মুখে এমন অভিব্যক্তি সে কখনও দেখে নাই। চোখে শঙ্কা নাই, ভঙ্গিতে সঙ্কোচ নাই, অথচ চোখ দুইটা ছানাবড়ার মত বড় হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু আজ সেজবউটার ব্যাপারটা কি? পানুর পিছনে দাঁড়াইয়া সে ভুরু কুঁচকাইয়া ঘাড় নড়িয়া ইঙ্গিতে প্রশ্ন করিল—কি? হল কি?

উত্তরে সেজও নিঃশব্দে বিস্ময়ের ইঙ্গিতে ঘাড় নাড়িল, চোখ দুইটা আরও খানিকটা বড় করিয়া গালের উপর হাত রাখিল—অর্থাৎ অবাক!

রাজু এবার ঘটি রাখিবার অছিলায় বাহির বাড়ি হইতে ভিতরের উঠানে গিয়া দাঁড়াইল, চোখের ইসারায় সেজকে ডাকিয়া উঠান হইতে ঘরে গিয়া ঢুকিল।

সেজবউয়ের প্রাণটাও আইঢাই করিতেছিল, পেটটা যেন ফুলিয়া উঠিয়াছে। রাজুকে ইঙ্গিতে জানাইতে গিয়া আকুলতা আরও বাড়িয়া গিয়াছে। সেও আসিয়া ঘরে ঢুকিল এবং বলিল—অবাক! দিদি অবাক!

—কি? কি অবাক?

—মিন্‌সে আর ছ মাস পেরুবে না দিদি। এ আমি বলে রাখলাম।

—হল কি তাই বল আগে।

—মতিভ্যম, দিদি মতিভ্যম। মরণের ছ মাস আগুতে মানুষের মতিভ্যম হয়। যে গাছের পাতার লেগে বাছুরটার ঠ্যাং ভেঙেছিল, সেই গাছ আবার আজ খেলে ওই সব্বনাশী; তা হা-হা করে হাসি কি! তারপরে দিদি, অবাক কাণ্ড!

আবার সে চোখ বড় করিয়া গালে হাত দিল।

রাজু ভ্রূ কুঞ্চিত করিল—মনে হইল, এই বিড়ালীর মত মেয়েটার গালে ঠাস করিয়া একটা চড় কষাইয়া দেয়। সেজবউ কিন্তু রাজুর বিরক্তি বুঝিল। সে বলিল—তুমি সে দেখ নাই, তুমি বুঝতে নারছ। তারপরে করলে কি জান? সব্বনাশী ওকে গুঁতিয়ে দিলে, ফোঁস করলে, মাছ-ভাত মুখে ধরলে তা খেলে না—ওই গাছের ওপর ঝোঁক। শেষে নিজে হাতে দিদি, নিজের হাতে—

রাজু বলিল—থাম। সে কান খাড়া করিয়া ঘাড় তুলিল।

সেজ বোকার মতই প্রশ্ন করিল—অ্যাঁ?

—থাম। বুঝি—

রাজুর কথা ঢাকিয়া বাহিরে রাস্তার উপর কোথায় চমৎকার শব্দে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। এ দেশে পূজার সময় যে ঘণ্টা বাজায় সে ঘণ্টা নয়; এ ঘণ্টার সুর আলাদা—ঢং আলাদা।—টিং

টং, টিং টং, টনো টং, টনো টং ; টং-টং টং-টং !

তাহার সঙ্গে ঘোড়ার খুরের শব্দ উঠিতেছে। রাজু ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। বাবুদের গাড়ি। নিশ্চয় বাবুদের গাড়ি। বাবুদের গ্রামে পশ্চিমা ভুপা মাহাতোর খান দুয়েক ছ্যাকরা গাড়ি আছে, তাহাতে ঘণ্টাও নাই, তাহার ঘোড়া দুইটার আটটা খুরে এমন জোরালো খপ্ খপ্ খপ্ খপ্ শব্দও উঠে না। শব্দ দ্রুত আগাইয়া আসিতেছে। রাজু বাহিরে আসিল। পানুও উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। পথের দিকে চাহিয়া আছে। হ্যাঁ, বাবুদের গাড়িই বটে।

বাবুদের গাড়িটা এবার স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। কালো রঙের গাড়িতে সাদা জুড়ি। কোচম্যানের মাথায় সাদা চাদরের ধবধবে পাগড়ী। তাহার পাশে লাল পাগড়ী মাথায় চাপরাসী।

কিন্তু কি জন্য আসিতেছে বাবুদের জুড়ি ? অনন্ত ঠাকুর ও চাপরাসীরা গরুর গাড়ি লইয়া ফিরিয়া গিয়াছে, এবার তাহারা কি জুড়ি চড়িয়া আসিতেছে। অনন্ত ঠাকুর ও চাপরাসীরা বাবুদের বাড়ির ঠাকুরের পিতলের রথে চড়ে ঠাকুরের সঙ্গে, কিন্তু জুড়িতে চড়িতে তো পায় না ! বাছুরটাকে লইয়া যাইবার জন্য ও-বেলা গরুর গাড়ি আসিয়াছিল, ঘোড়ার গাড়ি নিশ্চয় সেটাকে লইবার জন্যও আসিতেছে না।

ঘোড়ার গাড়িটার পিছন দিক হইতে আরও দুইটা লালপাগড়ী-পরা ভোজপুরী পালোয়ান চাপরাসীর মাথা দেখা যাইতেছে। কোচম্যান রাশ টানিয়া ঘোড়া দুইটার গতি মন্থর করিতেছে। গাড়িটা যে তাহার এখানেই আসিয়াছে এবং বাছুরটার স্বত্বের মামলার চরম মীমাংসার জন্য আসিয়াছে, তাহাতে আর কাহারও সন্দেহ রহিল না। রাজুরও না, পানুরও না। রাজু বাড়ির ভিতর ঢুকিয়া পড়িল, ভিতরের উঠান পার হইয়া খিড়কীর দরজার পথে বাহির হইয়া গাছপালার ভিতরে অদৃশ্য হইয়া গেল। পানু আপনার দরজার উপর উঠিয়া এক হাতে পরচালার চালের একখানা বাঁখারি ধরিয়া দাঁড়াইল।

ঠিক ওই বাঁখারিখানার উপরেই চালের খড়ের মধ্যে তাহার ধারালো হেঁসো নামক অস্ত্রখানা গোঁজা আছে।

গাড়িটা আসিয়া ঠিক তাহার দাওয়ার সামনেই থামিল। রাশ টানিয়া কোচম্যানটা ঠোঁটে চুক্ চুক্ শব্দে ঘোড়া দুইটাকে বাহবা দিয়া শান্ত হইতে ইসারা করিল। দারোয়ান তিনজন লাফ দিয়া নামিয়া পড়িল। একজন গাড়িটার পা-দানির দরজাটা খুলিয়া দিল। ভিতরে একজন মানুষের পায়ের দিকটা দেখা যাইতেছে, কিন্তু কোমর হইতে মাথা পর্যন্ত প্রায় আড়াল পড়ায় ঠিক চেনা যাইতেছে না। ম্যানেজার ? না, সে তো এত লম্বা নয়। বাবু নিজে ?

হাঁ, তাই বটে। দরজাটা খুলিয়া দিতে স্বয়ং বাবুই নামিলেন। তাঁহার হাতে একগাছা লম্বা চাবুক।

বাইশ

স্বয়ং বাবুই আসিয়াছেন। তাঁহার হাতে একগাছা চাবুক। শঙ্কর মাছের লেজের তৈরি চাবুক।

তিনি ঠিক বাছুরটার জন্য আসেন নাই। বাছুরটা গোবৎস না হইয়া ছাগবৎস হইলে এর চেয়ে বেশী দরদ থাকিত তাঁর, বিলাতী কুকুর হইলে কথাই ছিল না ! বাছুরটার জন্য লোভ বা

শখ তাঁহার আদৌ নাই। জরিমানা দিবার পর পানু যদি জোড়হাত করিয়া তাঁহাকে বলিত—বাবু, বাছুরটা আমাকে দিতে হবে; এমন কি সকালে চাপরাসীদের সঙ্গে গিয়াও বলিত, তবে তিনি নিশ্চয় ওটাকে দান করিতেন; যে গাড়িটা লইতে আসিয়াছিল সেই গাড়ি করিয়াই পাঠাইয়া দিতেন। এমন কি হাসিয়া বলিতেন—ইচ্ছে হয় তো আরও দুটো নিয়ে যা। কারণ বাড়ির বালিকা গোমাতাগুলি তাঁহাদের মত বাবুদের বাড়িতে কুলীন-কন্যার চেয়েও গলগ্রহ; ওগুলা কোন কাজেই আসে না। শ্রাদ্ধশান্তিতে দান করিতে দুই-চারিটা লাগে, বাকীগুলা শুধু ভাগাড়ে ফেলিতে হয়। কিন্তু হতভাগ্য পানু ও-বেলায় তাঁহার চাপরাসীদের অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে, অনন্ত ঠাকুর ন্যাড়া মাথার চুল ছিঁড়িতে পায় নাই—তাহার পরিবর্তে বুক চাপড়াইয়া ব্যাপারটাকে এমন ক্ষোভের সহিত নিবেদন করিয়াছে যে, তিনি দুরন্ত ক্রোধে এই গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরে নিজেই জুড়ি হাঁকাইয়া আসিয়াছেন। গাড়ির ভিতর বসিয়া আসিবার পথে তাঁহার মনে বিস্ময়েরও উদ্রেক হইয়াছে।

লোকটার সম্পর্কে তাঁহার প্রচণ্ড কৌতূহল জন্মিয়াছে। এই লোকটাই দিন কয়েক আগে তাঁহার কাছারিতে বিনা বাক্যব্যয়ে গিয়া হাজির হইয়াছিল। অনেকে অনেক কথাই বলিয়াছিল, তিনি নিজেও একটা হাঙ্গামা অনুমান করিয়াছিলেন। যে লোক একটা গাছের কয়টা পাতা খাওয়ার জন্য একটা বাছুরকে মারিয়া ফেলিবার মত আঘাত করিতে পারে, তাহার সম্পর্কে সকল শোনা কথাই তিনি বিশ্বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু সব অনুমান ব্যর্থ করিয়া দিয়া কাছারি-ঘরে লোকটা অপরাধীর মত হাজির হইল। বাবু জুতা মারিলেন—মাথা পাতিয়া তাও সহ্য করিল। পঞ্চাশ টাকা জরিমানা করিলেন—অবনত মস্তকে জরিমানা আদায় দিল। লোকে বলিল, তিনিও বুঝিলেন, লোকটার রক্ত ঠাণ্ডা হইয়াছে। বয়সের সঙ্গে বুদ্ধি জন্মিয়াছে।

সেই লোকটাই হঠাৎ লাঠি হাতে তাঁহার চাপরাসীদের বিরুদ্ধে নিদারুণ ঔদ্ধত্যের সঙ্গে রুখিয়া দাঁড়াইয়াছে। অনন্তের কথা তিনি ধরেন না। চাপরাসীগুলিকে তিনি জানেন। তাহারা সহজে ফিরিয়া আসে না। অন্ধকারের মধ্যে পোষা জানোয়ারেরা যেমন বিপদ-আপদকে একটা স্বভাববোধের দ্বারা অনুমান করিতে পারে, ঐ সব ব্যাপারে তাহাদেরও একটা স্বভাববোধ আছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে অনুমান অভ্রান্ত পরিণতিতে পৌঁছায়। তাহারা বলিতেছে—খুন-খারাবি একটা হইয়া যাইবে।

এমন কি করিয়া হয়? গাড়ীতে তিনি এই কথাই ভাবিতেছিলেন। তিনি অবশ্য সমস্ত কিছুর জন্য প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিলেই হয়তো কাজ শেষ হইয়া যাইবে। না হইলে চাপরাসী তিনজন আসিয়াছে, তাহারা ভোজপুরের লোক—রীতিমত পালোয়ান। পানুর বিক্রম যতই হোক, তিনজনের যৌথ শক্তির কাছে, শহরের মাড়োয়ারীর গদির কাছে গ্রাম্য মহাজনের কারবারের মত নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। তিনি নিজে আনিয়াছেন চাবুক, ঘোড়ার চাবুক নয়, শখ করিয়া কেনা শঙ্কর মাছের লেজের চাবুক—লম্বা, লিক্‌লিকে। আস্ফালন মাত্রেই তীব্র শিষের মত শব্দ করিয়া বেদের বাঁপির খোঁচা-খাওয়া তেজালো সাপের মত ফোঁসাইয়া সাড়া দিয়া উঠে। চাবুকটা ছাড়াও আর একটা অস্ত্র তিনি আনিয়াছেন। পকেটে তাঁহার পিস্তল আছে। সিক্স-চেম্বার অটোমেটিক। পকেটে থাকিলে বুঝিবার পর্যন্ত উপায় নাই।

বাবু নামিয়াই ভুরু কুঁচকাইয়া দাঁড়াইয়া গেলেন। বৎসর কয়েকই তাহার এদিকে আসিবার কোন কারণ ঘটে নাই। তবে পরিচিত অঞ্চল, যৌবনে এ অঞ্চলে শিকার করিতে আসিতেন, কয়েক বৎসর আগেও একটা গ্রামের জমিদারী স্বত্ব কিনিবার জন্য এই পথে কয়েকবারই সেই

গ্রাম দেখিতে গিয়াছেন, এই পথেই ফিরিয়াছেন। বেশ মনে পড়িতেছে, রুক্ষ লাল মাটির প্রান্তরের মধ্যে একটা মজা দীঘি; দীঘিটার কোণে দুইটা রাস্তার সংযোগস্থলে একটা বটগাছ ছাড়া আর কিছু ছিল না। মনে পড়িল, বটগাছটার তলায় দূরের যাত্রী গাড়োয়ানরা এখানে গাড়ী রাখিয়া 'আঁট' দিত। এই বটগাছটা ছিল হরিয়াল পাখীর একটা আস্তানা। তাঁহার অল্প বয়সে যখন মজা দীঘিটায় অল্প-স্বল্প জল থাকিত তখন এখানে মরাল পাখী পাওয়া যাইত। বটগাছটাও আছে। কিন্তু গাছটা ছাড়া সে পুরাতন স্থানটার আর কিছুই নাই। রাস্তাটার দুই পাশে দুইটি সতেজ সবুজ ফলের চারার ভরা বাগান, ইহারই মধ্যে সেকালের রোদে-পোড়া রাস্তার উপর ছায়া ফেলিয়া স্নিগ্ধ আভাস আনিয়াছে। মজা দীঘিটাকে দেখিয়া চেনা যায় না; ঠিক মাঝখানে কালো জলে পরিপূর্ণ পরিষ্কার একটি ছোট পুকুর, চারিপাশে সযত্নকর্ষিত উর্বর মাটির ক্ষেত। বাগান দুইটির মধ্যে কলাগাছগুলি সমারোহের সৃষ্টি করিয়াছে। ফলভারে বড় বড় গাছগুলি হেলিয়া পড়িয়াছে। মধ্যে মধ্যে তরীর লতা। আশ্চর্য হইয়া গেলেন তরমুজের গাছ দেখিয়া। তাঁহার চোখে যেন স্নিগ্ধ সবুজ কাজলের স্পর্শ লাগিয়া গেল।

এককালে বাবুর থিয়েটারের ঝোঁক ছিল। একটা নাটকের গল্পের কথা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। বইখানার নাম বা গ্রন্থকারের নাম মনে নাই। সে এক বাদশার গল্প। বাদশা বন্দিনী করিয়া আনিয়াছিলেন পরমাসুন্দরী এক কুমারীকে। সম্ভবত কোন শাহজাদী। বন্দিনী শাহজাদীকে বাদশা বিবাহ করিতে চাহিলেন। মনে আছে, বাদশা তাঁহার মণিময় তাজ কুমারীর চরণতলে লুটাইয়া দিলেন, কোষাগারের সমস্ত মণিমুক্তা ঢালিয়া দিলেন। বলিলেন—তোমার মুখের এক টুকরা হাসির জন্য দুনিয়া জ্বালিয়ে দিয়ে রোশনাই দেখাতে পারি, এই রাজ্য সম্পদ ফেলে ফকির হতে পারি। তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও, হাসো। কুমারী জলভরা চোখ তুলিয়া বাদশার দিকে চাহিয়া বলিলেন—হাসি আমার আসছে না শাহানশা। আপনার এই বাগিচার গায়েই চেয়ে দেখুন ওই পাহাড়ের দিকে, কালচেনীল মরা পাহাড় ধূধূ করছে—ধূধূ করছে; ওরই ছায়া পড়েছে আমার বুকে, আমার চোখে, আমার ঠোঁটে, আমার মনে। ওই পাহাড়কে সবুজ করে তুলতে পারেন শাহানশা? বানাতে পারেন ওখানে বাগিচা, বইয়ে দিতে পারেন ছোট্ট ঝরণা?

বাদশার ঘোষণায় কোন দেশান্তর থেকে আসিল এক পাগল শিল্পী। তার নাম ফরহাদ। কুমারীটির নাম শিরি। হাঁ, শিরি-ফরহাদের কাহিনী। প্লে-টার নাম শিরি-ফরহাদ। নাট্যাভিনয়কে বাবুরা বলেন প্লে।

ফরহাদ আসিয়া সেই মৃত্যুরহস্যভরা কৃষ্ণাভনীল মরুপাহাড়ের দিকে চাহিয়া দেখিল। কৃষ্ণনীলাভার মধ্যে শুভ্রবর্ণের ওগুলি কি দেখা যায়? কঙ্কাল। জীব-জন্তু-পাখী-মানুষের কঙ্কাল। মৃত্যু ওখানে তৃষ্ণার বিষজিহ্বা বাহির করিয়া বসিয়া আছে। যে যায় সে তৃষ্ণায় বুক ফাটাইয়া ঢলিয়া পড়ে। ওইখানে বহাইতে হইবে শীতল স্নিগ্ধ কালো জলের ঝরণা। নীলাভ পাহাড় কাটিয়া মৃত্যুর বুক চিরিয়া জীবন আবিষ্কার করিতে হইবে। পাথর কাটিয়া সেখানে মাটি বাহির করিয়া রচনা করিতে হইবে সবুজ তৃণক্ষেত্র, রোপণ করিতে হইবে আঙুরের লতা, ডালিমের ঝাঁক, আপেল-নাসপাতির গাছ।

ফরহাদ কুমারী শিরির বিষণ্ণ জলভরা আয়ত চোখের দিকে চাহিল, তাহার অপার মমতা-বিধুর মুখের দিকে চাহিল। ভুলিয়া গেল পৃথিবী, ভুলিয়া গেল মানুষের সীমাবদ্ধ ক্ষমতার কথা। তাহার বুকে এক বিপুল প্রেরণা অনুভব করিল। ফরহাদ মৃত্যুরহস্যভরা মরা পাহাড় কাটিয়া রচনা করিল তেমনি উদ্যান। নন্দন-কানন রচনা করিয়া ফরহাদ মরিল। শিরিও মরিল

ফরহাদের বুকের উপর পড়িয়া। চমৎকার প্লে-টা। বাবুর মনে ঘোর ধরিয়া গিয়াছিল। বাহিরের স্নিগ্ধ শ্যামশ্রী এবং স্মৃতির ওই গল্প দুইয়ে চমৎকার মিশিয়া গিয়াছিল, তাঁহার সন্ধ্যা-কালের পরম উপাদেয় হুইস্কি এবং সোডার মত।

এইবার তিনি পানুর দিকে চাহিলেন। পানুকে না-দেখা নন, দেখিয়াছেন; কিন্তু ওই রোমান্সের ঝোঁকে পানুর মধ্যে ফরহাদের মত শিল্পীকে আবিষ্কার করিতে চাহিলেন। কালো রঙ, কুশ্রী মুখ, বিশাল দুইটা কাঁধ, প্রশস্ত মাংসল বুক, হাত দুইটা যেন সতেজ লাল সেগুন-শিরীষের নধর শাখার মত। বাবু তাহাকে খুঁটিয়া খুঁটিয়া দেখিলেন। দেখিতে দেখিতে চোখের এবং মনের রঙের ঘোর কাটিতেছিল।

পানু ঠিক একভাবে দাঁড়াইয়া ছিল। ডান হাতে চালের বাঁখারি ধরিয়া আঙুল দিয়া হেঁসোর বাঁটখানা খুঁজিতেছিল। প্রয়োজন হইলেই—

বাবু আগাইয়া আসিয়া সামনে দাঁড়াইলেন। চাবুকটা বাঁ হাতে লইয়া ডান হাতের আঙুল দিয়া পানুর বুকের পেশীতে খুঁচিতে আরম্ভ করিলেন।

পানু হেঁসোর বাঁটখানা একবার চাপিয়া ধরিল। তারপর বিস্মিত হইয়া আবার ছাড়িয়া দিল।

বাবু হঠাৎ তাহার ডান হাতখানাই চাপিয়া ধরিলেন। পানু চমকিয়া ঝটকা মারিয়া হাতখানা ছাড়াইয়া লইল এবং চালের দিকে হাত তুলিল। বাবু হাসিলেন, বলিলেন—হ্যাঁ, তোর গায়ে জোর আছে। শরীরও পাথরের মত। এসব তুই নিজে করেছিস? নিজে হাতে?

পানু বিস্মিত হইল। বাছুরটা ছাড়িয়া, তাহার সঙ্গে বুঝাপড়া ছাড়িয়া বাবু তাহার ক্ষেত-খামার বাগান, তাহার দেহখানাকে যেন চোখ দিয়া চুষিয়া খাইতে চায়। সে সবিস্ময়েই উত্তর দিল—হ্যাঁ। নিজের হাতে করলাম। মজুরও লাগালাম কিছু কিছু।

—হ্যাঁ। কিন্তু কিসের জন্য এত সব করলি?

—কেনে? সবাই যার জন্য করে। নিজের জন্যে। পেটের জন্যে।

বাবু আবার হাসিয়া ফেলিলেন। বুদ্ধিহীনের বিপুল শক্তির মূল্য এইটুকুই বটে। এক কুঁচি হীরার দামের কাছে টন টন কয়লার দাম চিরকালই তুচ্ছ হইয়া যায়। তাও যদি কয়লাটা ভাল হইত। ওরে হতভাগা, এই প্রান্তরে এই পরিশ্রম না করিয়া উর্বর কোন স্থান লইয়া পরিশ্রমটা করিলে ইহার অপেক্ষা কত ভাল হইত বল দেখি। কিন্তু সে কথা এই বর্বরটাকে বলিয়া লাভ নাই। কর্তব্যটা করিতে হইবে। বর্বর শক্তিকে শাসনে রাখিতে না পারিলে সর্বনাশ হয়। বুনো হাতী আর পোষা হাতী প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত।

বাবু এবার বলিলেন—হুঁ। পেট তোর অনেকটা বড় দেখছি। তা বেশ। কিন্তু—। শঙ্কর মাছের চাবুকটা আবার ডান হাতে লইয়া বলিলেন—আমার চাপরাসীদের কি বলেছিস ও-বেলা?

পানু হেঁসোর বাঁটখানা চাপিয়া ধরিল চালের খড়ের মধ্যে।

—তোকে আমি চাবকে সোজা করে দিতাম। কিন্তু—

সঙ্গে সঙ্গে পানু চালের খড়ের মধ্য হইতে সড়াক করিয়া হেঁসোখানা বাহির করিয়া বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইল। পানু দাওয়াটা চারিদিক লোহার শিক দিয়া ঘেরিয়াছে, শুধু একটা দুয়ার। সুতরাং দুয়ারে হেঁসো লইয়া দাঁড়াইলে, পানু বলে—যমের বাবার সাধ্যি নাই যে ঢোকে। মূর্খ পানু, সে একালের যমকে ঠিক চেনে না, এবং ব্যাকরণ-জ্ঞানও নাই, তাই 'কিন্তু'র পর বাবুর কথাগুলা সে ব্যাকরণ অনুসারে মারিবার অভিপ্রায়ের বিপরীত অর্থ ব্যক্ত করিল তাহা সে

বুঝিতে পারিল না। হেঁসো বাহির করিয়া দাঁড়াইল।

বাবু পকেট হইতে পিস্তলটা বাহির করিয়া তুলিয়া ধরিলেন। বলিলেন—হেঁসো ফেল। তিন গুনতে গুনতে ফেলবি। নইলে বুকে গুলি করব তোর। এক—

পানু চমকিয়া উঠিল, বিবর্ণ হইয়া গেল সে। মনে ছিল না তার। একালের যমের পরিচয় সঠিক মনে থাকে না তাহার। নহিলে বন্দুক-পিস্তল না-দেখা নয় সে। বাবুদের পাখী মারা দেখিয়াছে বুলেটে—পাগলা কুকুর মারা দেখিয়াছে। দারোগার কোমরে পিস্তল দেখিয়াছে। শুনিয়াছে পিস্তলের গুলি বুকে ঢুকিলে পিট ফুঁড়িয়া বাহির হইয়া যায়।

কিন্তু হেঁসো ফেলিতেও তাহার অন্তরাত্মা তীব্র আর্তনাদ করিয়া উঠিতেছে। ক্রুদ্ধ যন্ত্রণা-কাতর পশুর আর্তনাদের মত সে আর্তনাদ। সে যদি শিকে ঘেরা এই দাওয়ার খাঁচার মধ্যে না ঢুকিত, তবে সে হয়তো ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারিত। কিন্তু সে নিজেই বন্ধ করিয়াছে। শিকের ফাঁক দিয়া পিস্তলের গুলি মুহূর্তে তাহার বুকে আসিয়া বিঁধিবে। লড়াই করিয়া মরিতে সে ভয় পায় না, কিন্তু অসহায়ের মত মরিতে তাহার সাধ নাই—অসহায় অবস্থার মধ্যে মৃত্যুভয় আসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিতেছে পাহাড়িয়া চিতির মত।

বাবু বলিলেন—দুই—

পানু এবার বর্বর চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। হেঁসোখানা ফেলিয়া দিল।

বাবু পিস্তল হাতে অগ্রসর হইলেন। চাপরাসীদের বলিলেন—পাকড়ো হারামজাদকো।

পালোয়ান দুইজন ভিতরে ঢুকিয়া পানুকে ধরিল। টানিয়া বাহিরে আনিয়া ঘাড়ে রদ্দা এবং ধাক্কা মারিয়া মাটির উপর ফেলিয়া দিল। পানুর কপালটা কাটিয়া গেল। কপালের রক্ত ফিনকি দিয়া পাথুরে সড়কটার বুকে পড়িল, পানু নির্নিমেষ দৃষ্টিতে সেই রক্তসিক্ত মাটির দিকে চাহিয়া রহিল। হঠাৎ তাহার পিঠের উপর একটা আগুনের দড়ি কে যেন চকিতে টানিয়া দিল। তাহাতে তাহার সবল দেহখানা জৈবিক রীতি অনুযায়ী চমকিয়া উঠিল। মুখ তুলিয়া সে চাহিয়া দেখিল না, কি ঘটিল! লাল রক্ত লালচে কাঁকর মাটির সঙ্গে মিশিতেছে, রক্তবিন্দুগুলি পড়িবা মাত্র বিন্দুর পরিধির পাশে ধূলা ফুটিয়া উঠিতেছে—চারিপাশ হইতে ঢাকিয়া দিতে চাহিতেছে; মাটিও তাহার রক্ত পিষিতেছে, শুষিতেছে!

হঠাৎ কাহার কণ্ঠস্বর তাহাকে চকিতচঞ্চল করিয়া তুলিল?

নারীকণ্ঠের অতি উচ্চ, সে যেন হৃদপিণ্ড ফাটানো চীৎকার! সে চীৎকারে প্রান্তরটা যেন চমকিয়া উঠিল।

পানু মুখ না তুলিয়াও বুঝিল, সে কে?

রাজিয়া চীৎকার করিয়া আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে। দুই হাত প্রসারিত করিয়া দিয়া পানুকে আগলাইয়া দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। অমানুষিক চীৎকারে সে বলিয়া উঠিল—না।

বাবু চমকিয়া উঠিলেন, চাপরাসীরা চমকিয়া উঠিল, ঘোড়া দুইটাও চমকিয়া উঠিয়া সশব্দে লাগাম টানিয়া ঘাড় দোলাইয়া ডাকিয়া উঠিল।

বাবু তখন দ্বিতীয় আঘাতের জন্য চাবুকটা তুলিয়াছিলেন। হিসাব করিয়া তিনি পানুর প্রাপ্য মিটাইতেছিলেন। প্রথম চাবুকটা বাছুরটা দিতে অস্বীকার করার জন্য। দ্বিতীয়টা তুলিয়াছিলেন অনন্তকে গালিগালাজের জন্য, আরও দুই ঘা দিবার স্থির করিয়াছেন—লাঠি ধরিয়া রুখিয়া দাঁড়ানোর জন্য, তাহার পর তিনি চাবুক কষিবেন হেঁসো তোলার জন্য। অবশেষে পালোয়ান দুই জন তাহার দুই কানে ধরিয়া এই গ্রামখানা ঘুরাইয়া আনিবে। এমন অতর্কিত

সংঘটনের জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। মেয়েটা এমন চীৎকার করিয়া, এমনি পাগলের মত ছুটিয়া আসিয়া সামনে দাঁড়াইল যে তিনি চমকিয়া উঠিলেন। চমকিয়া উঠিলেন বলিয়াই বোধ হয় নিজেকে সম্বরণও করিতে পারিলেন না। তাহার দ্বিতীয় চাবুক সাপের ফোঁসানির মত একটা শব্দ করিয়া রাজির মুখের উপর আসিয়া পড়িল। চিবুক হইতে কপাল পর্যন্ত একটা গাঢ় লাল রক্তাক্ত রেখা ফুটিয়া উঠিল এক মুহূর্তে।

রাজু আবার চিৎকার করিয়া উঠিল—না।

বাবুর হাত হইতে চাবুকটা খসিয়া পড়িয়া গেল।

চাপরাসীরা আপনাদের অজ্ঞাতসারে প্রায় এক সঙ্গে একটি সকাতর আক্ষেপ করিয়া উঠিল—আঃ।

ওদিকে মুহূর্তে উঠিয়া দাঁড়াইল পানু—সরে যা রাজিয়া। সে ফেলিয়া-দেওয়া হেঁসোখানা কুড়াইয়া লইয়াছে। জীবন-মরণ শেষ যুদ্ধ করিয়া দেখিবে। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড একটা চীৎকারও করিয়া উঠিল। কিন্তু রাজিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া তাহার হেঁসোখানা হাতে চাপিয়া ধরিল, তেমনি একটা প্রাণ-কাটানো চীৎকার করিয়া উঠিল—না। বর্বর উন্মত্ত পানু কিন্তু তাহার 'না' মানিল না, সজোরে সে হেঁসোখানা টানিয়া লইল। অস্ত্রখানা পিছলাইয়া বাহিরে আসিল। সঙ্গে সঙ্গে রাজুর হাতখানা রক্তাক্ত হইয়া গেল; অস্ত্রখানার ধারে তাহার হাতের তেলো এপাশ হইতে ওপাশ পর্যন্ত কাটিয়া গিয়াছে।

পানু হতভম্ব হইয়া গেল। সেই মুহূর্তে ছুটিয়া আসিল কয়েকজন লোক। তাহারা সব গ্রামের লোক। তাহাদের আগে একজন সন্ন্যাসী।

সন্ন্যাসী কিছুক্ষণ স্তম্ভিতের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া সর্বপ্রথম চাবুকগাছা তুলিয়া বাবুর হাতে দিয়া বলিলেন—বাড়ি যান বাবা।

বাবু চাবুক হাতে লইয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—গোসাঁই, তুমি সরে যাও এখান থেকে। বাবু তখন আবার সামলাইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার প্রতি মুহূর্তে মনে হইতেছে, তিনি যেন তুচ্ছ হইয়া গিয়াছেন ওই মেয়েটার কাছে।

—তা কি পারি? আমি জোড় হাত করছি।

—তুমি এখানে এলে কেন?

—মেয়েটি কেঁদে গিয়ে পড়ল। না এসে কি পারি?

—তুমি সরে যাও।

—না। আপনি বাড়ি যান। এত রাগ করতে নাই।

—গোসাঁই! বাবু চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

সন্ন্যাসী এবার বিচিত্র দৃষ্টিতে বাবুর দিকে চাহিলেন। গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন—বাড়ি যান, আপনাকে আমি অনুরোধ করছি, আপনি বাড়ি যান।

পালোয়ান তিনজন মিনতি করিয়া বলিয়া উঠিল—হুজুর! অর্থাৎ যাহা ঘটিয়া গেল, তাহার পর তাহারাও চাহিতেছে—আর না, বাড়ি চলুন। বাবু থতমত খাইয়া গেলেন।

সন্ন্যাসী বলিলেন—রাগ যদি না মিটে থাকে, আমাকে মারুন, আমি ওকে মারতে দেব না।

পালোয়ানেরা বলিল—হুজুর!

বাবু নিঃশব্দে গিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। সন্ন্যাসী রাজুবালাকে ডাকিলেন—মা!

রাজুর কপালে রক্তরেখার মত চাবুকের দাগটা ক্রমশ ফুটিয়া উঠিতেছে। হাত দিয়া অনর্গল

রক্ত ঝরিতেছে। রাজু একদৃষ্টে চাহিয়া দেখিতেছে সেই রক্তক্ষরণ। পানু স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

তেইশ

প্রৌঢ় সন্ন্যাসীটি এ অঞ্চলের পরিচিত মানুষ। যে রুক্ষ মরুভূমির মত লাল কাঁকরের উঁচু টিলার মত প্রান্তরটায় প্রাণকৃষ্ণ মরুদ্যান রচনা করিয়াছেন, সেই প্রান্তরটার দক্ষিণ ঢালু হইয়া যে সমতলে মিশিয়াছে, সেই সমতলের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে বক্রেশ্বর নদী। নদী পার হইয়া ওপারে আরও ক্রোশখানেক দক্ষিণে একটি বনজঙ্গলে ঘেরা প্রাচীনকালের কালী-মন্দির আছে। সন্ন্যাসী সেইখানে থাকেন।

বনজঙ্গলে ঘেরা মনুষ্যবসতিহীন আশ্রমটি। দিনের বেলাতেও অন্ধকার। বহুকাল হইতে ওই স্থানটি শ্মশানেশ্বরী আশ্রম নামে এ অঞ্চলে বিখ্যাত। জঙ্গলের মধ্যে আঁকাবাঁকা গ্রাম্য নালা চলিয়া গিয়াছে,—সেগুলি এই নদীটিরই শাখা। কালোজাম ও বন-শিরীষের ঘন জঙ্গলের নীচে প্রচুর কেয়ার ঝাড় ও নানা রকমের লতা ও গুল্ম। লোকে বলে—প্রাচীনকালে এখানে কোতলঘোষের বিখ্যাত তান্ত্রিকেরা শবসাধনা করিতেন। কতজন এখানে সিদ্ধিলাভও করিয়াছেন। ক্রমে দেশ নাকি ধর্মহীন হইল, ম্লেচ্ছাচারের প্রভাবে তান্ত্রিক বংশের মতিগতি অন্য দিকে ফিরিল, শ্মশানেশ্বরী আশ্রম পরিত্যক্ত হইয়া পড়িয়া রহিল। পাপী পুণ্যহীনের এখানে প্রবেশ নিষেধ ছিল, মানুষেরা আশ্রমের বাহিরে সড়কের উপর ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইত। শ্মশানেশ্বরী আপন মনে খেলা করিতেন, শেয়াল শকুন সাপ তাঁহার চারিপাশে ঘুরিয়া বেড়াইত; নানা ধরনের পাখী কলরব করিত; ফুল ফুটিত, ফল ধরিত, বীজ ফাটিত, নূতন চারাগাছ পাতা মেলিত, রাত্রে নাকি মহাকালীর সঙ্গে নাচিত ভূত-প্রেত-প্রেতিনীর দল। একবার এক ডাকাতের দল অন্ধকারে ভুল করিয়া এই আশ্রমে ঢুকিয়াছিল। কাছেই একটি গ্রামে তাহাদের ডাকাতি করার কথা, স্থির ছিল রাত্রির প্রথম প্রহরে শেয়াল ডাকিলেই তাহারা আসিয়া গ্রামপ্রান্তরে একটা পুরানো বাগানে ঢুকিয়া আত্মগোপন করিয়া অপেক্ষা করিবে। দ্বিতীয় প্রহরে শিবারবের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা বাহির হইয়া গ্রামে গিয়া পড়িবে। প্রথম প্রহরের শিবারব শুনিয়া ব্যস্ততার মধ্যে ভুল করিয়া এই আশ্রমে ঢুকিয়া পড়িল তাহারা। বাস, সেই যে ঢুকিল, আর সমস্ত রাত্রির মধ্যে বাহির হইতে পারিল না। সকালবেলা, গ্রামের লোক আশ্রমের বাহির হইতে দেখিল, একদল লোক মাটির পুতুল-মানুষের মত বসিয়া আছে, হাঁকডাকে নড়ে না। শেষে পুলিস আসিয়া তাহাদের ধরিয়া লইয়া যায়; তাহারা বলিয়াছিল, ওখানে ঢুকিয়া কি যে হইয়াছিল তাহাদের কিছু মনে নাই; চোখের দৃষ্টিশক্তি ছিল না, কানে কোন শব্দ শুনিতে পায় নাই, বসিবার পর আর নড়িতে-চড়িতে পারে নাই, দেহ যেন পাথর হইয়া গিয়াছিল।

কতকাল পর ওখানে আসিলেন এক সন্ন্যাসী। তিনি ইনি নন। তাঁহার একটা পা ছিল না, হাঁটু হইতে নীচের অংশটা কাটিয়া ফেলিতে হইয়াছিল। সন্ন্যাসী আগে ছিলেন পল্টনে, গুলিতে পা জখম হওয়ায় পা কাটিয়া ঠেঙোর উপর ভর করিয়া গেরুয়া পরিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন। পথে এই স্থানটি দেখিয়া 'জয় কালী করালী' বলিয়া এখানে ঢুকিয়া বসিয়া পড়িলেন। সাধনার পুণ্য ছিল—মা প্রসন্ন হইলেন, সন্ন্যাসী মায়ের সেবা লইয়া এইখানে

থাকিয়া গেলেন। চালাঘর তুলিয়া মাটিতে গড়িয়া মায়ের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন, বনজঙ্গল অনেক পরিমাণে সাফ করিলেন, সাধারণ মানুষের মায়ের দরবারে প্রবেশ করিবার অনুমতি তিনিই আদায় করিলেন মায়ের কাছে। পা-কাটা সন্ন্যাসীকে লোকে বলিত 'ঠেঙো-গোসাঁই'। ঠেঙো-গোসাঁই দেহ রাখিলে আর একজন সন্ন্যাসী এখানে বসিবার চেষ্টা করিয়াছিল—সে ছিল ভৈরব, সঙ্গে ছিল ভৈরবী, কিন্তু আসলে ছিল ভণ্ড; তাই মাসখানেকের মধ্যেই মা তাহাকে ঘাড় ধরিয়া বাহির করিয়া দিলেন। মাসখানেক পরেই তাহারা ভয়ে পলাইয়া গেল। তাহার পর আশ্রম আবার বৎসর দুয়েক পূর্বের মত পড়িয়া ছিল। বৎসর দুয়েক পর আসিয়াছেন এই সন্ন্যাসী।

লোকে বলে নমোনারায়ণ-বাবা। তাঁহাকে প্রণাম করিলেই তিনি বলেন—নমো নারায়ণায়।

নমোনারায়ণ-বাবা একটু আলাদা ধরনের গোসাঁই—অর্থাৎ সন্ন্যাসী। এখানকার তত্ত্বজ্ঞ যাঁহারা, তাঁহারা প্রথম প্রথম সন্দেহের চক্ষে দেখিয়াছিলেন। এখন বলেন—গোসাঁই আসল বৈষ্ণব, এখানে এক বিচিত্র সাধনার জন্য আসিয়াছেন।

গোসাঁইয়ের আরও কতকগুলো বাতিক আছে। এ অঞ্চলের লোকজন লইয়া কারবার করেন বেশী। শ্মশানেশ্বরীতলায় হরিনাম সংকীর্তনের চব্বিশ প্রহর উৎসব, অন্ন মহোৎসব, কালীকীর্তন, দশমহাবিদ্যার মূর্তি গড়িয়া পূজার্চনা একটা-না-একটা লইয়া লাগিয়াই আছেন। প্রতি বৈশাখে পঞ্চতপাও করিয়া থাকেন। চারিদিকে পাঁচটি হোমকুণ্ড জ্বালিয়া নিজে মধ্যস্থলে বসিয়া পাঁচটি হোমযজ্ঞ করেন, চৈত্র-সংক্রান্তি হইতে বৈশাখ-সংক্রান্তি পর্যন্ত। আরও বাতিক আছে—এ অঞ্চলে পুরানো দেবস্থানের যেগুলি জীর্ণ হইয়াছে, ভিক্ষা করিয়া সেগুলিকে মেরামত করাইয়া থাকেন। সম্প্রতি এক কাজে লাগিয়াছেন, পানুর বাড়ির দক্ষিণে এবং তাঁহার আশ্রমের উত্তরে যে নদীটা আছে ওই নদীর দুই পারে বন্যারোধের জন্য বাঁধ তৈয়ারী করিবেন। নদীটার মোহনা এখান হইতে ক্রোশ-দশেক দূরে, মুর্শিদাবাদ জেলার কাঁদি অঞ্চলে ময়ূরাক্ষীর সঙ্গে মিশিয়া গঙ্গায় গিয়া পড়িয়াছে। মোহনাটায় এখন এমন বালি জমিয়াছে যে, নদীর জল পূর্ণ-বেগে নিকাশ হইতে পারে না, ফলে উপরে বন্যার প্রকোপ বাড়িয়াছে। এ দিকে এ সব অঞ্চলে পূর্বকালে যে সব বন্যারোধী বাঁধ ছিল—তাহার অস্তিত্ব নাই, শুধু চিহ্ন আছে মাত্র। পর পর কয়েক বৎসরই বন্যায় এ অঞ্চলের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। সরকার হইতে কোন প্রতিবিধান হয় নাই। নমোনারায়ণ-গোসাঁই স্বপ্ন দেখিলেন—বন্যা আসিয়া আশ্রম ডুবাইয়া দিয়াছে, মা-কালী বন্যার জলে একটা ভেলা ভাসাইয়া তাহাতে চড়িবার উদ্যোগ করিতেছেন। পরের দিন হইতেই তিনি বাঁধের জন্য লাগিলেন। সেই বাঁধের কাজেই তিনি এ গ্রামে আসিয়াছিলেন।

ইহার আগে আগেও কয়েকবার আসিয়াছেন, গ্রামের লোকদের গ্রামদেবতা বুড়ী কালীর প্রাঙ্গণে ডাকিয়া আলোচনাও করিয়া গিয়াছেন। এ গ্রামের পশ্চিম-দক্ষিণ দিকটায় পানুর বসতের টিল।—ওদিকে বন্যা আসে না। কোন কালেও আসিবে না। নদীগর্ভ এবং সমতল ভূমি হইতে প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ ফুট, কি তাহারও বেশী উঁচু, কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব দিকটা বন্যায় ভাসে এবং সমতল পূর্ব মাঠটার মাঝখান দিয়া যে নালাটি গিয়া এখানেই নদীতে পড়িয়াছে—সেই নালা বহিয়া বন্যার জল মাঠে ঢুকিয়া গোটা মাঠটার ফসল পচাইয়া দেয়। পূর্ব মাঠে এ গ্রামের জমি কম, কিন্তু তাহাতে কি? নমোনারায়ণ বাবা ধরিয়াছেন—বন্যায় ক্ষতি হোক বা না হোক, নদী হইতে দেড় ক্রোশের মধ্যে যত গ্রাম পড়িবে, সকল গ্রামকেই এ বাঁধের কাজে হাত লাগাইতে হইবে। শুধু তাই নয়, দশ হাজার লোকের কোদাল ও ঝুড়ি চারদিন না পড়িলে বাঁধ

হইবে না। এ নাকি দেবতার প্রত্যাদেশ। যাহারা খাটিবে তাহারা মজুরী লইলে বাঁধ টিকিবে না, সে বাঁধ ভাঙিয়া যাইবে এবং ওই চারদিন নদীর কূলে রান্না করিয়া সমস্ত লোককে পাতা পাড়িয়া খাইতে হইবে। সে না হইলে নদী শুকাইবে অর্থাৎ অনাবৃষ্টি হইবে। সেই কারণে গ্রামে গ্রামে যেমন ফিরিতেছিলেন, এ গ্রামেও তেমনি ফিরিতেছেন। সক্ষম চাষী হইতে হাড়ী, বাউড়ী, ডোম সকলেই কোদাল ধরিবে, যে সব জাতির মেয়েরা মজুর খাটে তাহারা ঝুড়ি বহিবে, এবং সৎজাতিরা—ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতিরা চাল দিবেন, ক্ষেতের তরকারি দিবেন, সামর্থ্য যাঁহাদের আছে তাঁহারা নগদ টাকাও কিছু দিবেন—এই ব্যবস্থা হইয়াছে। এ গ্রামের মজলিসে পানুকেও ডাকা হইয়াছিল, কিন্তু পানু যায় নাই। সে বলিয়াছিল, বাণ তো আমার কি? হাম নেহি যায়েগা।

বলিয়া সে একটা ছড়া কাটিয়া দিয়াছিল—

কাদপুর ডুবু-ডুবু দোনাইপুর ভাসে,
(এ) গাঁয়ের লোকের বুক ঢিপ-ঢিপ পরাণকিষণ হাসে।

আমি তো বাবা, ডাঙায় দাঁড়িয়ে বাণ দেখি আর নাচি। আমি কেনে যাব? বলগা তোদের নমোনারায়ণ না ফমোফারানকে। সন্ন্যাসী! গোসাঁই!

বাণেই বা পানুর কি? আগুনেই বা কি? বাণে গাঁয়ের লোকের জমি ডোবে—পানুর ডাঙা জমি ডোবে না, গাঁয়ে লোকের খড়ের ঘরে আগুন লাগে—গ্রামের সঙ্গে সংস্রবহীন, গ্রামপ্রান্তে টিনের ঘর পানুর, পানুর ঘরে আগুন লাগে না। রাত্রে যখন লোকে জল জল করিয়া চেঁচায়, পানু তখন শুইয়া হাসে। সেই পানু যাইবে সন্ন্যাসীঠাকুর স্বপন দেখিয়াছে বলিয়া বাঁধে মাটি কাটিতে!—"আহো! সাধুবাবা! ঠাকুর মহারাজ! সন্ন্যাসী ঠাকুর! আ-হো!"

কথাগুলা বলিয়া পানু সেদিন খানিকটা নাচিয়া লইয়াছিল—আ-হো! নমোনারায়ণ বেটা—শঙ্কর গোসাঁই হইতে চায়, কলেশ্বরের সাধুবাবা হইতে চায়! আ-হো! ভণ্ড কোথাকার!

শঙ্কর গোসাঁই একজন গোসাঁই ছিল বটে। একশো বছরের উপর বাঁচিয়াছিলেন। ছাই মাখিয়া চিমটা হাতে একদিন আসিয়া উত্তর বীরভূমে ময়ূরাক্ষীর ধারে চিমটাটা পুঁতিয়া বসিলেন। ময়ূরাক্ষী সেখানে বিপুল বিস্তার। ময়ূরাক্ষী গঙ্গার চেয়ে অনেক ছোট নদী, কিন্তু এইখানটায় এপার হইতে ওপার পর্যন্ত গঙ্গার বিস্তৃতির প্রায় দ্বিগুণ বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। গর্তটা বালুতে পুরিয়া তটভূমির সমান হইয়া উঠিয়াছে। ময়ূরাক্ষী নূতন পথ করিয়া ছুটিবে, পুরানো খাতটায় কানা পড়িবে।

শঙ্কর বাবা সেইখানে চিমটা পুঁতিয়া বসিয়া গাঁয়ের লোককে বলিলেন—একঠো চালা বনা দেও! চালা বনিল। বাবা ধুনি জ্বালিলেন। দেশ ভাঙিয়া লোক আসিয়া পায়ে লুটাইয়া পড়িল। অপুত্রক পুত্র পাইল, অন্ধে চোখ ফিরিয়া পাইল, বধির শ্রবণ-শক্তি পাইল, অম্লশূলের রোগী—বাবার দরবারে তেলেভাজার সঙ্গে খিচুড়ী খাইয়া হজম করিয়া বাড়ী ফিরিল। কত লোকের হারানো সন্তান দেশে ফিরিল, কত কি হইল। বাবা ময়ূরাক্ষীকে বাঁধিয়াছিলেন। লোকে বলে—'বাঁধিয়াছিলেন,' আসল কথাটা তা নয়; জ্ঞানী-গুণীতে বলে—বাঁধ-বাঁধটা লোক দেখানো ব্যাপার, নিজের মহিমা ঢাকিবার জন্য। আসলে তিনি ময়ূরাক্ষীকে হুকুম করিয়াছিলেন—হট্ যাও। ময়ূরাক্ষী হটিয়াছিল।

কলেশ্বরের সাধুবাবা অনাদিলিঙ্গ মহাদেবের নবরত্নের পুরানো মন্দির ভাঙিয়া নূতন করিয়া

গড়িয়াছেন ; কলেশ্বরে ওই শঙ্করবাবার মত একদা আসিয়া তিনি চিমটা গাড়িয়া বসিলেন এক গাছতলায়। দেশে দেশে খবর রটিল। কত রাজা-মহারাজা, জমিদার, তালুকদার, গৃহস্থ, আমীর, ফকির সব আসিয়া জুটিয়া গেল কয়েক মাসের মধ্যে। টাকা আসিল রাশি রাশি—ইট পুড়িল, চুন পুড়িল, বিলাতী মাটি আসিল। মন্দির তৈয়ারী হইল।

এই দুইজন সাধুর গল্প পানু জানে। এই দুইজনকে সে মনে মানিতে রাজীও আছে। কিন্তু সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই। আসলে নাই ত্রেতাযুগ। এটা যে কলিকাল, কলিকালে সাধু আসিবে কোথা হইতে? ভণ্ডামী ফন্দি ছাড়া এ লোকটার আর কিছু নাই বলিয়াই পানুর দৃঢ় বিশ্বাস। বাবুর পর এ লোকটাকে দেখিয়া পানু একেবারে জ্বলিয়া উঠিল। সে রোষ গিয়া পড়িল রাজুর উপর। রাজুই তাহাকে ডাকিয়া আনিয়াছে।

সে হিংস্র দৃষ্টিতে রাজুর দিকে তাকাইল। রক্তাক্ত হেঁসোখানা তখনও তাহার হাতে।

রাজু তাহার দৃষ্টির অর্থ কিন্তু বুঝিয়াছিল। সে তাহার রক্তাক্ত হাতখানাই তুলিয়া বিচিত্র হাসি হাসিয়া ইঙ্গিতে নিষেধ করিল। রাজুর রক্তাক্ত হাত—তাহারই অস্ত্রে কাটিয়া যাওয়া হাতখানার নিষেধ অমান্য করিবার যেন সাধ্যই ছিল না।

তাহার সে হাতখানি দেখিয়া সন্ন্যাসী শিহরিয়া উঠিলেন, বলিলেন—এ কি মা? এ কি করে হল? ওঃ, এ যে বেশ কেটে গিয়েছে।

রাজু চোখ বুজিয়া—বোধ হয় যন্ত্রণার স্বাভাবিক অভিব্যক্তিকে সংযত করিবার জন্যই চোখ বুজিয়াছিল সে ; চোখ খুলিয়া ক্ষীণ হাসি মুখে টানিয়া বলিল—কেটে গেল বাবা। হঠাৎ—। সে নীচের ঠোঁটের উপর দাঁত দিয়া টিপিয়া ধরিল।

সমবেত লোকগুলি অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। চাবুকের দাগ আঁকা মুখ লইয়া পানুও কঠিন দৃষ্টিতে সকলের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ছিল।

সন্ন্যাসী পানুকে বলিলেন—জল আন বাবা, আর লম্বা ন্যাকড়ার ফালি। হাতখানা বাঁধা দরকার।

পানু বর্বরের মত গর্জন করিয়া উঠিল—না।

তারপর রাজুর হাত ধরিয়া একরূপ চাপিয়াই ঘরের ভিতর লইয়া গেল। যাইবার সময় রাজু বলিল—আপনি যান বাবা। ও আমার কিছু হয় নি।

পানু বলিল—না, হয় নাই। এখনও অনেক বাকী আছে তোর।

রাজু বলিল—সে পরে হবে। এখন এগুলোর বিহিত করতে হবে। সেজ, ও আবাগী, রেড়ির তেল আর চুনে খয়েরে মিশিয়ে আন ভাই। খানিকটা ন্যাকড়ার ফালিও আনবি। পানুকে বলিল—বস তুমি, হাতটা বেঁধে দেবে।

পানু বলিল—না না। আগে আমার কথার জবাব দে।

—কি?

—কেন তুই হেঁসো চেপে ধরলি?

অবাক হইয়া গেল রাজু। বলিল—কেন ধরলাম!

—হাঁ হাঁ, বাবুকে মারতে গেলাম, তু কেনে উকে আঁগলে দাঁড়াইলি?

—নইলে খুন হয়ে যেত যে!

—যেত যেত। তাতে তুর কি? উ তোর কে?

—আমার কে হবে?

—তবে? আমার চাবুকটা খেলি বুঝলাম। কিন্তু উ লোকটাকে হেঁসো দিয়ে মারতে

গেলাম, কেন ধরলি হেঁসো ?

রাজুর বোধ করি যন্ত্রণা বাড়িতেছিল—তাহার উপর পানুর এই বর্বর কুৎসিত প্রশ্ন অসহ্য হইয়া উঠিল। সে এবার বলিল—তার সাজা তো দিয়েছ। এই রক্ত তো দেখেছ—দেখেছ—এখনো দেখছ। আর কেন ?

পানু এ কথার জবাব দিতে পারিল না, কিন্তু তাহার চোখ দুইটা হিংস্র পশুর মত জলছিল।

রাজু বলিল—একটু লজ্জা হচ্ছে না তোমার ?

—না। পানু জবাব দিয়া উঠিল।—কেনে লজ্জা হবে ?

—কেনে লজ্জা হবে ?

—হ্যাঁ, কেনে লজ্জা হবে আমার ? তোর সোয়ামী তো হামি।

--তা বটে ! রাজু হাসিল।—আমার সোয়ামী যখন, তখন আমার রক্ত দেখে তোমার লজ্জা হবার কথা নয়—এ কথা শাস্তরে আছে।

—হ্যাঁ। তুকে চাবুক মারলে—

—আমাকে মারে নি, তোমাকে মেরেছিল আমি গিয়ে মাঝখানে পড়লাম, চাবুকটা এসে আমার মুখে লাগল।

—বেশ করলি। আমার বহু তুই, আমার চাবুক তু মুখ পেতে, বুক পেতে নিলি—ভাল করলি। কিন্তু ওকে আমি মারতে গেলাম হেঁসো দিয়ে, সে হেঁসো তু কেনে ধরলি ? কতটা রক্ত পড়ল তোর উকে বাঁচাতে গিয়ে ? আঁ ? আমাকে বাঁচাতে চাবুক খেলি, তাতে কতটুকু রক্ত পড়েছে ? আঁ ? বল ? বল ?

অবাক হইয়া গেল রাজু।

ঠিক সেই সময় আসিয়া দাঁড়াইল সেজবউ। রেড়ির তেল, ন্যাকড়া, চুন-খয়ের লইয়া আসিয়াছে সে। সেও আজ পানুর প্রহারের ভয় না করিয়াই বলিল—বলবে, আগে মানুষটাকে সুস্থ হতে দাও।

—হ্যাঁ! আচ্ছা। বাঁধ—বাঁধ। তারপর হামি দেখব। সে চলিয়া গেল।

রাজু ডাকিল—শোন, কপালে তেল লাগিয়ে যাও—

বানরের মত পানু চীৎকার করিল—না না।

বাহিরে আপনার বাগানের মধ্যে সে ঘুরিতেছিল আর মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিতেছিল—আ! আ! আ! একটা পাশব চীৎকার! পূর্বের সে চীৎকার নয়। ইহাতে আছে শুধু ক্রোধ উন্মত্ততা, পাশবিক উল্লাসও হয়তো আছে।

কিছুক্ষণ দুমদুম করিয়া বাগানময় ঘুড়িয়া সে বাড়ি ফিরিল। বাড়ি ঢুকিয়া সেজবউটাকে সামনে পাইয়া প্রশ্ন করিল—কোথা গেল ? সে হারামজাদী কোথা গেল ?

সেজবউটা বোকা, কিন্তু 'সে-হারামজাদী' কথাটা বুঝিতে তাহার কষ্ট হইল না; বাড়িতে মাত্র দুই হারামজাদী আছে,—একজন সে নিজে, অপর জন রাজু। সে-হারামজাদী বলিতেই বুঝিল, পানু রাজুকে খুঁজিতেছে। কিন্তু তাহার উপর এমন রাগটা কেন ? রাগ হওয়ার তো কথা নয়। সেজ কোন উত্তর দিবার পূর্বেই রাজু নিজেই ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল; ইহার মধ্যে সে নিজের হাতখানা বাঁধিয়া ফেলিয়াছে, মুখের চাবুকের দাগে তেল লাগাইয়াছে। যন্ত্রণা এখন বেশ হইতেছে। কিন্তু যন্ত্রণার চেয়ে সান্ত্বনা তাহার অনেক বেশী। আজ কি

কাণ্ডটাই না হইতেছে। ঘর হইতে বাহির হইয়া সে বলিল—নাও, কি বলছ বল ?

—কি ? পানু দাঁতে দাঁতে কিস-কিস করিয়া উঠিল।—কি বলছি ?

—হ্যাঁ। কি ?

—কেনে বাঁচাইলি তু বাবুকে ?

রাজুর চোখ জ্বলিয়া উঠিল, বলিল—তোমাকেও তো বাঁচিয়েছি—

—আমি তোর সোয়ামী, উ তোর কে ?

—ওকে আমি ভালবাসি, হল তো ?

—হাঁ। হল। আর ওকে কেনে ডাকলি তু ? ওই গেরুয়া ঠাকুরকে কেনে ডাকলি ?

রাজু অবাক হইয়া গেল। কি দোষ হইয়াছে তাহা বুঝিল না।

—বল ? কেনে ডাকলি ? সে আসিয়া একেবারে ঘাড়ে ধরিল।

রাজুর চোখের কোণে আবার একটা আগুনের শিখা ঝিলিক হানিয়া গেল।

পানু বলিল—আঁ। আবার তাকানি দেখ। ঘাড়টা সে টিপিয়া ধরিল।

রাজু বলিল—ছাড়। কণ্ঠস্বরেও তার প্রতিবাদ ফুটিয়া উঠিল।—ছাড় বলছি।

—কেনে ডাকলি তু !

—বেশ করেছি।

—না। বেশ করতে পাবি না। কেনে ডাকবি ওকে ?

—বাবুর নামে যে কথা বলেছি, তা ওঁর নামে জিভ থেকে বেরুবে না আমার। উনি আমার বাপ তাই তাকে ডেকেছি।

পানু অবাক হইয়া গেল, সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল—তোর বাপ ?

—হাঁ, আমার বাপ। তবে আমি ওঁকে ডাকি নাই।

—ডাকিস নাই ? তবে কেন এল ?

—সে কথা ওঁকে শুধিয়ো। আমি তাকে ডাকি নাই। কোন মুখে, কোন লজ্জায় তাঁকে ডাকব আমি ? তুমি তাকে গাল দাও, তিনি ডাকলে দুনিয়ার লোক যায়, তুমি যাও না, তাঁকে আমি ডাকব কি বলে ? কাউকেই ডাকবার পথ তুমি রাখ নাই, গাঁয়ের লোকের নামেও তুমি ঝাঁটা মার, তবু তাঁদের কাছেই ছুটে গেলাম। ঠাকুর তখন মজলিস করছিলেন। আমি গাঁয়ের লোকের সামনে গিয়ে বললাম—আপনারা কেউ আসুন, লোকটা বোধ হয় খুন হয়ে যাবে। বাবুর নাম শুনে কেউ নড়ল না, একটা কথা বলল না। আমি চলে আসছি, পিছন থেকে ঠাকুর বললেন—দাঁড়াও। উনি এগিয়ে এলেন, তখন লোকেরা পিছন ধরলে।

—হুঁ। হুঁ। চলে এল ! আপনি চলে এল !

—কিন্তু তোমার ক্ষতিটা কি হল ?

—জানি না। শালা গেরুয়া ঠাকুর, ভণ্ড বদমাস, সাধুবাবা—গুরুঠাকুর—জমিদার ! পানু বর্বর আক্রোশে জানোয়ারের মত দাঁত কটকট করিয়া উঠিল।

রাজু বলিল,—বস, কপালে এইটা লাগিয়ে দি।

—না। বলিয়া আবার সে হনহন করিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

সেজবউ বলিল—মতিচ্ছন্ন ! মরণ !

রাজু তিক্ত চিত্তে ঠোঁট টানিয়া আক্রোশভরে পানুর ঘর-দুয়ারের দিকে চাহিয়া রহিল। এ সংসারে তাহার কোন মমতা নাই। কিসের আকর্ষণ ? সেজবউ পড়িয়া আছে, ছেলের মা, উহার না থাকিলে উপায় নাই।

ওই বর্বর লোকটা একদিন তাহাকে রোগজীর্ণ অবস্থায় আশ্রয় দিয়াছিল, বাঁচাইয়াছিল বলিয়া কৃতজ্ঞতায় আর কত সহ্য করিবে সে!

হঠাৎ পানুর বড় ছেলেটা আসিয়া চুপি চুপি বলিল—কি মা!

রাজু কান দিল না, সেজ কৌতূহলভরে প্রশ্ন করিল—কি? ছেলেটার কথা বলিবার ভঙ্গির মধ্যে যেন কৌতুককর—কৌতূহলজনক সংবাদের সন্ধান পাইয়াছে সে।

ছেলেটা বলিল—বাবা কাঁদছে।

—কাঁদছে? সেজ পা টিপিয়া বাহিরে গিয়া উঁকি মারিয়া দেখিয়া গালে হাত দিয়া ফিরিয়া আসিল।—দিদি! বাছুরটার গলা ধরে কাঁদছে। বাছুরটা পা চাটছে।

সন্ধ্যার সময় পানু বলিল—চলা যায়েগা হিঁয়াসে।

রাজু বা সেজ কেউই কোন কথা বলিল না। পানু আবার বলিল—সব বেচে দেব। থাকব না, এ হারামজাদার দেশেই থাকব না।

এ কথাতেও কেহ কোন কথা বলিল না। উত্তরের প্রতীক্ষাও পানু করিল না, লাঠি টানিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল। রাত্রি দুপ্রহর পর্যন্ত ফিরিল না। মধ্যরাত্রে ফিরিল, কিন্তু ঘরে ঢুকিল না। রাজু, সেজবউ—দুইজনে দেখিল, পানু সামনের ডাঙাটার উপর অন্ধকারের মধ্যে প্রেতের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। মধ্যে মধ্যে বর্বর চীৎকার করিতেছে। ক্রুদ্ধ উল্লসিত চীৎকার।

পরদিন সকালে উঠিয়াই সে বাড়ি হইতে বাহির হইয়া গেল। কোথায় গেল বলিয়া গেল না। বেলা তিন প্রহর পর্যন্ত ফিরিল না।

পানু ফিরিল প্রায় চারিটার সময়। স্নান করিয়া রাক্ষসের মত খাইয়া সে বিছানায় শুইয়া পড়িল। মুহূর্তে ঘুমাইয়া গেল, নাক ডাকিতে সুরু করিল কয়েক মিনিটের মধ্যে। সে যেন কুম্ভকর্ণের নিদ্রা।

রাজু বুঝিল, পানু সম্পত্তির খরিদ্দার ঠিক করিয়া আসিয়াছে, অথবা বাস করিবার নূতন কোন স্থান আবিষ্কার করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া ফিরিয়াছে। সে একটু হাসিল। বিচিত্র মানুষ। গল্পে আছে, চোরের উপদ্রবে রাগ করিয়া এক গৃহস্থ থালা কাঁসা বিক্রয় করিয়া মাটিতে ভাত খাইত।

ওদিকে গ্রামে জয়ধ্বনি উঠিতেছে। জয় মা শ্মশানেশ্বরীর! জয় কালী! হরি হরি বল ভাই! হরি বল!

সম্ভবত বাঁধে খাটিবার কথা পাকা হইয়া গেল।

পানু অঘোরে নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে। সব্বনাশ অর্থাৎ ওই বাছুরটা মধ্যে মধ্যে ডাকিতেছে। পানুকে জাগাইতে চায় সে। বার কয়েক আসিয়া তাহার গা চাটিল, বার দুয়েক ফোঁস ফোঁস করিল, কিন্তু পানু পরম নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতেছে।

সেজবউ সন্ধ্যা জ্বালিয়া পানুর দিকে চাহিয়া বলিল—কাল ঘুম।

চব্বিশ

পরদিন সকালে উঠিয়া পানু গভীর প্রসন্নতার সহিত চা খাইতে বসিল।

সকালে সে এক জামবাটি চা খায়। হঠাৎ পিঠে চাবুকের কাটা ক্ষতে জ্বালা অনুভব করিয়া

সে চমকিয়া উঠিল। ক্রুদ্ধ হইয়া ঘাড় ফিরাইয়া সে দেখিল, বাছুরটা তাহার পিঠ চাটিতেছে। সে যেন ক্ষেপিয়া গেল। প্রচণ্ড একটা চড় উঠাইয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু কি মনে হইল, চড়টা সম্বরণ করিয়া আলাদাভাবে পায়ের ঠেলা দিয়া বাছুরটাকে বাহিরে ফেলিয়া দিল। বাঁখারি দিয়া ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা খোঁড়া পা-খানা তাহার এখনও অপটু, বাছুরটা ঠেলা খাইয়া মাটির উপর কাত হইয়া পড়িয়া গেল। ব্যা-ব্যা শব্দে চীৎকার করিতে শুরু করিল। পানু বিরক্ত হইয়া চায়ের বাটিটা লইয়া রাস্তার ওপাশে তাহার ছোট বাগানটার একটা গাছতলায় গিয়া বসিল।

রাজু ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। বাছুরটা এমনভাবে চীৎকার করে কেন? সে ছুটিয়া আসিয়া বাছুরটাকে তুলিয়া তামাসা করিয়াই বলিল—আহা, তোমার সব্বনাশী এলোকেশী যে মাটিতে পড়ে গিয়েছে। তুমি বসে আছ?

পানু বলিল—ওটাকে বেচে দোব।

—বেচে দেবে?

—হাঁ। কসাই ডেকে বেচব।

রাজুবালা শিহরিয়া উঠিল। সে স্থিরদৃষ্টিতে পানুর দিকে চাহিল। পানুর চোখে অমানুষিক নিষ্ঠুরতা খেলা করিতেছে। পানু রাজুর দৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—এ চীৎকার সেই পুরানো চীৎকার, এই কয়েক দিনের মধ্যে এ চীৎকার সে একবারও করে নাই।—গুণ-কোড়া ছুঁচ দিয়ে তোর ড্যাবড্যাবে চোখ দুটো আমি কানা করে দোব রাজু।

রাজু বলিল—তোমার সঙ্গে আমার ফারখত। আজই আমি তোমার বাড়ি থেকে চলে যাব। চোখে তাহার আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

পানু ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—আমার বল্লম দিয়ে তোকে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দোব আমি।

সে উঠিয়া দাঁড়াইল। হনহন করিয়া আসিয়া শুইবার ঘরে মাচায় উঠিয়া সে বল্লমটা টানিয়া লইল। হাত-পাঁচেক লম্বা পাকা বাঁশের লাঠির মাথায় ইঞ্চি দুয়েক মোটা ইঞ্চি আষ্টেক লম্বা লোহার সুচাল ফলা-গাঁথা বল্লম। দূর হইতে সাপ মারিবার জন্য এটা সে বরাদ্দ দিয়া তৈয়ারী করিয়াছে। কামার হাসিয়া বলিয়াছিল—চালাতে পারবে তো? তৈরী তো করালে!

পানু সঙ্গে সঙ্গে চালাইয়া দেখাইয়া দিয়াছিল। হাত দশেক দূরের একটি তালগাছে ছুঁড়িয়া মারিয়াছিল। শালের চেয়েও কঠিন পাকা তালের কাণ্ড। নির্ভুল লক্ষ্যভেদে ঠিক মাঝখানে বল্লমটা গিয়া বিঁধিয়াছিল। প্রায় তিন ইঞ্চির মত লোহার ফলাটা বসিয়া গিয়াছিল। হা-ঘরে জীবনের এই অস্ত্রচালনার অভ্যাসটা সে ভুলিয়া যায় নাই। যন্ত্রটা তৈয়ারী করাইয়া নূতন নূতন কয়েকদিন ব্যবহার করিয়া অভ্যাস ঝালাইয়াও লইয়াছিল। তাহার পর দীর্ঘদিন মাচার উপর তোলাই ছিল। তাহার হেঁসো অস্ত্রখানাই এই জীবনের পক্ষে যথেষ্ট। রাজুকে সাজা দিতেও ওই হেঁসোখানাই যথেষ্টর চেয়েও বেশী। সেখানা এমনি ধারালো যে, খেজুর গাছের শক্ত কাণ্ডেও কোপ মারিলে হেঁসোটার আড়াই ইঞ্চি পরিমাণ চওড়া ফলাটা গোটাটাই বসিয়া যায়। রাজুর গলাখানা খেজুর গাছের কাণ্ডের চেয়ে অনেক কোমল। তবু সে আজ ওই বল্লমটাই পাড়িয়া লইল, ধুলা ও ঝুল ঝাড়িয়া মরচে-ধরা ফলাটা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া একটা ঝামা ইটের টুকরা লইয়া ঘষিয়া উজ্জ্বল করিতে বসিল।

রাজু এবার হাসিল। বলিল—সেই ভাল। আমিও যাই, তুমিও চল। আমাকে বিঁধে মেরে তুমি ফাঁসীকাঠে ঝুলো। না হয় তোমাকে—

সে চুপ করিয়া গেল। পানু হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়াছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে পানুর দিকে চাহিল।

পানু চমকিয়া উঠিল। মনে পড়িল নাকু দত্তের ছিন্নকণ্ঠ, মনে পড়িল—

সে বল্লমটা হাতে লইয়া উঠিয়া গেল। নির্জনে তাহার বাগানের মধ্যে পুকুরঘাটে গিয়া সেটাকে ঘষিতে লাগিল।

রাজুবালা ঘরের দাওয়ায় স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার বড় বড় চোখ দুইটা মধ্যে মধ্যে ঝকমক করিয়া উঠিতেছিল। যেন ওখানে পানুর ঘষিয়া ঘষিয়া উজ্জ্বল করিয়া তোলা বল্লমটার ছটা এখানে তাহার চোখে পড়িয়া প্রতিচ্ছটা তুলিতেছিল। সেজবউ দুইজনের রকম-সকম দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছে। সে-ই ভয় পাইয়াছে বেশী।

সে সভয়ে রাজুকে ডাকিল—দিদি!

রাজু অকস্মাৎ নিজেকে একটা ঝাঁকি দিয়াই যেন উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—ওকে শেষ পর্যন্ত আমি বিষ দিয়ে মেরে দোব সেজ। বলিয়াই সে বাহির হইয়া গেল। এই কথাটাই সে তখন পানুকে বলিতে চাহিয়াছিল—না হয় তোমাকে বিষ দিয়ে মেরে আমিই যাব ফাঁসী। সেজ চমকিয়া উঠিল। রাজু কি বিষ আনিতে চলিল নাকি? সে তারস্বরে ডাকিয়া প্রশ্ন করিল—বলি, চললে কোথা?

—চুলোয়। বলিয়া সে হনহন করিয়া চলিয়া গেল। বাছুরটাকে সে লুকাইয়া রাখিতে গেল। না হইলে কখন বর্বর মানুষটা এই সদ্য-আবিষ্কৃত বল্লমটাই বিঁধিয়া ওটাকে মারিয়া ফেলিবে। সেজকেও সে কথা বলা ঠিক নয়। কখন সে বলিয়া ফেলিবে তাহার স্থিরতা নাই। সেজবউটা দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে আপন মনেই বলিল—কি বিপদে আমি পড়লাম! হে ভগবান! শাঁখের করাতে পড়লাম আমি—আসতে কাটছে, যেতে কাটছে! হে ভগবান! বলিতে বলিতে সে চুপ করিয়া গেল।

পানু ঘরে আসিতেছে। খিড়কির পথে তাহাকে দেখা যাইতেছে। তাহার বল্লমটা পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। ঝকমক করিতেছে বৈশাখের রৌদ্রচ্ছটায়। ঘরে ঢুকিয়া সে বলিল—তেল দেখি, সরষের নারকেলের কেরোসিনের, তিন রকমই চাই।

সরিষার তৈল সে বাঁশের ডাণ্ডাটায় মাখাইল, নারিকেল ও কেরোসিন মিশাইয়া মাখাইল ফলাটায়। তাহার পর একটা ন্যাকড়া দিয়া ফলাটাকে জড়াইয়া পরম যত্নে ঘরের কোণে রাখিয়া দিল।—তারপর বলিল—আর খানিকটা তেল দে চান করে আসি। ভাত বাড়। খিদে পেয়েছে।

ঠিক এই সময় রাজু ফিরিয়া ঘরে ঢুকিল, এবং আবার মেঝের উপর শুইয়া পড়িল।

—গুলি যে?

রাজু উত্তর দিল না। সেজবউ তেলের বাটি নামাইয়া দিল।

খাওয়া শেষ করিয়া পানু বলিল—ডাক সে হারামজাদীকে।

সেজ বলিল—তুমি ডাক, আমি পারব না। আমারে রা কাড়বে না।

পানু বলিল—কাড়বে কেনে? জীবজন্তু সবাই হতচ্ছেদা বোঝে যে। তারপর সে ডাক দিল—আয়—আয়—আয়।

সেজ আপন মনেই সবিস্ময়ে বলিল—অ—মা—গো।

পানু বাছুরটাকে ডাকিতেছে। রাজুকে নয়।

সংসারে আর এক হারামজাদী জুটিল—দুই হারামজাদীর সঙ্গে।

বাছুরটাকে রাজু এক প্রতিবেশীর বাড়ি রাখিয়া আসিয়াছে। সাড়া না পাইয়া পানু সবিস্ময়ে বলিল—গেল কোথা? এলোকেশী! এলোকেশী! আয়—আয়। আঃ—আঃ!

এঁটো হাতে, ভাত-ডাল মাখা থালাখানা লইয়া সে বাহির হইয়া গেল। বৈশাখের রৌদ্রে লাল কাকরের সব চেয়ে উঁচু টিলায় দাঁড়াইয়া সে চারিদিকে দৃষ্টি হানিয়া ডাকিতে লাগিল—আঃ—আঃ—আঃ! এলোকেশী! এলোকেশী। আঃ—

বড় ছেলেটা পানুর পিছনে পিছনে থাকে—বাঘের পিছনে ফেউয়ের মত। কিছু তফাত আছে, ফেউয়ের মত ডাকিয়া ব্যাঘ্রসদৃশ পানুকে বিরক্ত করে না; তাহার পরিবর্তে ছুটিয়া আসিয়া দুই মাকে সংবাদটা দিয়া যায়। ছেলেটা ছুটিয়া আসিয়া ডাকিল—মা!

সেজবউ বিরক্তিভরেই বলিল—কি?

তাহার ক্ষুধা পাইয়াছে। ছেলেগুলা আগেই খাইয়াছে, পানুও খাইয়া লইল। সুতরাং অন্যদিন অপেক্ষা সকাল সকাল হইলেও ক্ষুধা তাহার মাথা চাড়া দিয়া উঠিল। কিন্তু রাজু যে শুইয়াছে, সে আর নড়িতেছে না। ডাকিলেও সাড়া দেয় না। জীবনটা তাহার জ্বলিয়া গেল। ইহার উপর কাহারও ঢং আর সে সহ্য করিতে পারিবে না। ছেলেটাকে মুখনাড়া দিয়া সে বলিল—কি? এমন করে চেল্লাও কেনে?

ছেলেটা সবিস্তারে বাপের কথা বর্ণনা করিয়া বলিল—বাছুরটা কোথা গেল মা?

সেজবউ রাজুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—জানি না।

রাজু পাশ ফিরিয়া শুইয়া বলিল—তুই খা সেজ। আমি খাব না।

—খাবে না?

—না। তুই খেয়ে নে। এ পাপ অন্ন আমি আর খাব না।

—পাপ অন্ন খাবে না?

—না—না—না। সে হঠাৎ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। উঠিয়া বাহিরের দরজায় গিয়া দাঁড়াইল। চারিদিক চাহিয়া দেখিল। টিলা হইতে নামিয়া পানু ওই চলিয়াছে নদীর দিকে। নদীর ধারে সবুজ মাঠের মধ্যে গ্রামের লোকের গরু চরিতেছে। সম্ভবতঃ বাছুরটাকেই খুঁজিতে চলিয়াছে। সে গিয়া গোয়ালঘরে ঢুকিল। গোয়াল খালি। মংলী এবং তাহার দুই কন্যা সন্তানসন্ততি লইয়া মহিষের স্বভাবমত বৈশাখের দ্বিপ্রহরে পুকুরের জলে পড়িয়া আছে। এই গোয়ালের মধ্যেই তাহার গুপ্ত-সঞ্চয় লুকানো আছে। এক কোণে একটা ভাঁড় পুঁতিয়াছে, উপরে একটা ছিদ্র রহিয়াছে, অবসরমত সেই ছিদ্র দিয়া টাকা হইলে ফেলিয়া যায়। সঞ্চয়টা তুলিয়া এই অবসরে সে চলিয়া যাইবে। সে সংকল্প স্থির করিয়া ফেলিয়াছে। এই বর্বরটার কাছে আর সে থাকিবে না। আর সে সহ্য করিবে না। যাইবার জায়গার জন্য সে ভাবে না। আশ্রয়ের জন্য না, অবলম্বনের জন্যও না। নিজের মূল্য সে জানে; সংসারের এ দিকটা সে দুই দুই বার দেখিয়া অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছে। তাহার বয়স তিরিশ পার হইলেও বন্ধ্যাত্বের জন্য যৌবন এখনও পরিপূর্ণ। যৌবন এবং রূপকে সে কোনদিন অবহেলা করে নাই; তাহার পরিচর্যা করিয়াছে, মার্জনা করিয়াছে বলিয়া মালিন্য এখনও ছায়া ফেলিতে পারে নাই। সুতরাং চিন্তা করিবার তাহার কিছুই নাই। পানু ফিরিয়া অবশ্য তাহাকে না দেখিয়া বল্লম লইয়া একবার ছুটিবে। তাহার জন্যও সে ভয় করে না। সে গিয়া থানায় উঠিবে, আত্মরক্ষার জন্য সাহায্য চাহিবে। কিংবা তাঁহাদের কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করিবে। কিংবা সে উঠিবে গিয়া নমো-নারায়ণবাবার আশ্রমে, বলিবে ঠাকুর, কোথাও যাইবার পথ বলিয়া দিতে পার? সে তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। দীর্ঘদিন অন্ন বস্ত্র এবং চুরি-করিয়া-সঞ্চয়ের সুযোগের জন্য যেমন নিরাসক্ত

ভাবে পানুর সকল বর্বর আদর নির্যাতন সহ্য করিয়া ব্যবসায়িনীর মত পড়িয়া আছে, তেমন ভাবে পড়িয়া থাকাটা আজ তাহার পক্ষে একান্ত ভাবে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। এমন অন্ন বস্ত্র সঞ্চয় আবর্জনা-স্তূপে ফেলিয়া দিয়া আত্মহত্যা করিয়াও সুখ আছে, শান্তি আছে।

পানু ফিরিল অপরাহ্ণে। প্রায় সারা মুল্লুকটাই সে ঘুরিয়া আসিয়াছে। এই দ্বিপ্রহরে বাছুরটার সেদিনের বড় কালো চোখের অসহায় ভয়ার্ত কম্পিত দৃষ্টি—দীর্ঘ চক্ষুপল্লবের প্রান্তে শিশিরবিন্দুর মত টলটলে অশ্রুবিন্দু—যেন প্রান্তরের বুকের রৌদ্র-ঝিলিমিলির মধ্যে চোখের সামনে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। সকালবেলা বাছুরটাকে সে লাথি মারিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল। তাহার পর কোথায় গেল বাছুরটা, কোথায় কোন খানায় বা ডোবায় বা গড়ানে পাথুরে মাঠে গিয়া পড়িয়াছে, খোঁড়া পা লইয়া অসহায় ভাবে পড়িয়া আছে, উঠিতে পারিতেছে না, ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিতেছে, চীৎকারের ক্ষমতা নাই, শুধু চোখ দুইটা সেদিনের মত কাঁপিতেছে, চোখের রোঁয়ায় জলবিন্দু জমিয়াছে—সূর্যের ছটায় চিকচিক করিতেছে। হয়তো সন্ধ্যার আগেই মরিয়া যাইবে। না মরিলে রাত্রে জীবন্তেই শেয়ালে ছিঁড়িয়া খাইয়া ফেলিবে।

মানুষের চেয়ে জন্তু জানোয়ার—কুকুর বিড়াল গরু মহিষকে সে চিরদিন বেশী ভালবাসিয়াছে। গরু মহিষকে সব চেয়ে বেশী! কিন্তু এই বাছুরটার মত কোনটাকে ভালবাসে নাই। বাছুরটার কাছে তাহার দেনা যেন অনেক। তাহার পা-খানা সে নির্মম আঘাতে ভাঙিয়া দিল, বাছুরটা তাহার হাত চাটিল। পৃথিবীতে এমন প্রতিদান সে কখনও পায় নাই। হা-ঘরেদের দলে থাকিবার সময় সে কুকুর পুষিত। কুকুরগুলার মত অনুগত জীব আর হয় না! কিন্তু মারিলে সেগুলা এক বেলাও অন্তত দূরে দূরে থাকিত, হয় ভয়ে পলাইত অথবা গোঙাইত। দুনিয়াতে অনেক জনের কাছেই নির্মম প্রহার পাইয়াছে, সে তাহাদের কাহাকেও ক্ষমা করে নাই, অনেক জীবকে সে প্রহার করিয়াছে, হত্যা করিয়াছে—সেগুলার অধিকাংশই বন্য বা অপরের গৃহপালিত, তাহাদেরও কোনটা এমন ভাবে তাহার কাছে আত্মসমর্পণ করে নাই, তাহাকেই পরম আশ্রয় বলিয়া জড়াইয়া ধরে নাই। বাছুরটার আনুগত্য তাহার কাছে অভিনব,—এমন অনুভূতির আস্বাদন সে জীবনে কখনও পায় নাই। তাই গোটা মুল্লুকটাই প্রায় সে ঘুরিয়া আসিল। থালাটা হাতে লইয়াই গিয়াছিল। ভাতগুলা ফেলিয়া দিয়াছে, ভাত ডালের দাগ শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছে। থালাখানা নামাইয়া সে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া বলিল—পেলাম না।

সেজবউ চুপ করিয়া রহিল। উত্তর দিতে সাহস হইল না। বাছুর বাছুর করিয়া ফিরিতেছে, আর ঘরে যে কাণ্ড—

—রাজিয়া কই? রাজু!

সেজবউ আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না। বলিল—যা করতে হয় কর। আমি জানি না, আমি পারব না।

—কি?

—সারাটা দিন কাঠের মত শুকিয়ে পড়ে আছে মানুষ, কথাও নাই, বার্তাও নাই, ওই দেখ। একটা লোক না খেয়ে থাকলে আমি খাই কি করে? বলি, মানুষের চামড়া তো গায়ে আছে!

রাজু খায় নাই। কি যে তাহার হইয়াছে, সে নিজেও তাহা বুঝিতে পারে নাই, কিন্তু

সঞ্চয়ের ভাঁড়টি তুলিয়া আঁচলে ঢালিয়া বাঁধিয়াও সে যাইতে পারে নাই। সেগুলিকে আবার যথাস্থানে রাখিয়া ঘরে আসিয়া শুইয়াছে। জলবিন্দু মুখে না দিয়া পড়িয়া আছে।

পানুর সঙ্গে একবার লড়িয়া দেখিতে ইহা হইয়াছে। না হয় ওই বর্বরটার হাতেই মরিবে তবু উহার নিষ্ঠুরতার শেষ সে দেখিবে। সঙ্গে সঙ্গে তিক্ততা এবং ক্রোধের উন্মত্ততার মধ্যে যে জীবনের কথা তাহার মনে হইয়াছিল, সে জীবনের স্মৃতিও ভাল লাগে নাই। আশ্চর্য, চোখে জল আসিল সঙ্গে সঙ্গে। ঘরে আসিয়া শুইয়াও সে অনেকক্ষণ কাঁদিল। সেজ ডাকিলে সাড়া দিল না, নড়িল না।

পানু একটা চীৎকার দিয়া উঠিল, ক্রোধে ক্ষোভে বিরক্তিতে—আঃ—

তারপর ঘরে আসিয়া রাজুর সামনে দাঁড়াইল।—এই হারামজাদী!

রাজু উত্তর দিল না। নড়িল না।

—শুনেছিস? খাস নাই কেনে? এই হারামজাদী! এই রাজিয়া! রাজু নির্বাক নিস্পন্দ।

পানু তাহার চুলের মুঠি ধরিয়া টানিয়া উঠাইয়া বসাইয়া দিল। রাজু বসিয়া আপন দেহের কাপড় সংবৃত করিয়া লইয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

—খাস নাই কেনে? এ—ই? এই হারামজাদী! শূয়া-রের বা—চ্ছি!

রাজু বলিল—আমার ইচ্ছে।

—তোর ইচ্ছে? পানু খপ করিয়া তাহার সুডৌল বাহুমূলের খানিকটা অংশ দুই আঙুলে টিপিয়া ধরিয়া পাক দিতে শুরু করিল, এবং থামিয়া থামিয়া প্রশ্ন করিতে লাগিল—তোর ইচ্ছে? বল? তোর ইচ্ছে? তোর ইচ্ছে?

রাজু চোখ বন্ধ করিল, যন্ত্রণায় তাহার কপাল ভুরু নাক মুখ—সব আপনি কুঁচকাইয়া জড়ো হইয়া আসিতেছিল; কিন্তু তবু সে একটি শব্দ উচ্চারণ করিল না। পানু বিস্মিত হইয়া নিজেই ছাড়িয়া দিল; কয়েক মুহূর্ত সে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল—হেঁসো? হেঁসোটা কই? হেঁসোটা?

রাজু হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। গতকাল হেঁসোখানা কুড়াইয়া রাখিয়াছিল। সে নিজেই সেখানা বাহির করিয়া আনিয়া পানুর হাতে দিয়া বলিল—লাও। মার। মার। কোপাও।—তাহার হাতটার কাটা স্থানটা হইতে রক্ত টপটপ করিয়া ঝরিতেছে। ব্যাণ্ডেজ ভিজিয়া গিয়াছে। পানু এই হাতখানা ধরিয়াই টিপিয়াছিল। তবু রাজু চীৎকার করে নাই। সে যেন পাগল হইয়া গিয়াছে। তাহার ভয় নাই। চোখ তাহার জ্বলিতেছে, অথচ সেই জ্বলন্ত চোখ হইতে জল গড়াইয়া এক অদ্ভুত মূর্তি হইয়াছে তাহার। আগুন জল হইয়া গিয়াছে, জল আগুন হইয়া উঠিয়াছে।

পানু আজ সভয়ে পিছাইয়া গেল।

অকস্মাৎ বনে আগুন জ্বলিয়া উঠিলে রাত্রির অরণ্যচারী পশুর পূর্ণ বর্বর হিংসাও যেমনভাবে সঙ্কুচিত হইয়া পিছাইয়া পিছাইয়া গহ্বরে গর্তে গিয়া লুকায়, রাজুর চোখের দৃষ্টির সম্মুখে পানুর সকল সাহস, সকল ক্রোধ, সকল নিষ্ঠুরতা তেমনিভাবেই সঙ্কুচিত হইয়া যেন লুকাইতে চাহিতেছে।

ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়াও সে বাড়ির ভিতরে থাকিতে পারিল না। বাড়ির বাহিরে—দোকানের দাওয়ার সামনে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। জীবনে কখনও সে এমন অসহায় বোধ করে নাই। এমন জটিল নাগপাশের মত বন্ধনে সে কখনও জড়াইয়া পড়ে নাই। গোটা জীবনটাই সে যুদ্ধ করিয়া আসিয়াছে—থানার জমাদার হইতে শুরু, বেদের দলের

প্রতিদ্বন্দ্বী, দিদির গুরুঠাকুর, জমিদারের গোমস্তা, যশোদিয়ার বাবা, জমিবিক্রেতা সদগোপ চাষী, এই গাঁয়ের লোক, এমন কি এই যে সন্ত এলোকেশীর মালিক খোদ জমিদারের সঙ্গে বিবাদ শুরু হইয়াছে—এ পর্যন্ত কোথাও সে হারে নাই। কোথাও হাতে মারিয়াছে, কোথাও ঘরে আগুন দিয়াছে, প্রতিশোধ সে লইয়াছে, তাহার উপর প্রতিটি ক্ষেত্রে তাচ্ছিল্যের লাথি মারিয়া মনে সুগভীর তৃপ্তিলাভ করিয়াছে। জমিদারের সঙ্গে লড়াই তাহার শুরু হইয়াছে শেষ হয় নাই। শোধ সে লইবেই। হার সে মানিবে না। সেই লইয়াই সে এ কয়দিন ভাবিতেছে, উল্লসিত উন্মত্ত চাৎকার করিতেছে। মনে মনে সেই হা-ঘরেত্ব ফিরিয়া পাইয়া যেন বাঁচিয়া গিয়াছে। প্রতিশোধ লইবার ব্যবস্থা করিতেই সে ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছে। তাহার জন্যই সে গতকাল পাঁচ ক্রোশ পাঁচ ক্রোশ দশ ক্রোশ হাঁটিয়াছে। তাহারই জন্য আজ সকালে সে তাহার পাঁচ হাত লম্বা বল্লমটা পাড়িয়া মাজিয়া ঘষিয়া শানাইয়া সেটাকে কালদণ্ডের মত ভয়ঙ্কর এবং তীক্ষ্ণ করিয়া তুলিয়াছে। রাজুকে উপলক্ষ পাইয়া তাহার নাম করিয়া বল্লমটা পাড়িলেও আসল লক্ষ্য হইল, বাবুর উপর প্রতিশোধ। কাল গিয়াছিল উত্তরে একটা বড় নদী পার হইয়া নদীপারের একটা গ্রামে; বনজঙ্গলের মধ্যে দুর্ধর্ষ ভল্লা বাগ্দীর বাস সেখানে। পুরুষানুক্রমে তাহারা ডাকাতি করিয়া খাইয়া আসিতেছে। মদ খায়, গাঁজা খায়, সমস্ত দিনটা ঘুমায়, রাত্রে জাগে বন্য বাঘের মত, সারারাত তাণ্ডব-নৃত্য করে। সুযোগ সুবিধা পাইলে ডাকাতি করে। ধরা পড়ে, জেল খাটে, আন্দামানে যায়, কেহ ফেরে, কেহ ফেরে না—সেইখানেই মরে। দল অনেকই আছে, কিন্তু এ দলের মধ্যে এমন লোক আছে যাহারা ভীষণ মানুষ, তাহারা শুধু এই বাংলা দেশেই ডাকাতি করে নাই বা করে না, এ-দেশ ও-দেশ পর্যন্ত মারিয়া আসিয়াছে; পাঞ্জাবী, ভোজপুরী, পেশোয়ারীদের সঙ্গে মিশিয়াও কাজ করিয়াছে। কয়লার কুটি লুঠিয়াছে, নদীতে নৌকা মারিয়াছে, ট্রেনে উঠিয়া লুট করিয়া শিকল টানিয়া নামিয়া পলাইয়াছে। লোকটার দুইটা বন্দুকও আছে,—লুঠ করা মাল। পানু অনেক সন্ধান করিয়া লোকটার কাছে গিয়াছিল। কিছুদিন আগে আন্দামান হইতে ফিরিয়াছে। নদীর ধারে একটা ভাঙা পরিত্যক্ত মসজিদের চত্বরের উপর ঘর তুলিয়া বাস করে। বিড়বিড় করিয়া বকে, মালা জপে। কথা কয় না সহজে। পানু তাহার সহিত প্রাথমিক কথাবার্তা বলিয়া আসিয়াছে। সে বলিয়াছে—আমি ভেবে দেখি, তুইও ভেবে দেখ। কিন্তু মালের ভাগ তুই পাবি না। তোর ভাগে সে শালার মাথাটা রইল। তুই তো তার মাথাটা চাস? পানু উল্লসিত হইয়া ফিরিয়াছে। তাহার সে উল্লাস, তাহার সে ভয়ঙ্কর কল্পনা আজ একটা মেয়ে যেন এক মুহূর্তে বিপর্যস্ত করিয়া দিতেছে। বাহিরে যুদ্ধযাত্রার মুহূর্তে হারামজাদী রাজিয়া অকস্মাৎ ঘরেই তাহার মল্লযুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিল, এ যুদ্ধে মুহূর্তে তাহার অবস্থা অজগরের পাকে জড়ানো ক্ষিপ্ত বাঘের অবস্থার মত সকরুণ হইয়া উঠিয়াছে। নিষ্ঠুর আক্রোশ তাহার দুনিয়ার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। আক্রোশের এক চরম উন্মাদনাপূর্ণ কল্পনার মুহূর্তটিতেই এক অকল্পিত দিক হইতে ততোধিক অকল্পিত এক আঘাত খাইয়া সে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে। সমস্ত দেহ-মন যেন থরথর করিয়া কাঁপিতেছে।

কয়েক মুহূর্ত পরে সে নিজেকে সামলাইয়া লইল। মনে মনে বলিল—থাক, সবুর কর, কয়টা দিন সবুর কর! তারপর সে দেখিবে। ওই বাবুর বাড়িতে যে রাত্রে তাণ্ডব-নৃত্য করিবে, বাবুর বুকে ওই বল্লমটা বিঁধিয়া দিবে, সেই রাত্রেই ইহার প্রতিকার সে করিবে। দেশ তাহাকে ছাড়িতেই হইবে। এবং এবার দেশ ছাড়িতে হইবে একা। কাচ্চা-বাচ্চা আর দুইটা বউ লইয়া পালানো অসম্ভব। একমাত্র রাজুকে লইয়াই পালানো চলিত। মুংলী ও তাহার কন্যার পিঠে

দুইজনে চড়িয়া নদীর ধারের জঙ্গল ধরিয়া চলিতে পারিত। কিন্তু না, থাক সে কল্পনা। বাবুর বাড়িতে তাণ্ডব সারিয়া বাড়ি ফিরিবে, বাড়িতে ওই রাজুটাকে কাটিবে। হঠাৎ আরও একজনের কথা মনে হইল; হাঁ, রাজুকে কাটিয়া নদী পার হইয়া শ্মশানেশ্বরীর আশ্রমে ঢুকিয়া ওই সন্ন্যাসী ঠাকুরকে কাটিবে। তাহার পর সে রওনা হইবে। আশ্রয়ও সে স্থির করিয়া রাখিয়াছে। সেই অরণ্য আশ্রয়। খুন করিয়া ধরিবে সে নদীগর্ভের বালুপথ। নদী বড় ভাল। পাহাড় হইতে বাহির হইয়া বনে বনে প্রান্তরে প্রান্তরে সে চলে। দুই পাশে শরবন কাশবনের আড়াল কাটাইয়া তাহার পথ। তাহার মনে পড়িল, বেদে-জীবনের 'দেওতাদের কথা। বনে পাহাড়ে থাকেন দেওতারা, নদীতে থাকেন 'দেওমায়ীরা'। নদীপথ ধরিয়া সে গিয়া উঠিবে সাঁওতাল পরগণার জঙ্গলভরা পাহাড়ে। কাপড় ছাড়িয়া লেংটি পরিবে। সেই পুরানো বুলিতে কথা বলিবে, দাড়ি-গোঁফ কামাইবে না, আবার গজাইবে। গায়ে সেই গন্ধ উঠিতে আরম্ভ করিবে। একদিন হয়তো সেই বেদিয়ার দলটার সঙ্গে দেখাও হইয়া যাইবে। বাস, খতম। ফিরিয়া যাইবে সে সেই অরণ্যের অন্ধকার বর্বরতম জীবনে। প্রয়োজন নাই তাহার এ জীবনে, এ গ্রামে নগরে সমাজে মানুষে কোন প্রয়োজন নাই তাহার।

হাঁ। আর কয়েকটা দিন সবুর কর। এক রাত্রে তিনটা মাথা লইবে সে—বাবু, রাজিয়া, সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীটাও তাহার দুশমন হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। কাল সন্ধ্যার সময় ফের লোকটার সঙ্গে দেখা হইয়াছিল, আজও সকালে দেখা হইয়াছে। পানু লোকটার সামনে মাথা তুলিতে পারে নাই। মিষ্টি মিষ্টি কথা কয়, মিষ্টি মিষ্টি হাসে। রাজিয়া কি—? হাঁ, হাঁ, তিন মাথা সে লইবে।

ঘরে ঢুকিয়া বল্লমটা লইয়া সে রওনা হইয়া গেল। বড় নদীর ধারে জঙ্গলে ঘেরা ভাঙা মসজিদের উপর কাঠের ধুনিতে আগুন জ্বলিতেছে, কেরোসিনের ডিবে জ্বলিতেছে, বুড়া গাঁজা খাইতেছে, মদের বোতল গড়াগড়ি যাইতেছে; তাহার পায়ে পাতার মর্মর শব্দ উঠিবামাত্র আলোটা নিবিয়া যাইবে, আগুনটার উপর একটা গরুর জাব-খাওয়া ডাবা ঢাকা পড়িয়া আর দেখা যাইবে না। বুড়া অন্ধকারের মধ্যে নির্নিমেষ নেত্রে পিঙ্গল চক্ষুতারকা মেলিয়া চাহিয়া দেখিবে। বুড়ার পিঙ্গল চক্ষুতারকা অন্ধকারে শ্বাপদের চোখের তারার মত বড় হইয়া উঠিয়া জ্বলে।

চলিতে চলিতে পথে সে থমকিয়া দাঁড়াইল। বাছুর ডাকিতেছে। গ্রামের উত্তর প্রান্তের ঘন বন-জঙ্গলের মধ্যে কোথায় একটা বাছুর ডাকিতেছে। কোন বাছুর? কাহার বাছুর?

পঁচিশ

বাছুরটা সেই সর্বনাশী এলোকেশীই বটে। রাজুবালা বাছুরটাকে ফিরাইয়া আনিতেছিল। অনাহারে পড়িয়া থাকার মত ক্ষোভের মধ্যেও সন্ধ্যা হইতেই তাহার বাছুরটার কথা মনে হইয়াছে। না মনে করিয়া উপায় ছিল না। খিড়কির দরজার মুখে অপরাহ্ণ হইতে এ পর্যন্ত ভাদু বাউরিনী তিনবার উঁকি মারিয়া গিয়াছে। রাজু উত্তরপাড়ার ভাদুর বাড়িতেই এলোকেশীকে তখন রাখিয়া গিয়াছিল। এ সেই ভাদু বাউরিনী, যাহার সঙ্গে রাজু গোপনে কারবার করে, যে একদিন পানুকে দেখিয়া ছুটিয়া পলাইয়া গিয়াছিল। ভাদু দূতীগিরি করে, দুধ বেচিয়া থাকে, হাঁস আছে ডিম বিক্রী করে, আর করে দালালি—নিজের পাড়ার মেয়েদের থালা,

কাঁসার বাসন, রূপার দুই-এক পদ গহনা লইয়া মহাজন দেখিয়া বাঁধা দিয়া টাকা সংগ্রহ করিয়াও দেয়। রাজু ভাদুর মারফৎ গোপনে মহাজনী করে, ভাদুর বাড়িতে কয়েকটা হাঁসও কিনিয়া রাখিয়াছে, ডিম ও বাচ্চার আধা ভাগ ভাদুকে দেয়, তাহার বাধ্য লোক, তাঁবের মানুষও বটে। ঝোঁকের মাথায় ও-বেলায় যখন সে বাছুরটাকে ভাদুর বাড়িতে রাখে তখনই ভাদু বলিয়াছিল—আমাকে তুমি মেরে ফেলবা রাজুদিদি। খুনে মানুষের জ্যান্ত গরুর বাছুর কি করে ছাপিয়ে রাখব বল দেখি? জানতে পারলে মেরে হাড় ভেঙে দেবে, হয়তো ঘরে আগুন লাগিয়ে দেবে।

রাজু চমকিয়া উঠিয়াছিল, কথাটা সে বুঝিয়াছিল। কথাটা নির্ভুল সত্য বলিয়াছে ভাদু। তা ছাড়া কয়দিন এমন ভাবে রক্ষা করিতে পারিবে সে? ভাদু বলিয়াছিল—তা তুমি এনেছ দিদি, রেখে যাও এ-বেলা। ও-বেলায় কিন্তু নিয়ে যেয়ো তুমি। আমার ভাই ঠাঁই-ঠুনো নাই। বোঝার ওপরে শাকের-আঁটি—পাতার কুটো রাখবার জায়গা নাই আমার।

রাজু তবুও তখন রাখিয়া গিয়াছিল। ভাবিয়াছিল, থাক এ বেলাটা। ইতিমধ্যে সে চলিয়া যাইবে, যাইবার পথে বাবুদের অথবা সন্ন্যাসীকে বলিয়া যাইবে—গোহত্যা হবে, বাছুরটাকে বাঁচান।

কিন্তু তাহার পর অকস্মাৎ সব পাল্‌টাইয়া গেল। কি যে হইল, কেন যে এমন হইল সে কথা সে বুঝিল না, বুঝিতেও চাহিল না; একটা দুর্দম হৃদয়াবেগ তাহাকে অধীর করিয়া তুলিল। তাহার বাস্তব-বোধ, সকল বুদ্ধি—এমন কি সকল ভাল-মন্দ বিচারের প্রবৃত্তিও আবেগে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। কঠিন সঙ্কল্প লইয়া সে পানুর ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতার সম্মুখে ভয়লেশশূন্য সহ্যশক্তি লইয়া পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল। ক্রমে ক্রমে সে শক্তি কঠিন হইতে কঠিনতর হইয়া এমনই কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, তাহাকে আঘাতে আঘাতে গুঁড়া করিয়া দেওয়া হয়তো চলিবে, কিন্তু তাহাকে ঠেলিয়া সরাইয়া দেওয়া, কি অবহেলায় ছুঁড়িয়া ফেলা চলিবে না। সে আজ যেন পানুকে অত্যন্ত স্পষ্ট করিয়া বুঝিতেও পারিয়াছে। কেমন করিয়া জানি না, পানুর অভিপ্রায় আজ সে পাখী-মায়ের ডিমের খোলার ভিতরের ছানার নড়াচড়া ও ঠোঁটের ঠোক্কর বুঝিতে পারার মত অনুভব করিতে পারিতেছে। পানুর বুকের স্পন্দনের স্বাভাবিকতা অস্বাভাবিকতা নদীর ঘাটে স্রোত এবং ঢেউয়ের মত রাজুর মনে স্পর্শ দিয়া চলিয়াছে, আছাড় খাইয়া পড়িতেছে। সে বেশ বুঝিতেছে, ভীষণতম একটা কল্পনা পানুর বুকের স্পন্দনকে দ্রুততর করিতেছে; চোখকে, সঙ্কুচিত দৃষ্টিকে তীক্ষ্ণ-ভয়াল করিয়া তুলিতেছে, মুখের রেখাগুলিকে করিয়া তুলিয়াছে কুটিল, ক্রূর। আবার এলোকেশীর জন্য ব্যর্থ অনুসন্ধানে সারা দুপহরটা ফিরিয়া সন্ধ্যার আগে যখন পানু ফিরিল, তখন রাজু দেখিল, গভীর বেদনায় পানুর অন্তরটা সম্মুখের ওই রুক্ষ রসহীন টিলাটার বর্ষা-ঋতুর রূপের মত শ্যামল-কোমল হইয়া উঠিয়াছে, সে সবুজ শোভা ডাকিতেছে এলোকেশীকে। তখন তাহার চোখে জল আসিয়াছিল। তখন ইচ্ছাও হইয়াছিল, হাসিয়া আশ্বাস দিয়া তাহাকে বলে—আছে গো আছে। তোমার সব্বনাশী এলোকেশী আছে। কিন্তু মুহূর্তের জন্য তাহার অভিমানও হইয়াছিল। পর-মুহূর্তেই সেজ তাহার বিরুদ্ধে পানুর কাছে অভিযোগ করিল। পানু রক্তচক্ষু লইয়া তাহাকে শাসন করিতে আগাইয়া আসিল। রাজুও আবার কঠিন হইয়া সব সহিবার জন্য প্রস্তুত হইল।

পানু ভয় পাইয়া প্রথম হার মানিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। রাজুর আবার হইল অভিমান। ঠিক এই সময়েই ভাদু আর একবার উঁকি মারিয়া দেখা দিয়া তাগিদ জানাইয়া গেল। ভাদুর উপরে খানিকটা রাগ করিয়াই রাজু উঠিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ভাদু বলিল—নিয়ে যাও ভাই রাজুদিদি। যে চেঁচানো সারাটা দিন! আমি তো ভয়ে

সারা, কখন শুনতে পেয়ে খেঁটে নিয়ে আসবে তোমার আয়ান ঘোষ!

রাজু কোন কথা না বলিয়া বাছুরটার গলায় আঁচল বাঁধিয়া টানিতে টানিতে লইয়া গেল!

ভাদু তাহাকে পিছন হইতে ডাকিল—রাজুদিদি!

ভুরু কুঁচকাইয়া রাজু বলিল—কি?

ভাদু কাছে আসিয়া কেরোসিনের ডিবেটা তুলিয়া তাহার মুখের সামনে ধরিল, সবিস্ময়ে বলিল—রাজুদিদি!

—কেন? বল না কি বলছিস?

—কি হয়েছে ভাই তোমার?

—কি হবে?

—কি হবে? কপালে চাবুকের দাগ, চোখের চারপাশে কালি পড়েছে। তবু চোখ দুটো ডবডব করছে ভরা পুকুরের মত। খুব কেঁদেছ? সারাদিন কেঁদেছ, নয়?

রাজু বলিল—আমার শরীরটা ভাল নয় ভাদু। তোর সঙ্গে রসের কথা কইবার আমার সাধ্যি নাই আজ।

ভাদু তাহার হাত চাপিয়া ধরিল।—কি হয়েছে ভাই? তিনবার গেলাম—তিনবারই দেখলাম শুয়ে রয়েছ। মেরেছে?

রাজু হাসিয়া বাঁহাত দিয়া ডান বাহুর উপরের কাপড় সরাইয়া দেখাইয়া বলিল—এই দেখ।

ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা কাটা ডান হাতখানা দেখাইল।

গৌরবর্ণ বাহুটার উপর ঘননীল কালসিটে পড়িয়াছে, ফুলিয়া উঠিয়াছে। রাজু ঠোঁট বাঁকাইয়া হাসিল, বলিল—আবার বলে, খুন করব। আমি হেঁসোটো দিলাম হাতে। বললাম—কর খুন। তখন পিছিয়ে গেল। আমি দেখব ভাদু, ওকে আমি দেখব—

শিহরিয়া ভাদু বলিল—না না দিদি, ওকে বিশ্বাস নাই।

উপেক্ষা করিয়া বিচিত্র ভঙ্গিতে ঠোঁট দুইটা উল্টাইয়া দিয়া রাজু চলিয়া গেল। বাছুরটা এতক্ষণ বেশ ছিল, রাজুর হাত চাটিতেছিল, কিন্তু গলায় টান পড়িতেই খোঁড়া পা লইয়া দ্রুত চলিবার শক্তির অভাবে চীৎকার শুরু করিয়া দিল।

ও-বেলায় রাজু সব্বনাশীকে কোলে তুলিয়া আনিয়াছিল। কিন্তু সারাদিন অনাহারে থাকিয়া এবং নির্যাতন সহ্য করিয়া শরীরটা এ-বেলায় ভাল নাই। নহিলে কোলেই তুলিয়া লইত। কিন্তু ওটাও যাইবে না, যাইতে পারিবে না। বেচারী। অগত্যা রাজু বাছুরটাকে কোলে তুলিয়া লইল। ঠিক সেই মুহূর্তেই পানু সেই পাঁচ হাত লম্বা বল্লমটা হাতে অন্ধকারের মধ্যে প্রেতের মত তাহার সামনে দাঁড়াইয়া বলিল—হুঁ। এই যে! সঙ্গে সঙ্গে 'আ' বলিয়া একটা পাশবিক চীৎকার করিয়া উঠিল। রাজুও তাহাকে মুহূর্তের মধ্যেই চিনিয়াছিল। কিন্তু সে বিন্দুমাত্রও চঞ্চল হইল না। স্থিরদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—কোথা যাচ্ছ তুমি?

সে কথার জবাব না দিয়া পানু বলিল—তুই সারাদিন উপোস করে আছিস, নয়? হুঁ। উপোস করে বাছুর ঘাড়ে করতে ক্ষ্যামতা থাকে? শালী!

রাজু যেমন ভাদুর কথায় হাসিয়াছিল, ঠোঁট উল্টাইয়া তেমনি বিচিত্র ভঙ্গিতে হাসিল।

পানু বলিল—আ। নোড়া দিয়ে দাঁত ভেঙে ঠোঁট ছেঁচে এই হাসি তোমার বার করব। হারামজাদী! শয়তানী!

—তা ক'রো। রাজু আবার হাসিল। কিন্তু তুমি যাবে কোথা? এই সন্ধ্যের সময়?

গলায় চেপে কথা বলছ তুমি ?

পানু কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ থাকিয়া গেল। তার পর উত্তরে প্রশ্ন করিল—বাছুর পেলি কোথা ? কোথা ছিল ?

রাজু বিন্দুমাত্র ভয় না করিয়া বলিল—গোহত্যের ভয়ে ওকে আমি লুকিয়ে রেখেছিলাম।

পানু সবিস্ময়ে বলিল—গোহত্যে ? ওকে আমি মারতাম ?

—না হয় কসাইকে বেচতে। আজ তোমাকে বিশ্বাস ছিল না। কথা শেষ করিয়া বাছুরটাকে কোল হইতে নামাইল ; বাঁ হাতে পানুর হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল—কোথা যাবে তুমি ?

গম্ভীর স্বরে পানু বলিল—হাত ছাড়।

—না, কোথা যাবে তুমি ?

—যাব সে এক জায়গা।

—জায়গা ছাড়া মানুষ যায় না। কোন জায়গা ? বল। তোমার গতিক আমার ভাল লাগছে না। বল তুমি।

পানু বলিল—তোর মরণ-পাখা উঠেছে রাজু—তোর মরণ-পাখা উঠেছে।

—উঠেছে। পাখায় আগুন ধরিয়ে তোমাকে পুড়িয়ে ছারখার করব আমি। বল তুমি কোথা যাবে ? কাকে খুন করতে যাবে ?

পানু চমকিয়া উঠিল।

রাজু বলিল—বল ?

পানু এবার বলিল—হাঁ হাঁ। খুন—খুন। তিন খুন করব আমি। তিন খুন।

রাজু শিহরিয়া উঠিল। চীৎকার করিয়া উঠিল—না। যেতে পাবে না তুমি। আমাকে খুন না করে, কই, যাও তো তুমি দেখি !

—হাঁ—হাঁ। তুকেও বাদ দিব না। তুইও বাদ যাবি না। হাঁ হাঁ, আগে লিব ওই বাবুর মাথা। অন্ধকারের মধ্যে পানুর চোখ জ্বলিয়া উঠিল।

—না।

—হাঁ হাঁ। তারপর লিব তোর মাথা। অন্ধকারের মধ্যে পানুর সাদা দাঁত ঝকমক করিয়া উঠিল।

রাজু বলিল—সব আগে আমাকে খুন করতে হবে তোমাকে। নইলে—

বাধা দিয়া পানু বলিল—তারপরেতে লিব ওই সন্ন্যাসী ঠাকুরের মাথা।

রাজু ঘাড় নাড়িল—না। সে হবে না। আমাকে খুন না করে—

পানু হাসিয়া উঠিল। বলিল—তবে বাবুর বাদে লিব ওই সন্ন্যাসীর মাথা। তারপর তু। দুটা মাথা তোর সামনে রাখব, তু দেখবি। তারপর তুকে কাটব। সে ঝাঁকি দিয়া রাজুর হাত ছাড়াইয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

রাজু বলিল—শোন। ফের। না ফিরলে সারা জীবন আফসোস করবে তুমি। শোন।

পানু ফিরিয়া আসিল। নিষ্ঠুর ভাবে কৌতুক করিবার জন্যই বোধ হয় ফিরিয়া আসিল।

রাজু তাহার হাত ধরিয়া ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

পানু অবাক হইয়া কিছুক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল—হাত ছাড়। তুকে কাটব না। ছাড়।

—না। তুমি আমাকে কাট। কিন্তু এ পাপ তুমি করতে পাবে না।

—পাপ ? দাঁতে দাঁতে ঘষিয়া পানু বলিল—পাপ ? বাবু আমাকে চাবুক মেরে, আমাকে জুতো মেলে, আমার জরিমানা করলে, তাতে পাপ হল না ? আমার পাপ হবে ? পাপ ! তার পাপ নাই, আমার পাপ !

—সে পাপের সাজা ভগবান দেবেন—

—নেহি নেহি। আমি দিব। আমার নিজের হাতে আমি দিব। কোন হ্যায় ভগবান ? নেহি মানতা হ্যায় !

—না—না—না। চীৎকার করিয়া উঠিল রাজিয়া। সেই প্রাণ-ফাটানো 'না' বলিয়া চীৎকার।

পানু পশুর মত একটা ক্রুদ্ধ চীৎকার করিয়া উঠিল। বোধ করি রাজুর চীৎকারকে নিজের চীৎকার দিয়া চাপিয়া দিতে চাহিল।

রাজু হঠাৎ পাগলের মত সেই মাঠের মধ্যেই তাহার পায়ে মাথা কুটিতে লাগিল। বর্বর পানুও এবার ক্ষেপিয়া গেল। সে রাজুর মাথার উপরে লাথির উপর লাথি মারিতে শুরু করিল। গোটা কয়েক লাথি মারিয়া সে হনহন করিয়া চলিয়া গেল। পিছন ফিরিয়া একবার চাহিল না পর্যন্ত।

কিছুক্ষণ পর ভাদু আসিয়া রাজুকে তুলিল। কপাল কাটিয়া গিয়াছে, নাক দিয়াও রক্ত গড়াইতেছে, রাজুর কালো চুলের রাশি খুলিয়া ধূলায় বিপর্যস্ত হইয়া ধূসর হইয়া উঠিয়াছে। চীৎকার শুনিয়া ভাদু আসিয়া আড়ালে দাঁড়াইয়া সব দেখিয়াছে।

অন্য দিন হইলে রাজু বোধ হয় লজ্জায় মরিয়া যাইত। কিন্তু আজ যেন রাজু সৃষ্টিছাড়া মানুষে পরিণত হইয়াছে। সে একদৃষ্টে পানুর গমন-পথের দিকে চাহিয়া রহিল।

ভাদু বলিল—রাজুদিদি !

রাজু উত্তর দিল না।

ভাদু বলিল—রাজুদিদি, তুমি চলে যাও ; তুমি চলে যাও। ছি-ছি-ছি, কপালের নেকন তোমার ! কতজন সাধছে—ওই গাঁয়ের ময়রা জমাদার কতদিন আমাকে বলে, রাজু আসে তো পাল্‌কি পাঠিয়ে নিয়ে যাব।

রাজু এ কথারও জবাব দিল না, নিঃশব্দে উঠিয়া চলিয়া গেল। অন্ধকারের মধ্যে সাদা কাপড় পরা রাজু কাপড় ঝাড়িল বার দুই ; কাপড়ের ধূলা ঝাড়িয়া উঠিয়া অন্ধকারকে গভীর করিয়া তুলিল। পিছনে যেন একটা আবরণ তুলিয়া দিয়াই সে চলিয়া গেল। ভাদু তাহার গমনপথের দিকে চাহিয়া জিভ কাটিয়া বলিল—মরণ ! এই বয়সে মজলে তুমি ! হায় হায় হায় !

সেও চলিয়া গেল আপনার বাড়ির দিকে।

এলোদেশী দূরে উত্তর মাঠে ডাকিতেছিল। খোঁড়াইয়া পা টানিতে টানিতে সে চলিয়াছে। রাজু তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াই চলিয়া গিয়াছে। মনের বিভ্রান্ত অবস্থায় তাহার কথা বোধ করি মনে উঠে নাই। বাছুরটা মাঠেই ঘুরিতেছে।

পানু দাঁড়াইল। কি বিপদ ! রাজু ছাড়িল তো এটা সঙ্গ ধরিয়াছে। তাহাকে ডাকিতে ডাকিতে আসিতেছে। সামান্য ক্ষণ দাঁড়াইয়া সে আবার চলিতে শুরু করিল। থাক, পিছনে পড়িয়া থাক। এই নির্জন মাঠে এই রাত্রিকালে উহার নিয়তি ঘনাইয়াছে। তাহার উপর পানুর কি হাত আছে ! শেয়ালের পালের নজরে পড়ার অপেক্ষা। নজরে পড়ারও প্রয়োজন নাই, যে মরণ-ডাক ও নিজেই ডাকিতেছে, সেই ডাক শুনিয়া এতক্ষণ মাঠের মধ্যে এখানে

ওখানে শেয়ালগুলো কান খাড়া করিয়া দিক লক্ষ্য করিতে শুরু করিয়া দিয়াছে। সে চলিতে শুরু করিল। মরুক, ওটা মরুক।

পানুর অনুমান মিথ্যা নয়। একটা চতুষ্পদ তাহার পাশ দিয়াই ছুটিয়া গেল। বাছুরটার ডাকেরও বিরাম নাই। রাত্রেই ফিরিবার পথে পানু একটু খুঁজিলেই কঙ্কালটা দেখিতে পাইবে। আঃ—ছি! ছি! ছি! সে আবার দাঁড়াইল। এবার ফিরিল।

তাহার চোখের উপর ভাসিতেছে বাছুরটার চোখের সেই দৃষ্টি। আঃ—ছি-ছি-ছি! আজ রাজুর হাতে যখন চিমটি কাটিয়া ধরিয়াছিল, তখন ঠিক এমনি চাহনি চাহিয়াছিল সে। তারপর চোখ মুদিয়াছিল। তাহার চোখে তখন আগুন জ্বলিতেছিল। এই অন্ধকারের মাঠের মধ্যে আবার সেই চাহনি চাহিয়াছে রাজু। আঃ—ছি-ছি-ছি!

দূরে কয়েকটা শেয়াল ছুটিতেছে। বাছুরটা চীৎকার করিতেছে। পানু ছুটিল। একবার বল্লমটা উঠাইল পাশেই একটা ছুটন্ত শেয়ালের দিকে। কিন্তু পরক্ষণেই নামাইয়া লইল। খাদ্য আর খাদক। বনের পশু। পাইলেই খাইবে। না খাইলে পাইবে কোথায়? এই তো বিধান। উহারা বাবু নয়, ঠাকুর নয়। শেয়ালে শেয়াল ধরিয়া খায় না। মানুষে মানুষের রক্ত চোষে।

এলোকেশী মাঠের উঁচু আল-পথ হইতে পড়িয়া গিয়া উঠিতে পারিতেছে না। দূরে দূরে অন্ধকারের মধ্যে ছায়ার মত কয়েকটা ক্ষিপ্রগতি চতুষ্পদ ঘুরিতেছে। বোধ হয় আগাইয়াই আসিতেছিল। পানুকে দেখিয়া থামিয়া গেল। এলোকেশীও ভয় পাইয়াছিল। সে তারস্বরে ডাকিয়া উঠিল। পানু লেজে ধরিয়া ওটাকে খাড়া করিল। বাছুরটা এবার ফোঁস করিয়া নিশ্বাস ফেলিল। প্রচণ্ড বিরক্তির সহিত সে নির্বোধের মতই চারিদিকে তাকাইল। বাছুরটাকে কোথায় পৌঁছাইয়া দিয়া সে রওনা হইতে পারে। পশ্চিমে পূর্বে উত্তরে অন্ধকারের মধ্যে সব একাকার হইয়া যেন মিশিয়া মিলাইয়া গিয়াছে। কতদূরে যে গ্রামবনরেখা তাহা বুঝাই যায় না। দক্ষিণে অদূরে তাহার গ্রাম। পশ্চিম-দক্ষিণ গ্রামপ্রান্তে ওই তাহার বাগানটি দেখা যাইতেছে। ওই তাহার পাশে টিলাটা। সে বাছুরটার পাশে বসিল। বাছুরটার মত আর কোন জীব সে পৃথিবীতে দেখে নাই। যে নিষ্ঠুর প্রহার সে তাহাকে করিয়াছিল, তাহার পরই এমনভাবে হাত চাটিয়া ভালবাসা জানাইতে কেহ পারে বলিয়া পানুর ধারণা নাই। কিন্তু আজ সে ভালবাসাই বিপদে ফেলিয়াছে তাহাকে।

এই অবসরটুকু পাইয়াই বাছুরটা তাহার পিঠ চাটিতে শুরু করিয়াছে। পানু গা-ঝাড়া দিয়া উঠিল। চল হারামজাদী, চল।

বাছুরটাকে ঘাড়ে তুলিয়া সে উঠিয়া পড়িল।—চল।

খানিকটা দূর আসিয়াই সে আতঙ্কে বিস্ময়ে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সম্মুখের দিকে চাহিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল।

আগুন! লকলক করিয়া আগুন জ্বলিতেছে—নাচিতেছে! এ কি কোন শুকনা শরবনে আগুন লাগিয়াছে? ওঃ, দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে! দক্ষিণ পশ্চিম কোণে টিলাটার ধারে। তাহার মধ্যে তাহার ঘর। লকলক করিয়া শিখা উঠিয়া নাচিতেছে। বৈশাখ মাস, বৈশাখের আগুন শিবের কপালের আগুন। অন্ধকার লাল হইয়াছে। বাতাসে এখান পর্যন্ত উত্তাপ আসিতেছে। কিন্তু এ কি হইল! তাহার ঘরে—তাহার টিনের ঘরে—আগুন! খড়ের গোয়াল আছে। আঁটি-বাঁধা শর আছে। সেইখানে আগুন লাগিয়াছে নিশ্চয়। আগুন লাগাইয়া

দিয়াছে। কে? কে? কে? রাজু? রাজু? রাজু? শয়তানী রাজু আগুন লাগাইয়া দিয়া শোধ লইয়াছে? ওঃ! গ্রামপ্রান্তে বাছুরটাকে ফেলিয়া দিয়া উন্মত্তের মত বল্লম হাতে সে ছুটিল। উন্মত্তের মত চীৎকার করিয়া উঠিল। রাজুকে সে হাতে পায়ে বাঁধিয়া ওই আগুনে পুড়াইয়া মারিবে। সে ছুটিল। ছুটিল। ছুটিল।

উঃ, কি আগুন! উঃ, বৈশাখের আগুন! দাউদাউ করিয়া জ্বলিতেছে।

—আমি জানতাম। আমি জানতাম। আমি জানতাম। আঃ—আঃ—আঃ, সর্বনাশী বুকের আগুন গায়ে লাগাল? ভাদু বাউরিনী ছুটিতেছে তাহার সামনে, আগে আগে ছুটিয়া চলিয়াছে ভাদু।

আগুনটা আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেল। এ কি হইল?

ভাদুকে অতিক্রম করিয়া পানু ঘরে আসিয়া পৌছিল। দুই-চারিজন লোক জমিয়াছে। আরও লোক আসিতেছে, সেজবউ বুক চাপড়াইতেছে—ওগো দিদি, কি করলি গো? ওগো দিদি গো।

বড় ছেলেটা চেঁচাইতেছে—ওগো মেজমা গো, ওগো মেজমা, কেনে পুড়লি গো?

পানু হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রাজু? রাজু পুড়িয়াছে? পুড়িতেছে? রাজু রাজু? বিলাসিনী রাজু? চুরণী রাজু? ভেল্কিদারণী রাজু? রাজু! রাজু! ঘরে আগুন লাগে নাই, শরের আঁটিতেও নয়! রাজু আগুন লাগাইয়াছে নিজের গায়ের কাপড়ে। কেরোসিন ঢালিয়া উঠানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পুড়িতেছে। চীৎকার করে নাই। নিঃশব্দে পুড়িতেছে।

ভাদু এবং কয়েকজনে রাজুর জ্বলন্ত কাপড় ছিঁড়িয়া ফেলিতেছিল। সেজবউ হঠাৎ সেই জ্বলন্ত কাপড়ের টুকরা কুড়াইয়া লইয়া পাগলের মতই পানুর গায়ে ছুঁড়িয়া দিল—পোড় পোড়, তুইও পুড়ে মর।

•

পানু পুড়িল না, কিন্তু উত্তাপে পাথরের মত সশব্দে ফাটিয়া মাটির উপর আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেল। একটা মর্মান্তিক চীৎকার করিয়া উঠিল পানু।

সেই বিচিত্র চীৎকার। যাহার অর্থ বুধন বুঝে নাই, পানু নিজে বুঝে না, যে চীৎকারে উল্লাস নাই, ক্রোধ নাই। যে চীৎকারে রাজু বিস্মিত হইত, সেই চীৎকার।

ভাদু আবার চীৎকার করিয়া উঠিল—রাক্ষসকে ভালবেসে পুড়ে মলি শেষে? রাজু—রাজু—রাজুদিদি!

গাঁয়ের লোক ভাঙিয়া আসিল। পানুর উপর অজস্র কঠিন নিষ্ঠুর অভিসম্পাত বর্ষণ করিল। তাহাকে কেহ আজ ভয় করিল না, পানুর ঘরের কথা বলিতে অনধিকার চর্চা মনে করিল না। সুদীর্ঘ দিন এই কথাটারই গণ্ডী টানিয়া আপনার ঘরে পানু রাজুকে, সেজবউকে, ছেলেকে, মহিষকে, কুকুরকে—ইচ্ছামত ঠেঙাইয়াছে, নির্যাতন করিয়াছে, কেহ কিছু বলিতে সাহস করে নাই। যদি কেহ গণ্ডী অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে, তবে তাহাকেও দু-চার ঘা দিয়াছে—অন্তত ঘাড় ধরিয়া বাহির করিয়া তো দিয়াছেই।

কয়েকজন বলিল—ধর হারামজাদা রাক্ষসকে, হাতে পায়ে বেঁধে যে কেরোসিনটা আছে এখনও, গায়ে ঢেলে দাও—ওই আগুন ধরিয়ে দাও।

ভাদু সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। বলিয়াছে—লাথির উপরে লাথি মাথার ওপরে। দোষ কি? না, ও বলে বাবু আমাকে চাবুক মেরেছে, জরিমানা করেছে আমি তাকে খুন

করব, নমোনারায়ণ-বাবাকে খুন করব। রাজুদিদি বলেছে, না, তা পাবে না, দেব না আমি তোমাকে সে পাপ করতে। এই বলে—তবে তোকেও খুন করব। তিন খুন করেঙ্গা—বলে রাক্ষসের মত দাঁত কটমট করে উঠল।

সমবেত জনতা প্রতিবাদে ক্রোধে ক্রমশঃ অধীর হইয়া উঠিতেছিল। একজন বলিল—থানায় খবর দাও। ভাদু, তোকে বলতে হবে সব কথা। তুই নিজে কানে শুনেছিস।

পানু কোন কথা যেন শুনিতেই পাইতেছে না। একবার সে আছাড় খাইয়া পড়িয়াছিল—তাহার পর উঠিয়া রাজুর পোড়া দেহখানার কাছে বসিয়া এক বিচিত্র দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। মধ্যে মধ্যে শুধু চিবুকটা থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। বুকের মধ্যে একটা কিসের পাথার যেন উতল-পাতল করিতেছে! গলার কাছে একটা ডাক যেন পথ না পাইয়া সেইখানেই মাথা কুটিয়া মরিতেছে। রাজু, রাজিয়া, রাজু, রাজু রে!

ভাদু আক্ষেপ করিতেছিল—আমি জানতাম, এমুনি একটা কিছু হবে—তা জানতাম আমি। রাজুদিদির ভাবগতিক দেখে বুঝেছিলাম আমি। বছরখানেক থেকেই অসম্ভব মতিগতি হয়েছিল। ওই রূপের মেয়ে, ওর ঘরে সাজে, না, থাকে? রোগের সময় দুঃসময়ে ঠাঁই দিয়েছিল—তাই থাকা। বলত আমাকে। কিন্তু বছরখানেক কি যে হল? নেকন। নেকন ছাড়া কি? নইলে রাজুকে নাকি ওই রাক্ষসের টানে পড়তে হয়, ওই পিশাচে নাকি মজে?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল—জিনিস যে বড় খারাপ। ও ছুঁলে আর রক্ষে নাই। দেখলাম অনেক। চোখের নেশা, নতুনের নেশা, দু দিনের নেশা, দশ দিনের নেশা, কত দেখলাম। কিন্তু এই নেশা—রাজুকে যা পেলে শেষকালে—

কে একজন তাহাকে ধমক দিল—কি আবোল-তাবোল বকছিস?

সে হাসিয়া বলিল—ভালবাসা গো, ভালবাসা। আঃ, ভালবেসে পুড়ে মরল ছুঁড়ী!

ভাদুর কথাই হয়তো সত্য। ইহার মধ্যে আর হয়তো নাই, ওই কথাই সত্য। ভালবাসা গো, ভালবাসিয়া পুড়িয়া মরিল রাই। নহিলে কি কেহ এমন অবহেলাভরে আগুনের জ্বালা দেহে ধরাইয়া নিজেকে পুড়াইয়া দিতে পারে? ভাল না বাসিলে রাজু কি এমন নির্বোধ হয় যে, নিজে মরিয়া পানুর মত পাষণ্ডকে দুঃখ দিবার, কাঁদাইবার, কুকর্ম হইতে নিবৃত্ত করিবার কল্পনা করে? নিজেকে দুঃখ দিলে ভালবাসার জন দুঃখ পাইবে—এ বিচিত্র আবিষ্কার, ওই বিচিত্র বস্তুতে যাহাকে পাইয়া বসিয়াছে, পৃথিবীতে একমাত্র সে-ই পারে এমন অবহেলাভরে নিজেকে ছাই করিয়া ফেলিতে। এই দুর্লভ সামগ্রী পাওয়ার এমন নিঃসংশয় প্রমাণ দিয়া যে এমনি করিয়া মরে, আশ্চর্যের কথা—তাহার জন্য গোটা বাস্তব সংসারের হিসাব-নিকাশ-সর্বস্ব মানুষ কাঁদিয়া কাঁদিয়া সারা হয়; ধন-সম্পদ, রাজ্য-পাট পর্যন্ত তুচ্ছ হইয়া যায়। বাস্তব সংসারের মানুষের অন্তরে এই তৃষ্ণা হাহাকার করিতেছে জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত!

গোটা গাঁয়ের লোক উত্তেজনা ভুলিয়া, পানুর উপর ক্রোধ ভুলিয়া চোখ মুছিতে লাগিল। কত ফোঁটা অশ্রুজল যে পৃথিবীর বুকে সেদিন পড়িল তাহার হিসাব নাই।

পানু ঠিক তেমনিভাবে বসিয়া আছে। রাজুর পাশে—রাজুর দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে।

পুলিস আসিয়া গেল।

পানু দারোগার মুখের দিকে চাহিল। আজ আর তাহার এক বিন্দু ভয় নাই, ক্রোধ নাই। শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। বোধ হয় এই প্রথম দীর্ঘনিশ্বাস।

তিমিরময়ী রাত্রি, দীর্ঘ—সুদীর্ঘ। যেন একটা যুগ, একটা শতাব্দী, না, তাহারও চেয়ে দীর্ঘ—

সহস্রাব্দ—বহু সহস্রাব্দের মত দীর্ঘ। পানুর তাই মনে হইল। উপরে কৃষ্ণপক্ষের আকাশে কত তারা; কয়টা তারা খসিয়া গেল; পানু রাত্রির আকাশের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

দারোগা সুরতহাল রিপোর্ট লিখিতেছেন।

নমোনারায়ণ-বাবা লিখাইতেছেন।—খবর পাইয়া তিনিও আসিয়াছিলেন। পানু একবার নড়িল না পর্যন্ত।

আকাশের দিকে চাহিয়া সে ক্ষণ গনিতেছে; চোখ দিয়া অনর্গল জল পড়িতেছে। এই অসহনীয় দীর্ঘ রাত্রির কখন শেষ হইবে, তাহারই জন্য সে প্রতীক্ষা করিতেছে; সর্বশক্তি-নিঃশেষিত অসহায় দুর্বলের মতই সে প্রতীক্ষা করিতেছে।

ছাব্বিশ

পানুর কাছে রাত্রিটা সত্য সত্যই দীর্ঘ, সুদীর্ঘ রাত্রি। শুধুই কি তাই? সে কী রাত্রি—সে শুধু পানুই জানে। জন্ম হইতে জন্মান্তরের অন্তর্বর্তীকালের মত দীর্ঘ উদ্বেগময়; অমোঘ দণ্ডপাতের যাতনায় দুঃখে জর্জর, বিমূঢ়; কালান্তরের বিপ্লব রাত্রির মত জটিল, বিশৃঙ্খল। সুদীর্ঘ রাত্রির শেষ হইল। পানু একটা নিশ্বাস ফেলিল।

রাজুর মৃতদেহের উপর তাহারই সবচেয়ে প্রিয় শাড়ীখানা ঢাকা দেওয়া হইয়াছিল। সূর্যালোক আসিয়া আবৃত দেহের উপর পড়িতেই, পানু ঢাকা খুলিয়া রাজুর মুখটা ভাল করিয়া দেখিল। ম্লান হাসিয়া রাজুকেই প্রশ্ন করিল—হাসছিস? আমার দুঃখ দেখে? আবরণটা আবার টানিয়া ঢাকা দিল রাজুর মুখের উপর।

ছেলেটা সবিস্ময়ে পানুর দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল, সেজবউও অবাক হইয়া গিয়াছে। পানুকে চেনা যাইতেছে না। কত—কত বয়স যে হইয়াছে অনুমান করা যায় না, পানুর বয়সের যেন গাছ-পাথর নাই।

সন্ন্যাসী সমস্ত রাত্রিই ছিলেন। তিনিই সুরতহাল তদন্ত শেষ করাইয়া দারোগার কাছে শবের শেষকৃত্যের অনুমতি লইয়াছেন। পানু বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী,—সেই অনুযায়ী সমাধি দিবার ব্যবস্থাও করিয়া দিয়াছেন। সকাল হইতেই তিনি বলিলেন—আমি চলি বাবা।

পানু শুধু সজল চক্ষে তাঁহার দিকে তাকাইল। কোন কথা বলিতে পারিল না। বাবাজী চলিয়া গেলেন।

গ্রামে ঘর-তিনেক বৈষ্ণব আছে; বাবাজীর ব্যবস্থায় তাহারা সাহায্য করিতে আসিয়াছিল। খোল বাজাইয়া নামসংকীর্তন শুরু হইল। সামনের টিলাটায় রাত্রেই সমাধি খোঁড়া হইয়াছে। ওইখানেই রাজুর সমাধি হইবে। শবদেহ পানু একাই বহিল, আর কাহাকেও প্রয়োজন হইল না, পানু রাজুকে তাহার দুই বাহুর উপর শোয়াইয়া বুকের কাছে ধরিয়া বলিল—চল।

সমাধি দিয়া স্নান করিয়া সে ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়িল। রাত্রি প্রহর-খানেকের পর সে ঘর হইতে বাহিরে আসিল। বাড়ি হইতে বাহির হইয়া গিয়া রাজুর সমাধির পাশে বসিল। সকালে আসিয়া আবার ঘরে ঢুকিল।

তাহার পর কত দিন চলিয়া গিয়াছে। অনেক দিন, বৎসর দুয়েকেরও বেশী।

শ্মশানেশ্বরী মায়ের আশ্রমে নমোনারায়ণ-বাবার সম্মুখে পানু সেদিন আসিয়া বসিল।

বাবাজী স্মিতহাসি হাসিয়া বলিলেন—এস।

পানু তাঁহাকে প্রণাম করিল, হাত জোড় করিয়া বলিল—তোমার অনুমতি নিতে এলাম।

আশ্চর্য—পরমাশ্চর্য! এ কণ্ঠস্বর পানুর সে কণ্ঠস্বর নয়। এ ভাষা সে ভাষা নয়। স্বরের মধ্যে সঙ্গীতের সুর—ভাষায় ভালবাসার লালিত্য। শুধু স্বর নয়—তাহার সর্বাঙ্গটাই যেন আগেকার পানুর নয়। এমন পরিবর্তন কেমন করিয়া ঘটিল, কি করিয়া ঘটিল—কেহ বুঝিতে পারে না, শুধু বিস্ময়ে অভিভূত হয় লোকে। তাহার দেহবর্ণে রূপান্তর ঘটিয়াছে—কালো রঙ গৌরবর্ণ হয় নাই, কিন্তু একটি পাণ্ডুর-শ্রী দেখা দিয়াছে। তাহার চামড়া শিথিল হয় নাই, কিন্তু সে কর্কশতা নাই—নরম হইয়াছে। সারা অবয়বটাই যেন ভাঙা-চোরা হইয়া গিয়াছে। চোয়ালের সে উদ্ধত কঠোর হাড় দুইটা ভাঙিয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে। বিশীর্ণ মুখে মোটা নাকটা পর্যন্ত খাড়া হইয়া উঠিয়াছে। পানুর চোখে শান্ত দৃষ্টি, একটি বিচিত্র আভাস তাহাতে দেখা যায়—মনে হয় সজল একটি স্তর অহরহ টলমল করিতেছে। পানুর গলায় তুলসীকাঠের মালা, নাকে কপালে তিলক;—সে পানু যেন এই জন্মেই এক অভিনব গর্ভবাস অতিক্রম করিয়া জন্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে।

এই কিছুদিন পূর্বে। একটি বিশাল প্রৌঢ় আসিয়া তাহার দোকানের সামনে দাঁড়াইল। স্থির দৃষ্টিতে সে পানুর দোকান ও পানুর দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। পানু তাহাকে দেখিবামাত্র চিনিল। তাহার বাড়িতে ডাকাত পড়িয়াছিল, পানু এই শিক-ঘেরা বারান্দার পরিসরের সংকীর্ণতার সুবিধায় একা তাহার হেঁসোটা লইয়া লড়িয়া তাহাদের হঠাইয়া দিয়াছিল। সামনে ছিল যে লোকটা, অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হইয়া সে হেঁসোর কোপ হইতে মাথা বাঁচাইবার জন্য হাত তুলিয়াছিল, হেঁসোখানা ধরিবার চেষ্টা করিয়াছিল। হেঁসোর কোপে তাহার তিনটি আঙুল বিসর্জন দিয়া সে প্রাণে বাঁচিয়াছিল বটে, কিন্তু ওই আঙুল-কাটার জন্য ধরা-পড়া এড়াইতে পারে নাই। লোকটার পাঁচ বৎসর জেল হইয়াছিল। এ সেই লোক।

পানু রামায়ণ পড়িতেছিল। লোকটিকে সে ডাকিল। লোকটি তাহার কাছে আসিয়া বলিল—তুমি কি তার ভাই? সে কোথা?

পানু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া একটু হাসিয়া বলিয়াছিল—সে নাই।

—মরেছে? আঃ! লোকটি মা-কালীর জয় ঘোষণা করিয়া চলিয়া গিয়াছিল।

পানু নিজেও জানে এ তার জন্মান্তর। লোকেও তাই বলে। নমোনারায়ণ-বাবাও তাই বলেন। বলেন—পুরাণের গল্প জান বাবা? সমুদ্র মন্থন হল, তাতে শেষে উঠল হলাহল—বিষ। শিব সেই বিষ অমৃতের মত পান করলেন; পান করেই ঢলে পড়লেন। তখন শিবানী এসে তাকে কোলে তুলে নিয়ে স্ত্রী হয়েও নিজের স্তন পান করালেন। স্তনে ছিল অমৃত। শিব চেতনা ফিরে পেলেন। সেও তো এক জন্মান্তর বাবা। প্রাণকৃষ্ণের আমার জন্মান্তর তেমনি রাজু বেটীর মধ্যে। ওরা তো সামান্য নয় বাবা। শিবাণী-ব্রহ্মাণী-বৈষ্ণবী-রাধা-কালী-জগদ্ধাত্রী—সবারই একটু একটু ওদের মধ্যে আছে যে।

নমোনারায়ণ-বাবার কাছে পানু দীক্ষা লইয়াছে। তাঁহার এত সব তত্ত্বকথা সে বুঝিতে পারে না, বুঝিতে চায়ও না। তবে রাজুর জীবনের মধ্যেই যে তাহার পুনর্জন্ম হইয়াছে, এ কথার মত সত্য আর কি আছে? তাহার চেয়ে এ কথা বেশী কে জানে, কে বুঝে? সে আপন মনেই কথাটা ভাবে, অনুভব করিয়া ঘাড় নাড়ে। চোখ দিয়া জলও গড়াইয়া পড়ে। মনে পড়ে, সে কি কষ্ট, সে কি যন্ত্রণা!

দিনের পর দিন অন্ধকার ঘরে সে কাটাইয়াছে; রাত্রির অন্ধকারে বসিয়া থাকিত রাজুর

সমাধির পাশে। রাজুর মৃত্যু-রাত্রির তিমিরময়ী স্মৃতিকে দীর্ঘ হইতে সুদীর্ঘ করিয়া চলিয়াছিল। সেজবউ বলিত—ক্ষেপিয়া গিয়াছে। সকলেই বিশ্বাস করিয়াছিল, পানুর মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে।

হঠাৎ একদিন।

রাত্রি শেষ হইয়া আসিতেছে, আলো ফুটিতেছে, রাজুর সমাধি হইতে পানু ফিরিতেছে ঘরে, তাহার চোখে পড়িল সামনের সড়ক দিয়া সারি সারি লোক চলিতেছে। মেয়ে-পুরুষ-বালক দলে দলে চলিতেছে; কাঁধে কোদাল মাথায় ঝুড়ি। কলরব করিতে করিতে চলিয়াছে। নমোনারায়ণ-বাবার সেই নদীর বাঁধ বাঁধার কাজ শুরু হইবে আজ। অন্তত দশ হাজার লোকের কোদাল ঝুড়ি চারিদিন পাড়িতে হইবে, তবে সে বাঁধ হইবে। সেই বাঁধ। মানুষের সারি চলিয়াছে, তাহার যেন আর শেষ নাই। দীর্ঘদিন পরে আজ সে কোদাল লইয়া বাহিরে আসিয়া সেজবউ এবং বড় ছেলেকে বলিল—চল, ঝুড়ি নিয়ে চল। দীর্ঘকাল পরে সূর্যালোকিত নদীর ধারে মানুষের কর্মসমারোহের মধ্যে মিশিয়া যেন ঐ নদীর তটপ্রান্তে নূতন করিয়া ভূমিষ্ঠ হইল।

পানু কাজ করিতেছিল। সন্ন্যাসী তাহার পিঠের উপর হাত রাখিলেন। পানু তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। সন্ন্যাসী তাহার পিঠের সেই বেতের দাগের উপর হাত বুলাইয়া বলিলেন—গর্ভবাস শেষ হল বাবা?

পানু কথাটা বুঝিল না। শুধু কাঁদিল। সন্ন্যাসী বলিলেন—কাজ কর বাবা। নূতন জন্ম হয়েছে—কাজ কর।

সন্ধ্যায় পানু শ্মশানেশ্বরী আশ্রমে গিয়া উঠিল। বলিল—রাজুকে ফিরে দিতে পার বাবা?

সন্ন্যাসী তাহার সারা অঙ্গে শুধু স্নেহের স্পর্শ বুলাইয়া দিলেন। কথা বলিলেন না।

পানু তাহার দুইটি হাত জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—বাবা!

সন্ন্যাসী বলিলেন—না বাবা। কেউ পারে কি-না জানি না, তবে আমি পারি না।

পানু কিন্তু ছাড়িল না। দিনের পর দিন নমোনারায়ণ-বাবার কাছে যাওয়া-আসা শুরু করিল। নমোনারায়ণ-বাবা তাহাকে গান শুনাইতেন। পানুর মনে পড়িত, রাজু গোয়ালঘরে ভাঁড়ার-ঘরে আপন মনে গুন গুন করিয়া গান করিত। গান শুনিয়া সে কাঁদিত। সেই তাহার দীক্ষা।

পানু নিজেও আজকাল মোটা গলায় গান গায়। কণ্ঠস্বর তো আর সে কণ্ঠস্বর নাই তাহার। বাবাজী তাহার বিস্মৃতপ্রায় বর্ণ-পরিচয়ে নূতন করিয়া পরিচয় করাইয়া তাহার হাতে পয়ারের রামায়ণ তুলিয়া দিলেন। নূতন জীবনে পানু বড় হইয়া উঠিয়াছে।

বিচিত্র পানু। সমাজের একরঙা পটভূমিতে সেকালের বুকে লাল, অথবা লালের বুকে কালো বিন্দুর মত বিষমধর্মী বৈচিত্র্যের বিন্দু। সে সাধারণ নয়, তবুও সে বাস্তব, সে আছে। বিচিত্র তাহার জীবন। সংসার ঘটনার কঠিন আঘাত অতি সাধারণ একটি ময়রার ছেলেকে একটা অরণ্যবাসে পাঠাইয়াছিল। সহস্র বৎসরের অতীত সেখানকার অন্ধকারের মধ্যে পুঞ্জীভূত হইয়া লুকাইয়া আছে। সে সেই অতীত লোকের অন্ধকারের মধ্যে নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়াছিল। না হইলে, সাধারণ ময়রার ছেলে—নিতান্ত মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীর মত দোকান লইয়া কাল কাটাইয়া দিত। অতীত-লোকের অন্ধকার অন্তর-বাহির ভরিয়া মাখিয়া শৈশবের আলোক-স্মৃতির আকর্ষণে আবার সে ফিরিয়াছিল। আবার সংসার বিচিত্র আঘাতে তাহার বুকের

অন্ধকার মোচন করিয়া আলোকের দ্বার খুলিয়া দিয়াছে। আজ সে বর্তমানের মানুষ হইয়া বহু সহস্র বৎসরের আলোক-আভাস-প্রাপ্ত মানুষের সমাজে বহুর মধ্যে অতি সাধারণ নগণ্য একজন হইয়া মিশাইয়া হারাইয়া গেল—রঙের বাটিতে এক ফোঁটা রঙের মত।

কিন্তু সে রঙের বাটির রঙে নিত্য নবীন সূর্যোদয়ে সপ্তরশ্মির স্পর্শে পরিবর্তনের পর পরিবর্তন ঘটিতেছে। ক্রমে ক্রমে সে শুভ্রতার উজ্জ্বলতম মহিমায় পরিণতি লাভ করিতে চলিয়াছে। মানুষ প্রতি প্রভাতে বিন্দু বিন্দু করিয়া আলোক-সঞ্চয় করিয়া চলিয়াছে অন্তর-লোকে। তাহাদের সঙ্গে পানুও চলিয়াছে।

আজ পানু অনুমতি চাহিতে আসিয়াছে—তাহার একান্ত সাধ, সে রাজুর সমাধির উপর একটি ছোট মন্দির রচনা করিবে।